চাঁদমামা
বেতাল কথা সমগ্র ২

চাঁদমামা
বেতাল কথা সমগ্র ২

চাঁদমামা

বেতাল কথা সমগ্র

২

সম্পাদনা

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

Chandmama Betal Katha Samagra vol 2

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০২২

সম্পাদক : ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রচ্ছদ : কামিল দাস

মূল্য : 149 টাকা

ফ্যালকন-গ্রুপ এর পক্ষে সঞ্জয় কুমার সিং ও সঞ্জীব কুমার সিং কর্তৃক ৮১/বি, ব্লক সি, নজফগড় রোড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, নয়াদিল্লি, ১১০০১৫ থেকে প্রকাশিত
মুদ্রক : ফ্যালকন ডিজিট্যাল, নয়াদিল্লি, ১১০০১৮

ফ্যালকন-গ্রুপ এর আসন্ন পত্রিকা ও বইতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য
যোগাযোগ করতে ই-মেইল করুন: mail.freedom.group@gmail.com
যে কোনো অভিযোগ জানাতে, জিজ্ঞাসা করতে, সত্ব সম্পর্কিত প্রশ্ন করতে, রয়ালটি বিষয়ক প্রশ্ন করতে ইমেইল করুন: book.falcong@gmail.com

ই-বুক প্রস্তুত ও পরিবেশনায়

বইরাগ পাবলিকেশন

www.boiraag.in

contact@boiraag.in

বইরাগ পাবলিকেশন বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষার ই-বই প্রকাশ করে, বইগুলি অ্যামাজন কিন্ডল, গুগল প্লেবুক এবং কোবো তে পাওয়া যায় যা নিশ্চিন্ততা দেয় বইগুলির বৈধতার! আপনি আপনার বইটি ইবুক হিসেবে প্রকাশ করতে চাইলে যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে। আমাদের প্রকাশিত ইবুক ক্যাটালগের জন্যে দেখুন আমাদের ওয়েবপেজ

সূচিপত্র

১. বেতাল কথা

গোদাবরী তীরে প্রতিষ্ঠানপুর নামক একটি নগর ছিল। কোনো এক সময়ে বিক্রমাদিত্য নামে একজন রাজা শাসন করতেন।

রাজা বিক্রমাদিত্যের দরবারে প্রতিদিন ক্ষান্তিশীল নামে একজন ভিক্ষু আসত, কোনো-না-কোনো ফল রাজাকে ভেট দিয়ে যেত। রাজা সেই ফল কোষাধ্যক্ষের হাতে সঁপে দিতেন। এইভাবে বহুদিন কেটে গেল।

অন্যদিনের মতো, সেদিনও রাজাকে একটি ফল দিয়ে ভিক্ষু চলে গেল। না-জানি কীভাবে এক বাঁদর সেই দরবারে ঢুকে গেল। রাজা সেই ফল বাঁদরকে খেতে দিলেন। বাঁদর ফলটিকে খাচ্ছে হঠাৎ সেই ফল থেকে হিরের টুকরো নীচে পড়ে গেল।

রাজা তো অবাক। কোষাধ্যক্ষকে

ডেকে বললেন, 'আমি তোমার হাতে প্রত্যেক দিন যে ফলগুলো দিয়েছি সেগুলো কোথায়?'

কোষাধ্যক্ষ রাজার প্রশ্নে বিস্মিত হল। বলল, 'মহারাজ, আপনার দেওয়া ফলগুলো আমি প্রত্যেক দিন জানালা দিয়ে খাজানা ঘরে ছুড়ে দিতাম। আপনি অনুমতি দিলে খাজানার দরজা খুলে ফলগুলোর কী অবস্থা হল দেখে আসতে পারি।'

রাজা অনুমতি দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কোষাধ্যক্ষ ফিরে এসে বলল, 'মহারাজ সমস্ত ফল পচে গেছে! কিন্তু সেখানে দেখে এলাম এক কাঁড়ি হিরা। তাকানো যায় না এত হিরার চমক।'

রাজা কোষাধ্যক্ষের সততায় মুগ্ধ হয়ে ওই সমস্ত হিরা ওকে উপহার দিলেন।

পরের দিন যথারীতি সেই ভিক্ষু যখন ফল দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল তখন রাজা বললেন, 'ভিক্ষু, তুমি রোজ এমন অমূল্য উপহার কেন আমাকে দিচ্ছ? এর কারণ না বললে আমি নেব কী করে এই উপহার।'

এই কথা শুনে শান্ত স্বরে ভিক্ষু বলল, 'মহারাজ, আমি এক মন্ত্রের সন্ধানে আছি কিন্তু এক মহান বীর যোদ্ধার সাহায্য ছাড়া আমি সে মন্ত্র পেতে পারি না। তাই, আমি চাই আপনার সাহায্য, কারণ আপনি এক মহান বীর যোদ্ধা।'

রাজা সাহায্য করতে রাজি হলেন। ভিক্ষু বলল, 'আগামী কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত্রে আমি আপনাকে শ্মশানে পেতে চাই। আমি সেই শ্মশানের বটগাছের নীচে আপনার জন্য অপেক্ষা করব।'

'ভিক্ষু আমি অবশ্যই যাব।' রাজা কথা দিলেন। ভিক্ষু প্রসন্ন মনে ফিরে গেল।

কৃষ্ণা চতুর্দশীর দিনে সন্ধ্যা হতে-না-হতেই কালো বস্ত্র ধারণ করে বিক্রমাদিত্য হাতে তরবারি নিয়ে শ্মশানের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ঘন কালো অন্ধকারে শ্মশান যেন ডুবে আছে। সেই অন্ধকারের বুকে চিতা জ্বলছে। আশেপাশে সর্বত্র মানুষের হাড় ছড়িয়ে রয়েছে। যেখানে-সেখানে মানুষের মাথার খুলি ছড়ানো। শেয়ালগুলো এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্যন্ত ডাকাডাকি করছে। ভূত আর বেতালের কত যে নাচানাচি!

রাজা বিক্রমাদিত্য ভিক্ষুকে খুঁজতে খুঁজতে শ্মশানে এসে পৌঁছালেন। বটগাছের নীচে দণ্ডায়মান ভিক্ষুকে দেখে রাজা বললেন, 'ভিক্ষু তোমার কথামতো আমি এসেছি। এবার বল কী করতে হবে।'

ভিক্ষু রাজাকে দেখে খুব খুশি হয়ে বলল, 'মহারাজ আপনি দয়া করে দক্ষিণ

দিকে চলে যান। সেখানে আপনি এক সিমসুপা গাছ দেখতে পাবেন। ওই গাছে ঝুলছে এক মানুষের শবদেহ। সেই শবদেহ আপনি ঘাড়ে করে বয়ে আমার কাছে আসুন।'

রাজা রাজি হলেন। জ্বলন্ত চিতা থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে মশালের মতো হাতে তুলে ধরে সোজা দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চললেন। থামলেন সেই গাছের কাছে। দেখতে পেলেন একটি মানুষের শবদেহ ঝুলছে। রাজা সেই গাছে চড়ে দড়ি কেটে দিলেন। শবদেহ নীচে পড়ে গেল।

নীচে পড়তেই শবদেহ থেকে ভেসে এল আঘাত-পাওয়া মানুষের কান্না। রাজা ভাবলেন, তাহলে তো এই দেহে প্রাণ আছে! তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে এসে বিগলিত করুণায় সেই দেহ ছুঁলেন। সাথে সাথে ভেসে এল অট্টহাসি।

রাজা জানতেন না যে শবদেহে বেতাল ছিল। তাই উনি প্রশ্ন করলেন, 'তুমি হাসছ কেন? চলো আমার সাথে।'

রাজার মুখ থেকে এই কথা বেরোতে না বেরোতেই শবদেহ গায়েব হয়ে গেল। পরক্ষণেই দেখা গেল যথারীতি গাছে ঝুলছে। রাজা আবার গাছে উঠে ওটা নীচে ফেলে দিলেন। কোনো কথা না বলে রাজা নীচে নেমে এসে শবদেহ কাঁধে ফেলে ওই শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন।

তখন শবদেহের বেতাল বলল, 'মহারাজ তোমার মনোরঞ্জনের জন্য আমি একটি গল্প শোনাব, শোনো।' বেতাল গল্প বলা শুরু করল: প্রাচীন কালে অঙ্গদেশে যশঃকেতু নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। দেখতে ভারি সুন্দর ছিল ঠিক যেন মন্মথ। উনি নিজের পরাক্রম দিয়ে বল প্রয়োগ করে সমস্ত

শত্রু রাজাদের হারিয়ে সমগ্র রাজ্যের ভার মন্ত্রী দীর্ঘদর্শীর হাতে সঁপে দিয়ে নিজে অন্তপুরে আনন্দ ভোগ করতে লাগলেন।

মন্ত্রী দীর্ঘদর্শী রাতদিন পরিশ্রম করে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। মন্ত্রী দীর্ঘদর্শী ছিলেন রাজার খুব বিশ্বাসী পাত্র কিন্তু কিছু অধিকারী অভিযোগ করতে লাগল। ওরা আসলে মন্ত্রীকে ঈর্ষা করত। সেইজন্য ওরা প্রচার করতে লাগল যে মন্ত্রী রাজাকে ভোগলালসায় ডুবিয়ে দিয়ে নিজে রাজ্য শাসন করছেন।

মন্ত্রী দীর্ঘদর্শীর কানে যখন এই কথা গেল তখন উনি খুব দুঃখিত হয়ে নিজের স্ত্রীকে বললেন, 'রাজা নিজে সুখ ভোগের গোলাম হয়ে গেলেন আর আমি রাজ্যের সমস্ত ভার বহন করছি কিন্তু লোকে আমার বদনাম রটাচ্ছে, আমি নাকি খেয়ালখুশি মতো চলে লুণ্ঠন করছি। এ-কথা তো সত্য নয় তবুও বল কী করে এই বদনাম উপেক্ষা করতে পারি? কী করি বলতো?'

মন্ত্রীর স্ত্রী মেধাবিনী স্বামীকে বলল, 'আপনি তীর্থ দর্শনের নাম করে রাজার অনুমতি নিয়ে দেশভ্রমণ করতে চলে যান। এর ফলে আপনার নামে যে বদনাম রটেছে সেটা ঘুচে যাবে, মিথ্যা প্রমাণিত হবে। এবং রাজাকে নিজের হাতে শাসনভার তুলে নিতে হবে। ফলে রাজাও ভোগলালসা থেকে দূরে সরে যেতে পারবেন।'

দীর্ঘদর্শী সুযোগ বুঝে একদিন রাজাকে বললেন, 'মহারাজ আমি কিছুদিন তীর্থ দর্শন করে পুণ্য অর্জন করতে চাই আপনি দয়া করে যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি যেতে পারি।' রাজা বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে এইসব রাজকার্যের ভেতর দিয়েই পুণ্য অর্জন করা যায়। কিন্তু মন্ত্রী সবিনয়ে বললেন, 'মহারাজ শরীরের শক্তি থাকতে থাকতে তীর্থ দর্শনে যাওয়ার ইচ্ছে আছে, বয়স বেড়ে গেলে আর তো সম্ভব হবে না।'

দীর্ঘদর্শী নিজের স্ত্রীকেও সাথে না নিয়ে এমনকী রাজাকেও তীর্থযাত্রার খবর না জানিয়ে একাই হঠাৎ একদিন চলে গেলেন। কিছুদিন যাওয়ার পর সমুদ্রতীরের পুণ্ড্র দেশে পৌঁছালেন। সেখানকার নিধিদত্ত নামে এক ব্যাবসাদারের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। নিধিদত্তের ব্যাবসা নানান দিকে। একদিন তাকে সুবর্ণ দ্বীপে ব্যাবসার জন্য যেতে হয়েছিল। দীর্ঘদর্শীও নিধিদত্তের সাথে যেতে চাইলেন।

দু-জনে নৌকো করে সুবর্ণ দ্বীপে পরের দিন পৌঁছাল। সেখানে কিছুদিন নিধিদত্তের ব্যাবসা চালাল।

ফেরার পথে দীর্ঘদর্শী মাঝ সমুদ্রে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন। এক ঢেউয়ের সাথে সমুদ্রের ভেতর থেকে এক অজানা বৃক্ষ উপরে জেগে উঠল। সেই

গাছ ছিল সোনার আর তার ডালগুলো ছিল বাদামি আর ফলগুলো সব রত্ন। সেই গাছের চূড়ায় রত্ন শয্যায় এক অনুপম সুন্দরী বসে বসে গান করছিল। দীর্ঘদর্শীর চোখের সামনেই সেই বৃক্ষসমেত সুন্দরী জলে ডুবে তলিয়ে গেল।

'এ কেমন তরো গাছ! দেখে যেন মনে হয় এ বৃক্ষ ক্ষীরসাগরের কল্পকক্ষ। আর সেই সুন্দরী রমণী যেন স্বয়ং লক্ষ্মী।' দীর্ঘদর্শী বললেন।

দীর্ঘদর্শীকে বিস্মিত হতে দেখে নাবিকেরা বলল, 'আপনার কাছে এ দৃশ্য নতুন, তাই বিচিত্র লাগছে কিন্তু আমরা এই দেশে প্রত্যেক বার এই দৃশ্য দেখে আসছি।'

যাত্রা সমাপ্ত করে দীর্ঘদর্শী নিধিদত্তের কাছ থেকে অঙ্গ দেশে ফিরে এলেন।

দীর্ঘদর্শী রাজার অনুমতি না নিয়ে তীর্থযাত্রায় চলে যাওয়ায় রাজা যশঃকেতু বহু গুপ্তচর ছেড়ে রাজ্যের আনাচেকানাচে মন্ত্রীর খোঁজ করছিলেন। দীর্ঘদর্শীকে রাজধানীর দিকে আসতে দেখেই গুপ্তচরেরা রাজার কাছে ছুটে গিয়ে খবর দিল। সঙ্গেসঙ্গে রাজা যশঃকেতু দীর্ঘদর্শীর সামনে গিয়ে দু-হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'তীর্থ যাত্রার ইচ্ছা মন্ত্রী তোমাকে এতখানি কঠোর করে দিয়েছে! যাক, এবার বল দেখি কোন কোন তীর্থে তুমি গিয়েছ, আর কী ধরনের বিচিত্র স্থান দর্শন করেছ?'

দীর্ঘদর্শী তীর্থযাত্রার সমস্ত খবর জানিয়ে মাঝ সমুদ্রে দেখা সেই অদ্ভুত বৃক্ষ এবং অনুপম সুন্দরীর কথা জানালেন।

এ-কথা শুনে রাজার মন সেই অপরূপ সুন্দরী রমণীকে দেখার জন্যে আকুল হয়ে উঠল। দীর্ঘদর্শীকে রাজা গোপনে বললেন, 'আমি সেই অপরূপ সুন্দরীকে দেখতে চাই, তা যদি না পারি তাহলে আমি বাঁচব না। তুমি আমাকে বাধা দিও না। আমি একাই যেতে পারব সেখানে। ইতিমধ্যে রাজকার্য সব তুমি একাই পরিচালনা কর। না, না আমাকে আর অন্য কোনো কথা

বোঝানোর চেষ্টা করো না। এখন আমি তোমার কোনো কথা শুনতে রাজি নই।' এইসব কথা বলে রাজা মন্ত্রীকে যেতে বললেন।

পরের দিন যশঃকেতু রাজ্যের সমস্ত ভার মন্ত্রীকে দিয়ে তাপসের বেশে রাত্রে রাজমহল থেকে চলে গেলেন। শুরু হল রাজার যাত্রা। দেশ থেকে দেশে। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। অবশেষে সমুদ্রতীরে। সেখানে লক্ষ্মীদত্ত নামে এক ব্যাবসাদারের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ। আলাপ পরিচয় হল। লক্ষ্মীদত্ত কেনা-বেচার কাজে সুবর্ণ দ্বীপে যাচ্ছিল, রাজাও তার সঙ্গে গেলেন। নৌকা যখন মাঝ সমুদ্রে তখন রাজা সেই বীণাধারিণী সুন্দরীকে দেখলেন। পর মুহূর্তে সুন্দরী সমুদ্রজলে ডুবে গেল। রাজাও ঝাপ দিল সমুদ্রে। সমুদ্রতলে এক বিশাল মহল। তার একটি ঘরে সুন্দর শয্যায় অপরূপ সুন্দরী শুয়ে আছে দেখলেন।

'কে আপনি? এই পাতালে এলেন কী করে? পোশাক তাপসের কিন্তু দেখে যেন মনে হয় আপনি রাজা।' বলল সুন্দরী।

'হে সুন্দরী আমি অঙ্গ দেশের রাজা যশঃকেতু। তোমার কথা এক বন্ধুর কাছ থেকে শুনেছি। তোমার জন্য রাজ্য ত্যাগ করে এই বেশ ধরে এখানে এসেছি। তুমি কে?' রাজা বললেন।

'আমি মৃগাঙ্ক সেন নামে এক বিদ্যাধরের কন্যা মৃগাঙ্কবতী। বাবা আমাকে এখানে ছেড়ে না-জানি কোথায় চলে গেছেন।' সুন্দরী বলল।

রাজা স্ত্রী হিসেবে তাকে গ্রহণ করতে চাইলেন। সুন্দরী একটি শর্ত দিল, 'প্রত্যেক মাসে দুটো অষ্টমী ও দুটো চতুর্দশীর দিন আমি তোমার কাছে থাকতে পারব না। তুমি কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারবে না আমি যাই কোথায়।'

রাজা রাজি হলেন। ওরা স্বামী-স্ত্রী হিসাবে দিন যাপন করতে লাগল। একদিন মৃগাঙ্কবতী বলল, 'আমি এক জরুরি কাজে যাব। এখানকার কুয়োতে ভুলেও নেমো না। ভূলোকে পৌঁছে যাবে।'

কৌতূহলী রাজা গোপনে তাকে অনুসরণ করলেন। দেখতে পেলেন সেই সুন্দরীকে এক রাক্ষস গিলে ফেলল। রাজা রেগে গিয়ে মেরে ফেললেন সেই রাক্ষসকে। পরক্ষণে সেই রাক্ষসের শরীর চিরে মৃগাঙ্কবতী বেরিয়ে এল। অবাক হয়ে রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি স্বপ্ন দেখছি? না এ কোনো মায়ার ছলনা?'

'স্বপ্ন, মায়া কিছুই নয়। আমার বাবার অভিশাপ ছিল। বাবা আমাকে ছাড়া খেতে বসতেন না। প্রত্যেক চতুর্দশী ও অষ্টমীতে আমি শিবের পূজা করতে যাই। একবার পূজা করতে করতে দিন কাটিয়ে দিয়েছিলাম। বাবা আমার অপেক্ষা করে এক ফোঁটা জলও গ্রহণ করেননি। তিনি রেগে গিয়ে আমাকে অভিশাপ দিলেন অষ্টমীতে এবং চতুর্দশীর দিন আমাকে এই রাক্ষস গিলে ফেলবে। আর ওর পেট চিরে আমাকে বেরিয়ে আসতে হবে। রাক্ষসকে যদি কেউ মেরে ফেলে তো আমি শাপমুক্ত হব। আগেকার সমস্ত বিদ্যা আমি ফিরে পাব। এখন আমি শাপমুক্ত। আমি বাবার কাছে ফিরে যাব, তুমি তোমার পথে ফিরে যাও।' মৃগাঙ্কবতী বলল।

রাজা দুঃখে গুমরে উঠলেন। আর একটি সপ্তাহ তাঁর সাথে কাটাতে বললেন। সুন্দরী রাজি হল। সপ্তম দিনে রাজা মৃগাঙ্কবতীকে কুয়োর কাছে নিয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করতে করতে ওকে নিয়েই কুয়োতে ঝাঁপ দিলেন।

তারপর? দু-জনে যশঃকেতুর নগরের একটি কুয়ো থেকে বেরিয়ে এল। এই ঘটনা দীর্ঘদর্শী দেখল। সেইদিন রাত্রেই মন্ত্রী শয্যা নিল। মন্ত্রীর মৃত্যু হল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মহারাজ, দীর্ঘদর্শীর মৃত্যু হল কেন? রাজা ফিরে রাজ্যের সমস্ত ভার নিজের হাতে নিয়েছেন বলে? নাকি সে নিজে পরমা সুন্দরীকে বিয়ে করতে পারল না— এই দুঃখে? আপনি আমার প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দেন আপনার মাথা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'দীর্ঘদর্শীর মৃত্যু এই দুটো কারণে হয়নি। মন্ত্রী বুঝতে পেরেছিলেন যে, যে রাজা সাধারণ সুখ ভোগের মধ্যে ডুবে রাজ্যের সব ভার মন্ত্রীর ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে দোষী করতে চলে গিয়েছিলেন, সেই রাজা এমন পরমা সুন্দরীকে পেয়ে আর রাজকার্য নেবেন কোনোদিন! তাহলে কি মন্ত্রী সারাজীবন অপমান সহ্য করে যাবেন। এই কারণে দীর্ঘদর্শীর অকালে মৃত্যু হল।'

রাজা বিক্রমাদিত্য মুখ খুলতেই সাথে সাথে বেতাল শবসহ গায়েব হয়ে আবার সেই গাছে ঝুলে পড়ল।
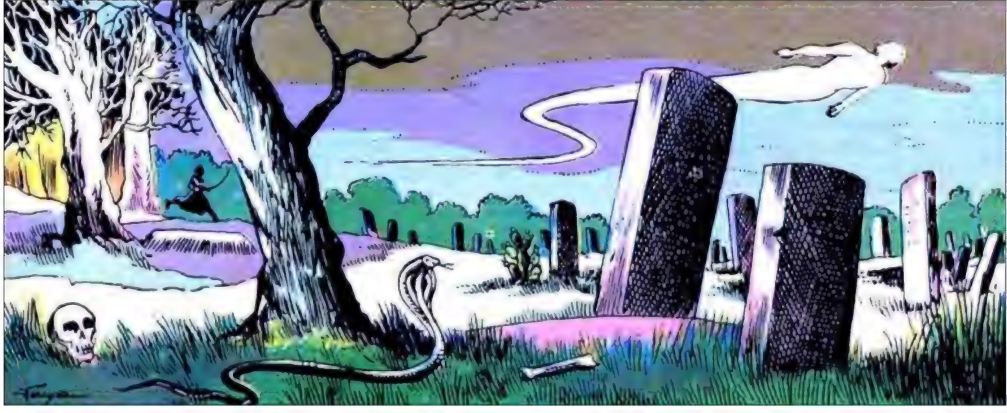
২. রাজার খাতির

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য সেই গাছের কাছে ফিরে গিয়ে, গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে এগোতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি তোমার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যেও না। কেউ কেউ প্রতিজ্ঞার কথা মনে রেখে এগিয়ে যায়। কিন্তু ফল পেয়েও সেই ফল ত্যাগ করে। আমার কথার প্রমাণ স্বরূপ আমি তোমাকে বিশ্বনাথের কাহিনি শোনাচ্ছি।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল:

চিত্রকূটে বিশ্বনাথ নামে একজন কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিল। হয়তো পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে বাচ্চা বয়স থেকে তার মধ্যে সংগীতের প্রতি অনুরাগ জেগেছিল। গানের দিকে তার ঝোঁক দেখে তার বাবা গান শেখার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দিল। বিভিন্ন পণ্ডিতের কাছে ঘুরে গান-বাজনা শিখে বিশ্বনাথ বাড়ি ফিরে এল।

বাড়ি ফিরে এসে চাষের কাজে বাপকে বিশ্বনাথ সাহায্য করতে লাগল। সারাদিন খেতখামারে কাজ করত। দিনের শেষে, সন্ধ্যার সময় সে বারান্দায় বসে বীণা বাজাত, গাইত।

যথাসময়ে বিশ্বনাথের বিয়ে হল। তার স্ত্রীর নাম মীনাক্ষী। মীনাক্ষীও গান-বাজনা ভালোবাসতো। তাই সন্ধ্যার সময় বিশ্বনাথ যখন বাজাত বা গাইত তখন সেও শুনত। ক্রমশ আরও অনেকে বিশ্বনাথের গান-বাজনা শোনার জন্য জড়ো হত। যারা গান-বাজনার ভালো বোদ্ধা তারাও বিশ্বনাথকে প্রশংসা করত।

একজন বলল, 'বিশ্বনাথ, তুমি গান-বাজনা এত ভালো জেনেও ঘরে বসে আছ কেন? তুমি যেকোনো রাজার কাছে গেলে তিনি তাঁর রাজসভায় তোমাকে সাদরে রেখে দেবেন। তুমি কেন এখানে খেতেখামারে সারাদিন পরিশ্রম করছ?'
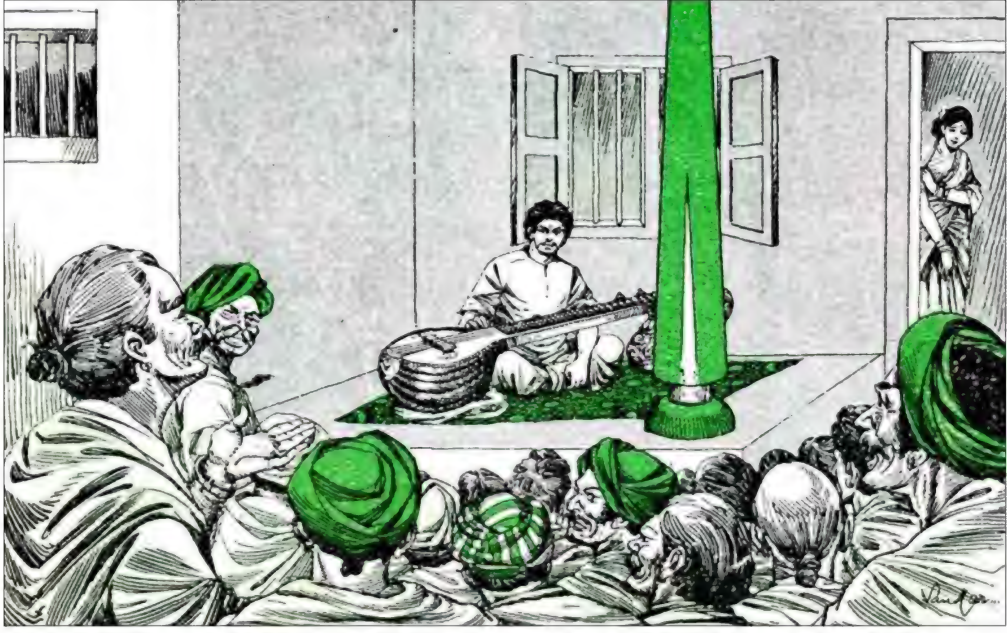
মীনাক্ষীও মনে মনে এই কথাই পোষণ করত। কিন্তু বিশ্বনাথ কোনো রাজাকে খুশি করার জন্য গান শোনাতে রাজি ছিল না। স্বামীর এই মনোভাব মীনাক্ষী জানত। তাই সে তার স্বামীকে এই ধরনের কোনো অনুরোধ করেনি। সে মনে মনে কামনা করত একদিন যেন কেউ এসে তার স্বামীকে সাদরে রাজাকে গান শোনানোর জন্য নিয়ে যায়।

মীনাক্ষীর মনের বাসনা সত্যি সত্যি একদিন পূরণ হল। একদিন বারান্দায় বসে বিশ্বনাথ যথারীতি বীণা বাজাচ্ছিল, কোত্থেকে যেন দু-জন লোক এল। ওরা বসে সারাক্ষণ শুনল। পরে চলে গেল।

ওই দু-জন ছিল ছদ্মবেশে। তাই কেউ বুঝতে পারেনি যে ওরা সেই দেশের রাজা এবং মন্ত্রী ছিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে রাজা বিশ্বনাথকে সাদরে ডেকে পাঠালেন। রাজা বিশ্বনাথকে তার রাজসভায় থাকতে বললেন। বিশ্বনাথ রইল সেখানে। প্রথম প্রথম ওই জায়গাটা তার কাছে কয়েদখানার মতো লাগল। তারপর নিত্যনতুন লোক বিশ্বনাথকে প্রশংসা করতে লাগল। নতুন পরিবেশে, নতুন নতুন মানুষের কাছে প্রশংসা পেয়ে ক্রমশ বিশ্বনাথের ভালো লাগছিল।

কিছুদিন পরে রত্নপুর থেকে চিত্রকূটে এক সংগীতের পণ্ডিত এল তার শিষ্যদের নিয়ে। তার অনুরোধ অনুসারে রাজা ওই পণ্ডিত ও বিশ্বনাথের গানের আসর বসাল। ওই পণ্ডিতের নাম কুঞ্জ। যেহেতু মাত্র দু-জনের আসর সেইহেতু সেটাকে একটা প্রতিযোগিতা হিসাবে সবাই নিয়েছিল।

সেই আসরে বীণা বাজিয়ে বিশ্বনাথ খুব একটা জমাতে পারল না। কুঞ্জ আসর মাত করে দিতে পেরেছিল।

তারপর থেকে বিশ্বনাথের মনে হল রাজা এবং রাজার আশেপাশে যারা থাকে তারা তাকে আগের মতো প্রশংসা করছে না।

'তোমার কী হয়েছে বল তো? প্রত্যেকের ভাগ্যে জয়-পরাজয় আছে।' মীনাক্ষী বলল।

'দেখ, আমি ব্যথা পাচ্ছি রাজার ব্যবহারে।' বিশ্বনাথ বলল।

তারপর বিশ্বনাথ মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিল। সে নিজের গানের চর্চা বাড়িয়ে দিল। ছ-মাস অত্যন্ত পরিশ্রম করে সে আরও উন্নতি করল।

ছ-মাস পরে বিশ্বনাথ রত্নপুরে গেল। কুঞ্জকে গানের আসরে আহ্বান করল। দর্শকরা এবারে আরও ভালো করে বুঝল যে এটা একটা তীব্র প্রতিযোগিতার আসর হবে। সেই আসরে কুঞ্জ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হল।

কুঞ্জকে পরাজিত করে ফিরে আসার পর স্বয়ং রাজা গেলেন বিশ্বনাথের কাছে অভিনন্দন জানাতে। গত ছ-মাস বিশ্বনাথের প্রতি যে অবহেলা দেখানো হয়েছে তারজন্য রাজা ক্ষমা চাইলেন।

'মহারাজ, আমার ইচ্ছে করছে গ্রামে ফিরে যেতে। আমাকে অনুগ্রহ করে বিদায় দিন।' বিশ্বনাথ বলল।

গ্রামে ফিরে এসে বিশ্বনাথ আগের মতো চাষ-আবাদের কাজ করে, দিনের শেষে গান-বাজনা করত। গ্রামের লোক তাকে ঘিরে বসে গান শুনত। এইভাবে বিশ্বনাথ তার বাকি জীবন কাটিয়ে দিল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, বিশ্বনাথকে তাহলে কী ধরনের লোক বলা যায়? প্রথম আসরের পরে যে বিশ্বনাথ মনমরা হয়ে গেল, ছ-মাস ধরে গানের চর্চা বাড়িয়ে দিল, সেই বিশ্বনাথ দ্বিতীয় আসরে কুঞ্জকে পরাজিত করে রাজসভা ছেড়ে দিল কেন? কত সুখে ছিল সে! সেই সুখ ছেড়ে, অত ভালো পরিবেশ ছেড়ে সে ফিরে এল কেন চাষের কাজে? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

বেতালের প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'বিশ্বনাথ গান-বাজনায় যেমন পণ্ডিত ছিল তেমনি সে তার প্রেমিক ছিল। সে আনন্দ পাওয়া এবং দেওয়ার জন্যে গান গাইত বা বীণা বাজাত। পেট ভরানোর জন্য সে চাষের কাজ করত। পণ্ডিত কুঞ্জের কাছে পরাজিত হয়ে সে অপমানবোধ করেনি। অপরপক্ষে রাজা খুব অপমানবোধ করেছিলেন। তাই তিনি বিশ্বনাথের প্রতি ব্যবহার আগের মতো করেননি। বিশ্বনাথ চর্চা বাড়িয়ে প্রমাণ করে দিল যে জয়-পরাজয় চর্চার উপর নির্ভর করে। গান-বাজনাকে জীবিকা হিসাবে নেওয়া ঠিক নয় ভেবে বিশ্বনাথ ফিরে গেল চাষের কাজে।'

এইভাবে রাজার মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৩. ঘরের ছেলে

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে গিয়ে, গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি একজন মহাপণ্ডিত। তোমার মতো পণ্ডিতকেও দেখছি পরিবেশের দাস হয়ে যেতে। এতে আমি অবাক হচ্ছি। অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিও সুবর্ণ সুযোগগুলোকে ঠিক ঠিক ভাবে ব্যবহার করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ তোমাকে এক অরণ্যবাসী বীর যুবকের কাহিনি বলছি। তার নাম বীরু। এই কাহিনি শুনলে তোমার পথ চলার পরিশ্রমও কমে যাবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল:

প্রাচীন কালে কামরূপ দেশের রাজা ছিল মলয়সেন। তার ছেলে-মেয়ে ছিল না। বয়সও তার হয়ে গিয়েছিল। উত্তরাধিকারী কেউ না থাকায় ওই দেশটিকে ছলে-বলে-কৌশলে দখল করার চেষ্টা অনেকেই করেছিল। বহু বার তাকে মেরে ফেলার চক্রান্তও হয়েছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশত মলয়সেন প্রত্যেক বারই বেঁচে গিয়েছিল। কারা যে ওই চক্রান্ত করছিল তা সঠিকভাবে খোঁজ করাও মলয়সেনের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এই যখন অবস্থা তখন পূর্বদেশ থেকে একটি সাদা বাঘ ঢুকে যখন-তখন যাকে-তাকে আক্রমণ করে মেরে ফেলত। এই খবর পেয়ে মলয়সেন ওই বাঘ মারার জন্য বেরিয়ে পড়ল। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও বাঘকে পাওয়া গেল না। রাজার সঙ্গে ছিল দু-জন দেহরক্ষী। ওরা হঠাৎ একই সময়ে তরবারি তুলে রাজাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করল। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য রাজা প্রস্তুত ছিল না। তবু তরবারি তুলে তাদের আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে মলয়সেন।

দু-জন দেহরক্ষীর বিরুদ্ধে একা বৃদ্ধ মলয়সেন পারবে কেন? বেশ বোঝা যাচ্ছিল রাজার মৃত্যু ওদের হাতে নিশ্চিত। এমন সময় এক অরণ্যবাসী যুবক এসে

একজন দেহরক্ষীকে মেরে ফেলল। তাকে মেরে ফেলার কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজা ও ওই যুবকের আক্রমণের ফলে অন্য দেহরক্ষীও মারা পড়ল।

ওই যুবক ছিল অরণ্যবাসী ডাকাতদের সর্দারের ছেলে। তার নাম বীরু। বীরুর বাবা ছিল শিকারে ওস্তাদ। রাজভক্তির জন্য যে বীরু মলয়সেনকে বাঁচিয়েছিল তা নয়, সে লক্ষ করেছিল দু-জন যুবক মিলে একজন বৃদ্ধের উপর আক্রমণ করছে। ওই দৃশ্য দেখে তার ভীষণ রাগ হয়েছিল। এটা মলয়সেন জানত না। সে যুবকের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তার সঙ্গে রাজধানীতে যেতে বলল। রাজধানী বস্তুটা যে কী ধরনের তা দেখার ইচ্ছে জেগেছিল বীরুর মনে। তাই সে যেতে রাজি হল।

রাজধানীতে পৌঁছানোর পর মলয়সেন বলল, 'দেখ বীরু, আমাকে অনেক বার অনেকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে। আমার ছেলেপুলে না থাকায় সবাই চাইছে সিংহাসনে বসতে।'

খেতে বসে দু-গাল খেতে না খেতেই মলয়সেনের শরীর খারাপ হল। কারণ ওই খাদ্যে বিষ মেশানো ছিল।

সঙ্গেসঙ্গে রাজবৈদ্য ও প্রধানমন্ত্রী ছুটে এল। বৈদ্যের ওষুধে কোনো কাজ হল না। মলয়সেন বীরুকেই নিজের উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ঘোষণা করে মারা গেল।

চোখের পলকে যা ঘটে গেল তাতে বীরু অবাক হল। যা দেখছে যা শুনছে সবই তার কাছে নতুন। তার ইচ্ছে করল তক্ষুনি পালাতে। কিন্তু পরক্ষণেই তার আগ্রহ হল রাজাকে কে বিষ দিয়েছে তা জানার।

সিংহাসনে বসার পর বীরুকেও মেরে ফেলার চক্রান্ত শুরু হয়ে গেল। কিন্তু সৌভাগ্যবশত প্রত্যেক বারই বিপদের হাত থেকে সে বেঁচে যেতে লাগল।

ঠিক ওই সময় দেশের চারদিকে ডাকাতি শুরু হল। বীরু বুঝতে পেরেছিল কারা ওই ডাকাতি করছে।

কিছুদিন পরে সেনাপতি বীরুর কাছে এসে বলল, 'মহারাজ, একজন ডাকাতকে আমরা ধরতে পেরেছি। আপনার নির্দেশ পেলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারি।'

বীরু কারাগারে এসে অপরাধীকে দেখতে চাইল। বীরুকে দেখেই আনন্দে ওই ডাকাতের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ওই ডাকাতটি ছিল বীরুর দলের ডাকাত। মাঝরাত্রে বীরু তার ডাকাত সঙ্গীকে মুক্ত করে অরণ্যে পালিয়ে গেল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, বীরু রাতারাতি সিংহাসন ছেড়ে পালিয়ে গেল কেন? তাকে মেরে ফেলার চক্রান্ত হচ্ছিল বলে? নাকি সে বুঝেছিল যে দেশ শাসন করার ক্ষমতা তার মধ্যে নেই? রাজাকে কে বিষ দিয়েছে তা কি সে জানতে পেরেছিল? ডাকাতকে বীরু দিনের বেলায় মুক্ত করল না কেন? আমার এই প্রশ্নের সমাধান জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

বেতালের প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'বীরুর উপর হত্যার চক্রান্ত চলছিল বলে সে ভয় পায়নি। তার দলের লোককে কারাগারে দেখার পর এক সমস্যা দেখা দিল। রাজা হিসাবে ওই ডাকাতকে মুক্ত করলে সারা দেশে খবর ছড়িয়ে পড়ত যে রাজা ডাকাতকে মুক্ত করেছে। ফলে অপমানিত হয়ে একদিন তাকে সিংহাসন ছাড়তে হত। সিংহাসন নিয়ে যখন অনবরত চক্রান্ত চলছিল তখন কে-বা-কারা তা করছে তা জানার কৌতূহল বীরুর মধ্যে কমে গেল। রাজধানীর জীবনের চেয়েও তার কাছে অরণ্যের জীবন বেশি প্রিয় ছিল।'

রাজা বিক্রমাদিত্যের এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে পালিয়ে গেল ওই গাছে।'

৪. বোকার কাহিনি

নাছোড়বান্দা বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে গিয়ে, গাছ থেকে শব নামিয়ে, কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি স্বেচ্ছায় এই পরিশ্রম করছ কি না জানি না। তবে অনেকে স্বেচ্ছায় বিপদের বোঝা কাঁধে তুলে নেয়। হাতের কাছে লাভের সুযোগ এলেও ওরা তা পায়ে ঠেলে দেয়। এই ধরনের এক বোকার কাহিনি বলব। তার নাম চন্দ্রহাস। আমার কাহিনি শুনলে পথ চলার পরিশ্রম কমে যাবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল:

প্রাচীন কালে রবিবর্মা ও শিববর্মা নামে দু-জন রাজা পাশাপাশি ছিল। ওই দুটো দেশের মধ্যে যখন-তখন ঝগড়া বিবাদ এমনকী যুদ্ধও হত। আবার দু-জনের মধ্যে কোনো রাজাই যোগ্য ছিল না।

রবিবর্মার মেয়ের স্বয়ংবর সভায় আমন্ত্রণ করে ডেকে পাঠাল শিববর্মার ছেলে চন্দ্রহাসকে। বিশেষ দূতের মাধ্যমে রবিবর্মা তাকে আমন্ত্রণ জানাল। দূত আমন্ত্রণ জানাতে গিয়ে অনেক ভালো ভালো কথা বলে এল। তার কথার মূল সুর ছিল, যদি এর ফলে উভয় দেশের রাজার মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপিত হয় তাহলে ভবিষ্যৎ অনেক উজ্জ্বল হবে।

এই কথা শুনে শিববর্মা খুব খুশি হল। কারণ তার ছিল একটি মাত্র ছেলে। আবার রবিবর্মার ছিল একটি মেয়ে। চন্দ্রহাসের সঙ্গে যদি রবিবর্মার বিয়ে সত্যি সত্যি হয় তাহলে ভবিষ্যতে দুটো দেশেরই রাজা হবে চন্দ্রহাস। চোদ্দোপুরুষ যুদ্ধ করে যা পারেনি চন্দ্রহাস রবিবর্মার মেয়েকে বিয়ে করে তাই পারবে।

এইসব কথা ভেবে শিববর্মা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে চন্দ্রহাসকে পাঠাতে চাইল। চন্দ্রহাসের কিন্তু যাবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বাপের কথা উপেক্ষা করতেও তার ইচ্ছে করল না। শেষে তার বন্ধু সুবুদ্ধিকে নিয়ে রবিবর্মার দেশে গেল।

বনপথে দুই বন্ধুতে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ ওরা শিকারিদের খপ্পরে পড়ে গেল। ওরা তাদের বন্দি করে সর্দারের কাছে নিয়ে গেল।

সুবুদ্ধি ওদের সর্দারকে বুঝিয়ে বলল, ওরা কোথায় কোন উদ্দেশ্যে যাচ্ছে। ওদের কথায় কান না দিয়ে সর্দার বলল, 'তোমরা যেই হও, যে উদ্দেশ্যে যেখানেই যাও, আমাদের খপ্পরে যখন পড়ে গেছ তখন আমাদের দেবীর কাছে বলি দেবই। আর যদি বলি হতে না চাও আমাদের কুস্তিগিরের সঙ্গে লড়তে হবে। লড়ে যদি জিতে যাও তারপর এখান থেকে যেতে পারবে।'
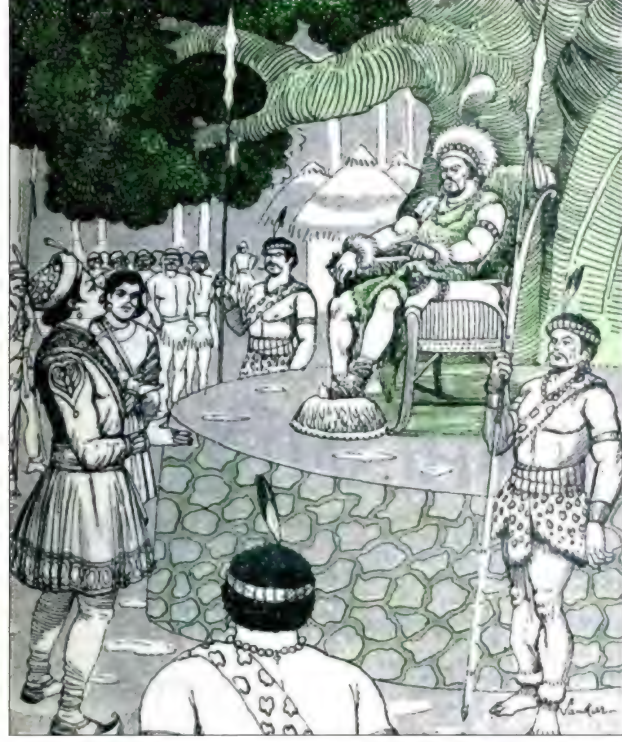
'ঠিক আছে আমি তোমাদের ওই বীরপুরুষের সঙ্গে লড়ব।' বলল চন্দ্রহাস।

'ওরে, এদের চোখ খুলে দে। এরা ঘুরে বেড়াক। কাল সকালে লড়াই হবে।' বলল সর্দার।

শুধু যে চন্দ্রহাস ও সুবুদ্ধিকে বেড়াতে দিল তাই নয় সেই রাত্রে ওদের দু-জনের ভালো খাবারেরও ব্যবস্থা করল সর্দার।

খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে সুবুদ্ধি চন্দ্রহাসকে বলল, 'চন্দ্রহাস, আমি লক্ষ করেছি কেউ আমাদের পাহারা দিচ্ছে না। চল পালাই। তুমি জানো না, এরা এই বনেই থাকে। এদের গায়ে অনেক জোর। এদের সঙ্গে লড়ে তুমি কোনোক্রমেই জিততে পারবে না।'

'কাপুরুষের মতো পালানোর চেয়ে বীরের হাতে মরা ভালো। ওরা আমাদের বিশ্বাস করে ছেড়েছে বলে ওদের আমরা ধোকা দিয়ে পালাব? আমার তো মনে হচ্ছে আমাদের আর কোনো ভয় নেই।' চন্দ্রহাস বলল।

পরের দিন সকালে যথাসময়ে চন্দ্রহাস ও একজন বীর শিকারির মধ্যে লড়াই শুরু হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই চন্দ্রহাস জয়ী হল। তৎক্ষণাৎ সর্দার চন্দ্রহাস ও সুবুদ্ধিকে সসম্মানে বিদায় দিল।

রবিবর্মা চন্দ্রহাসকে দেখে খুব খুশি হল। স্বয়ংবর সভায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। রবিবর্মা চন্দ্রহাসকে বলল, 'কাল তোমার এবং কমলনাথের মধ্যে প্রতিযোগিতা হবে। যে জয়ী হবে তার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে হবে।'

রাত্রে সুবুদ্ধি চন্দ্রহাসকে বলল, 'এই রাজার ব্যাপারটা আমার কাছে খুব পরিষ্কার নয়। যেসব রাজকুমার স্বয়ংবর সভায় এসেছে তাদের প্রত্যেককেই তো তুমি আজকে পরাজিত করেছ। কালকে আবার কমলনাথের সঙ্গে লড়তে হবে কেন? কমলনাথ কে? আজকে সে আসেনি কেন? তুমি বললে আমি এসব প্রশ্ন রাজাকে গিয়ে করে আসতে পারি। বল যাব?'

'না, না যেতে হবে না, আসল ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি,' বলে চন্দ্রহাস পাশ ফিরে শুল।

মাঝরাত্রে উঠে চন্দ্রহাস সুবুদ্ধিকে জাগিয়ে বলল, 'সুবুদ্ধি চল পালাই। সকালের আগেই আমাদের এই দেশ ছেড়ে পালাতে হবে।'

এই কথা শুনে সুবুদ্ধির ঘুম ছুটে গেল। সে বলল, 'সে কী! তুমি কালকে কমলনাথের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে না? এত রাজকুমারকে হারিয়েছ আর তাকে হারাতে পারবে না? নিশ্চয় পারবে। রবিবর্মার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবেই হবে।'

কিন্তু চন্দ্রহাস সুবুদ্ধির কথা কানে তুলল না। সে এগিয়ে গেল। অগত্যা সুবুদ্ধিকেও যেতে হল তার পেছন পেছন।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, চন্দ্রহাস আসলে কি? বোকা?

সাহসী? না কাপুরুষ? শিকারিদের সর্দারকে সে ভয় পেল না। ওদের বীরের সঙ্গে লড়ে জয়ী হল। স্বয়ংবর সভায় যেসব রাজকুমার এসেছিল তাদের সে পরাজিত করল। আবার সে-ই রাত্রের অন্ধকারে সুবুদ্ধিকে নিয়ে পালিয়ে গেল। পরের দিন সকালে কমলনাথের বিরুদ্ধে তাকে প্রতিযোগিতায় নামতে হত। চন্দ্রহাস কি ভয় পেয়েছিল না অন্য কোনো কারণ ছিল?'

বেতালের প্রশ্নের জবাবে বিক্রমাদিত্য বললেন, 'চন্দ্রহাস আসলে বুদ্ধিমান, সাহসী ও গভীর আত্মবিশ্বাসী ছিল। তার রাতারাতি পালিয়ে আসার একটি মাত্র কারণ হল রবিবর্মার বিশ্বাসঘাতকতা। স্বয়ংবর সভায় যারা এসেছিল তাদের প্রত্যেককে পরাজিত করার পর, পরের দিন আর একটি প্রতিযোগিতা করার কোনো কারণ ছিল না। তবু রবিবর্মা যখন তা করল তখন চন্দ্রহাস বুঝে নিল যে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা রবিবর্মার নেই। শিববর্মার মতো চন্দ্রহাসও ভেবেছিল আত্মীয়তা উভয় দেশের মধ্যে স্থাপিত হলে দু-দেশের মধ্যে যুদ্ধ হবে না। চন্দ্রহাসও শান্তি চেয়েছিল। কিন্তু শেষে সে বুঝল রবিবর্মার উদ্দেশ্য। বুঝে সে রাতারাতি নিজের দেশের দিকে রওনা দিল।'

রাজা এইভাবে কথা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৫. দেশভ্রমণ

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তোমার এই পরিশ্রমের জন্য তোমার বাবা দায়ী নয় তো? কারণ কিছু কিছু বাবা আছে যারা ছেলেদের কষ্ট না দিয়ে তৃপ্তি পায় না। একটা কাহিনি বললে আমার কথা আরও পরিষ্কার বোঝা যাবে। কাহিনিটি হল কলিঙ্গরাজ গুণশেখরের। এই কাহিনি শুনতে শুনতে হাঁটলে তোমার পথচলার পরিশ্রম কমে যাবে।' বলে বেতাল শুরু করল:

কলিঙ্গরাজা গুণশেখরের একটিমাত্র ছেলে ছিল। তার নাম ছিল রাজশেখর। যুবক রাজশেখর ছিল সমস্ত বিদ্যায় পণ্ডিত। তার জ্ঞান পূর্ণ হয়েছে বলে পণ্ডিতরা মেনে নিয়েছিল। শুধু পুঁথিগত বিদ্যা হলেই হবে না। দেশ শাসন করতে হলে চাই বাস্তববুদ্ধি ও জ্ঞান। তাই গুণশেখর ছেলেকে দেশভ্রমণ করতে পাঠিয়ে দিল।

বাপের কথামতো রাজশেখর একা বেরিয়ে পড়ল। পূর্ব দিকে সে রওনা দিল। রাজা রাজশেখরের পেছনে নিজের গুপ্তচর পাঠাল। ওদের উপর নির্দেশ ছিল রাজশেখর কোনো বিপদে পড়ে গেলে তাকে উদ্ধার করার। রাজা যে এই ব্যবস্থা করল তা ছেলে জানত না।

রাজশেখর বিভিন্ন দেশ ঘুরে সুন্দর সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে চলতে চলতে একদিন বনের মাঝে রাত হয়ে গেল। ওই অন্ধকারে বনের মাঝখানে কী করবে তা সে ভেবে পাচ্ছিল না। এমন সময় মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। স্বর ছিল অস্পষ্ট। কিন্তু সেটা যে মানুষের সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। যেদিক দিয়ে আওয়াজ আসছিল সেদিকে সে এগিয়ে গেল। কিছু দূর এগোতেই শুনতে পেল মাটির নীচে থেকে আওয়াজটা আসছে। তাকিয়ে দেখল মাটির নীচে সিঁড়ি নেমে গেছে। সেও সিঁড়ি বেয়ে নীচের দিকে নেমে গেল। কিছু দূর যাওয়ার পর তার নজরে পড়ল

পাতাল ভৈরবীর একটি মূর্তি। সেই মূর্তির সামনে একটি থামের সঙ্গে বাঁধা ছিল এক পরমাসুন্দরী। বিগ্রহের সামনে প্রদীপ জ্বলছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে রাজশেখর বুঝল ওই সুন্দরীর কণ্ঠস্বর সে শুনেছিল।

‘কে তুমি? তোমাকে এখানে কে বেঁধে রেখেছে।’ রাজশেখর ওই সুন্দরীকে জিজ্ঞেস করল।

‘আমি মালবদেশের রাজকুমারী। আমার নাম মণিমালা। তান্ত্রিকের ছিল একটি মেয়ে। সে মরে গেছে। সে যে মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করেছিল ঠিক সেই মুহূর্তে জন্মগ্রহণকারী কোনো মেয়েকে বলি দিলে নাকি তান্ত্রিকের মেয়ে বেঁচে উঠবে। নিজের মেয়েকে বাঁচানোর জন্য সে আমাকে ধরে এনেছে। আজ রাত্রেই বলি দেবে।’ ওই সুন্দরী বলল।

‘তোমার কোনো ভয় নেই।’ বলে রাজশেখর থামের পেছনে দাঁড়াল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তান্ত্রিক এসে ওই দেবীমূর্তির সামনে বসে মন্ত্রপাঠ করতে লাগল। এমন সময় রাজশেখর পেছন দিক থেকে এসে তার গলা কেটে ফেলল। তারপর সে মণিমালাকে ঘোড়ায় বসিয়ে মালবদেশের দিকে রওনা দিল।

পরে মণিমালার সঙ্গে রাজশেখরের বিয়ে হল। বিয়ের পর মণিমালাকে নিয়ে রাজশেখর বাড়ি ফিরল।

কিছুদিন যেতে-না-যেতেই গুণশেখর রাজশেখরকে ডেকে বলল, ‘বাবা, দেশভ্রমণ করতে তুমি আবার যাও।’

এবারে রাজশেখর অনেক দূর যাওয়ার পর একের-পর-এক হাড্ডিসার মানুষকে দেখতে পেল। জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, ওদের দেশের রাজা নাকি নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করছে।

রাজশেখর, ওদের দুর্দশা সহ্য করতে না পেরে সোজা চলে গেল ওই দেশের রাজার কাছে। তাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করল।
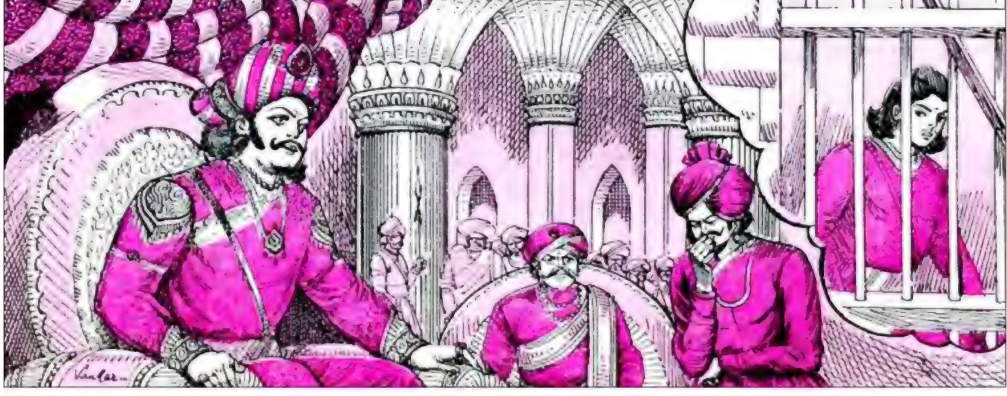
ওই দেশের রাজা মুহূর্তে রেগে গিয়ে রাজশেখরকে বন্দি করল। এই খবর গুপ্তচরদের মাধ্যমে পেয়ে গুণশেখর তৎক্ষণাৎ ওই রাজার বিরুদ্ধে বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। উভয়পক্ষে বিরাট যুদ্ধ হল। যুদ্ধে ওই রাজা পরাজিত হল। পরে ওই দেশ শাসনের ভার রাজশেখরকে দিয়ে গুণশেখর ফিরে এল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'মহারাজ, যা ঘটল তাতে আমার একটা প্রশ্ন জেগেছে। গুণশেখর ছেলের প্রথম বারের দেশভ্রমণ পছন্দ করল না কেন? কোনোরকম দুর্ঘটনা না ঘটার ফলে কি? রাজশেখর সুন্দরী রাজকন্যাকে বিয়ে করায় গুণশেখর কি অসন্তুষ্ট হয়েছিল? দ্বিতীয় বারে দেশভ্রমণ করার পর গুণশেখর ছেলের প্রতি কি সন্তুষ্ট হয়েছিল? আমার এই প্রশ্নের সঠিক সমাধান জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এই প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'রাজা গুণশেখর ছেলেকে দেশভ্রমণে পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য ছিল তাকে ভবিষ্যতে রাজা হিসাবে তৈরি করা। প্রজাদের দুঃখদুর্দশা দেখে রাজশেখরের ইচ্ছা জেগেছিল ওই অত্যাচারী রাজার মোকাবিলা করার। রাজশেখর মনে মনে নিশ্চয় ওই ধরনের অত্যাচারী রাজাকে ঘৃণা করতে শিখেছিল। এইসব দেখে-শুনে কীভাবে দেশ শাসন করলে প্রজাদের মঙ্গল হয় তাও সে অনুভব করেছিল। ছেলের এই ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জিত হওয়ায় বাবা গুণশেখর খুব খুশি হয়ে জয় করা দেশের শাসনের ভার দিয়েছিলেন।'

এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৬. শাস্তি

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য সেই গাছের কাছ গিয়ে, গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি যে কোন মহান আদর্শের জন্য এত পরিশ্রম করছ জানি না। তবে অনেক সময় বড়ো বড়ো আদর্শও ব্যর্থ হয়। আমার কথা আরও পরিষ্কার বুঝতে পারবে একটি কাহিনি শুনলে। এ হল সুশর্মা নামে এক যুবকের কাহিনি। শুনতে শুনতে হাঁটলে হাঁটার পরিশ্রম লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল:

প্রাচীন কালে জলন্ধর দেশে সুশর্মা নামে এক যুবক ছিল। জীবনে তার একটিমাত্র বিষয়ে ঝোঁক ছিল। তা হল মূর্তি দেখা এবং মূর্তি গড়া। প্রত্যেক দিন সে যারা মূর্তি গড়ে তাদের কাছে যেত, মূর্তি গড়া দেখতে। অনেকদিন নিজের খিদে-তৃষ্ণার কথাও ভুলে যেত। শিল্পীরা টানা অনেকদিন তাকে দেখে একদিন তাকে বলল, 'শিল্পকলার বিষয়ে তোমার যখন এত ঝোঁক তখন রাজার শিল্পকলা শিক্ষাকেন্দ্রে ভরতি হও না কেন? সারাজীবন দেখলেই কি মন ভরবে? নিজের হাতে তৈরি করলে তুমি আরও আনন্দ পাবে।'

সুশর্মা ওই শিক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে ভরতি হতে চাইল। কিন্তু সেই কেন্দ্রের কর্তা তাকে বলল, 'দেখ বাবা, শিল্পীদের এই বিদ্যালয়ে যে সে ভরতি হতে পারে না। যার বাবা শিল্পী ছিল সেই ভরতি হতে পারে। জাত ইত্যাদি না দেখে এখানে ভরতি করা যায় না।'

সুশর্মা হতাশ হয়ে ফিরে গেল। পরদিন সে রাজার কাছে এই ব্যাপারে অনুযোগ করল।

রাজা তার কথা শুনে বলল, 'শিল্পের ক্ষেত্রে আগ্রহটাই বড়ো। তোমার বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করে শিক্ষাকেন্দ্রে ভরতি করিয়ে দেব। তবে

একটি শর্তে। তা হল, তোমার সৃষ্ট শিল্পকলা হবে শুধু আমাদের দেশের প্রজাদের ব্যবহারের উপযোগী।'

'তাই হবে মহারাজ।' সুশর্মা বলল। তারপর শিক্ষাকেন্দ্রে ভরতি হয়ে সে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শিল্পচর্চা করতে লাগল।

অনেকদিন পরে ওই কেন্দ্রের কর্তা বলল, 'এখন তুমি বাড়িতে ফিরে গিয়ে নিজেই মূর্তি গড়তে পার। তোমার এখানকার শিক্ষা শেষ হয়েছে।'

তারপর সুশর্মা রাজার কাছে গিয়ে বলল, 'মহারাজ, আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রে যতটা শেখানো হয় ঠিক ততটুকুতে আমি তৃপ্ত হতে পারিনি। আমি দেশে দেশে ঘুরে বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পকলা দেখে আরও কিছু শিখতে চাই। আপনি কি দয়া করে অনুমতি দেবেন?'

রাজা সুশর্মাকে দেশে দেশে ঘোরার অনুমতি দিলেন।

বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে সুশর্মা অসংখ্য মূর্তি দেখল। সেইসব মূর্তি যারা গড়েছে তাদেরও সন্ধান সে খোঁজ করে পেল। সন্ধান পেল না শুধু একটি ক্ষেত্রে। বনের মাঝে একটি পোড়ো মন্দিরে শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন সে দেখেছিল। আশেপাশে কোনো লোক ছিল না। ওই অপূর্ব শিল্পকলা যে কে তৈরি করেছে তা কিছুতেই জানতে পারল না। তখন সে ওই মন্দিরের মাটি কামড়ে পড়ে রইল। কয়েক দিন পরে এক বিচিত্র ধরনের লোক এসে সুশর্মাকে সেখানে তার ওইভাবে পড়ে থাকার কারণ জিজ্ঞেস করল।

'আমি অনেক জায়গায় ঘুরে অসংখ্য শিল্পের নিদর্শন দেখেছি। কিন্তু এই

মন্দিরে যা দেখলাম তার তুলনা নেই। এত ভালো শিল্পের স্রষ্টা যে কে আমি তা জানতে পারছি না। তাই যতদিন না জানব ততদিন এখানেই পড়ে থাকব। আমি জানতে চাই এটা কোন যুগের, কার সৃষ্টি!'

'এ হল কৃত যুগের। এ শিল্প যারা গড়েছে তাদের বংশের কেউ আর এখন বেঁচে নেই।' লোকটা বলল।

সুশর্মা হতাশ হয়ে বলল, 'সে কি? কেউ নেই!'

'তুমি যদি আমার সঙ্গে পাতাললোকে আসো তাহলে আমি এমন এক শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব যিনি শিল্পসৃষ্টির গূঢ় রহস্য জানিয়ে দেবেন।' শুনেই সুশর্মার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে ওই লোকটার সঙ্গে পাতালে গেল। দানবদের শিল্পী যমের সঙ্গে সে দেখা করল। তার ভাঙাচোরা আলয় থেকে সুশর্মাকে যে পাতালে নিয়ে গিয়েছিল সেও ছিল দানব। সুশর্মা যমের কাছে শিল্পসৃষ্টির রহস্য জেনে বিদায় নিয়ে ফিরে এল আবার মর্ত্যভূমিতে। সে পাহাড়ের পাশ দিয়ে হাঁটছিল। হাঁটতে হাঁটতে সে দেখছিল মূর্তি গড়ার উপযোগী পাথর পাওয়া যায় কি না। এক জায়গায় সে ওই ধরনের পাথর দেখতে পেল। সেখানেই থেমে গিয়ে যমের কাছে শিল্পসৃষ্টির যা শিখেছিল তা প্রয়োগ করতে গেল।

শিল্পস্রষ্টা বিশ্বকর্মা সুশর্মাকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা বাবা, এই নির্জন অঞ্চলে যে শিল্প তুমি গড়ছ তা কার জন্য?'

সুশর্মা নিজের সমস্ত ঘটনা জানিয়ে বলল, 'আমি সত্যিকারের শিল্পী হতে চাই। আপনি কি আপনার পরিচয় দেবেন?'

‘আমি বিশ্বকর্মা।’ বিশ্বকর্মা বলল।

সুশর্মা তৎক্ষণাৎ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলল, ‘আমি দানবের সৃষ্ট শিল্পরহস্য জানতে পেরেছি। আপনি অনুগ্রহ করলে দেবতাদের শিল্পরহস্যও জানতে পারি।’

‘দুরাত্মা! পাপী! তুমি সব ভুলে যাও।’ অভিশাপ দিয়ে বিশ্বকর্মা চলে গেল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, ‘রাজা, সুশর্মার উপর বিশ্বকর্মা অত চটলেন কেন? অভিশাপ দিলেন কেন? আমার প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।’

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, ‘অভিশাপের কারণ ছিল। বিশ্বকর্মাকে সুশর্মা যা বলল তাতে মনে হল, সে সারাজীবন শিল্পসৃষ্টির সন্ধান করতে করতেই কাটিয়ে দেবে। প্রজাদের ব্যবহারের উপযোগী কোনো শিল্প সে গড়বে না। অথচ রাজাকে সে কথা দিয়েছিল প্রজাদের ব্যবহারের উপযোগী শিল্প গড়ার। প্রজাদের কল্যাণে যদি কোনো জ্ঞানের প্রয়োগ না হয় তাহলে সে জ্ঞানের কোনো অর্থ হয় না। এরজন্যই বিশ্বকর্মা সুশর্মাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন।’

রাজা এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৭. অক্ষয় পাত্র

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি যে পরিশ্রম করছ, আমার ধারণা, তুমি তার ফল পাবে। অনেকে আবার যত পরিশ্রম করে তার সহস্রগুণ ফল তোলে। ভাগ্যের ফেরে ওরা অবশ্য সেই ফল হারিয়েও ফেলে। আমার বক্তব্যের প্রমাণ স্বরূপ আমি চিদাম্বরের কাহিনি শোনাচ্ছি। কাহিনি শুনতে শুনতে হাঁটলে তোমার পথ চলার পরিশ্রম লাঘব হবে।' বেতাল কাহিনি শুরু করল:

চিদাম্বর ছিল খুব গরিব। কাঠ কেটে সে পেট চালাত। পেটভরে সে খেতে পেত না। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে সে কিছুদিন ধরে আনন্দ ও ভোগবিলাসের স্বপ্ন দেখতে লাগল।

একবার সে কাঠ কাটছিল। ওই গাছের গোড়ায় ছিল একটি সাপের ঢিপি। ঢিপি থেকে একটি সাপ বেরিয়ে এসে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। চিদাম্বর এককোপে সাপকে দু-টুকরো করে ফেলল। তৎক্ষণাৎ সেখানে এক সুপুরুষ চেহারা দেখা গেল। ওই সুপুরুষ বলল, 'চিদাম্বর, তুমি আমাকে শাপমুক্ত করেছ। এক সাধুর অভিশাপের ফলে আমার এই অবস্থা হয়েছিল। আসলে আমি এক যক্ষ। তোমার ইচ্ছেমতো বর চাও, দেব।'

চিদাম্বর যক্ষকে নমস্কার করে বলল, 'প্রভু, আমার মতো গরিব আর কী বর চাইতে পারে? আমি শুধু দু-বেলা পেটভরে খেতে পেলেই খুশি। খেটেখুটে কোনোরকমে আমার পেট চলছে। খাটলেই খাওয়া হয়তো পাওয়া যায়। কিন্তু আমি যতই খাটি না কেন আমি তো আর যক্ষলোক দেখতে পাব না। আপনি দয়া করে আমাকে আপনার লোকে নিয়ে যান। আপনার বিষয়সম্পত্তি আমি দু-চোখ ভরে দেখতে চাই।'

যে চিদাম্বর দু-বেলা পেটভরে খেতে পায় না সে অন্য কোনো বর না চেয়ে চাইল তার যক্ষলোক দেখতে। এতে যক্ষের কৌতূহল লাগল। বর দেওয়ার কথা যখন দিয়েছে তখন কথা রাখতে হয়। তাই যক্ষ বলল, 'ঠিক আছে, তাই হবে। তবে এই পোশাকে আমাদের লোকে তোমার আসা উচিত হবে না। তোমাকেও যক্ষের রূপ ধরে যেতে হবে। তোমার রূপ বদলে যক্ষ বানিয়ে তোমাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। তবে সাবধান, তুমি সেখানে খুব সতর্কভাবে চলবে। মানুষের লক্ষণ যেন প্রকাশ না পায়। সাবধানে না থাকলে তুমি তো বিপদে পড়বেই, আমারও বিপদ ঘটবে।

চিদাম্বর মাথা নেড়ে সাবধানে চলাফেরার কথা দিল। যক্ষ চিদাম্বরকে যক্ষ বানিয়ে নিজের লোকে নিয়ে গেল।

যক্ষলোকে গিয়ে চিদাম্বর স্বপ্ন দেখার মতো সব কিছু অবাক হয়ে দেখতে লাগল। ওদের ধনসম্পত্তি, ভোগবিলাস, আহার-বিহার, যক্ষকন্যাদের সাজগোজ, চলাফেরা দেখে তার মনে হল পৃথিবীতে কোটিপতিরাও ওই ধরনের জীবনযাপন করতে পারে না। সবদিকেই গানের আমেজ, গাছে গাছে ফুল আর ফলের বাহার। দেখে-শুনে চিদাম্বরের মনে হল পৃথিবীর বুকে এক হাজার বছর থাকা আর যক্ষলোকে একদিন থাকার সমান।

এমন সময় এক যক্ষিণী খিলখিল করে হাসতে হাসতে তার হাত ধরে 'বেড়াতে চল' বলল।

তার সুন্দর রূপ দেখে চিদাম্বর বলে ফেলল, 'তুমি কী সুন্দর! তোমার মতো সুন্দরী আমাদের লোকে একটি নেই।'

মুখ ফসকে চিদাম্বর এই কথাগুলো বলে ফেলল।

তৎক্ষণাৎ রেগে গিয়ে সে চিদাম্বরের হাত ছুঁড়ে ফেলে বলল, 'মূর্খ কোথাকার, কে তুমি? যক্ষের রূপ ধরে তুমি এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?' কথা বলার সময় রাগে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল সে।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চিদাম্বর যে যক্ষ তাকে এনেছিল তাকে খুঁজতে লাগল কিন্তু অনেক খুঁজেও তার পাত্তা পেল না। নিরুপায় হয়ে চিদাম্বর যা ঘটেছিল সব যক্ষিণীকে বলে ক্ষমা চাইল। কাকুতিমিনতি করে সে বলল, ‘কী কুক্ষণে আমি বর চেয়েছিলাম। আমাকে আবার নিজের লোকে ফেরত পাঠিয়ে দিলে ভালোভাবে চলব।’

তৎক্ষণাৎ সে শান্তস্বরে বলল, ‘তুমি এক যুবককে শাপমুক্ত করেছ। তাই তোমাকে আমি ক্ষমা করছি। এখন তুমি মনের মতো একটা বর চাইতে পার। বল, কী বর চাই তোমার?’

‘আমি খুব গরিব। কাঠ কেটে পেট চালাই। দু-বেলা সপরিবারে যাতে খেতে পাই সেরকম বর দাও।’ বলল চিদাম্বর।

যক্ষিণী তাকে একটি পাত্র দিয়ে বলল, ‘এটা হল অক্ষয় পাত্র। যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো খাবার চাইলে তুমি এই পাত্রে পাবে। শুধু যে তোমার পরিবারের সকলের জন্যেই তুমি খাবার পাবে তাই নয়, এখান থেকে খাবার নিয়ে তুমি অতিথি সেবাও করতে পারবে। যতটা উচিত, যা চাওয়া উচিত, তাই এই পাত্রের কাছে চাইবে। অনুচিত কিছু চাইলে তুমি আবার তোমার আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। সাবধান, মনে রেখো এই কথা।’

চিদাম্বর পাত্রটি নিয়ে তার কথামতো চলতে রাজি হল। তারপর সে চোখ বুজল। কিছুক্ষণ পরে সে চোখ খুলে দেখল নিজের বাড়ির বিছানায় শুয়ে আছে। ঘুম ভাঙার পর তার মনে হল সে যা যা দেখেছে সব স্বপ্ন। কিন্তু

পরক্ষণেই পাশে দেখতে পেল সেই অক্ষয় পাত্র। সে তখন ওই পাত্রকে নমস্কার করে পায়েস ও মিষ্টি চাইল। সঙ্গেসঙ্গে ওই পাত্রে পায়েস ও মিষ্টি ভরে গেল। এই দৃশ্য দেখে চিদাম্বরের মনে হল সে যা দেখেছে তা স্বপ্ন নয়, সত্য।

কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা গেল চিদাম্বরকে সমাজের সবাই সম্মান দিয়ে চলছে। তার অনেক বন্ধুও জুটে গেল। সে মাঝরাত পর্যন্ত না খেলে ওরাও খেত না। সে যখন খেত তখন তার বন্ধুরাও একসঙ্গে বসে খেত।

একদিন অনেক রাত্রে খেতে বসে ভালো-মন্দ খাওয়ার পর বন্ধুরা ওই পাত্রের কাছে মদ চাইতে বলল। চিদাম্বর কোনোদিন ওই পাত্রের কাছে মদ চায়নি। তাই প্রথমে সে চায়নি। কিন্তু বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে সে ওই পাত্রের কাছে মদ চাইল। ওরা যত মদ চেয়েছিল তত মদ অক্ষয় পাত্রের কাছে পেল। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে চিদাম্বরও মদ খেল। ওরা নেশায় চুর হয়ে নাচতে লাগল।

ওদের নাচ দেখেই চিদাম্বরের মনে পড়ে গেল যক্ষিণীদের নাচ। সে যক্ষিণীদের নাচের প্রশংসা করল। বন্ধুরা তখন তাকে চেপে ধরে বলল, ‘তাহলে আমরাও যক্ষিণীদের নাচ দেখতে পাব না কেন? তুমি চাইলে অক্ষয় পাত্র নাচেরও ব্যবস্থা করে দেবে।’

চিদাম্বর পাত্রের কাছে যক্ষিণী চাইল। কিন্তু যক্ষিণী এল না। নেশায় মত্ত হয়ে লাঠি এনে সে অক্ষয় পাত্রে মারল। পাত্রটি ভেঙে গেল।

পরের দিন থেকে চিদাম্বরকে কুড়ুল নিয়ে গাছ কাটতে বেরুতে হল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, ‘রাজা, যে চিদাম্বর যক্ষের কাছে খাওয়া-দাওয়ার সমস্যা সমাধানের বর চাইল না সেই আবার যক্ষিণীর কাছ থেকে অক্ষয় পাত্র নিল কেন? পাত্রটিকে ভেঙে ফেলল কেন? এই প্রশ্নগুলোর জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।’

এই প্রশ্নের জবাবে বিক্রমাদিত্য বললেন, ‘চিদাম্বর কোনোদিনই বাস্তব পন্থা নেয়নি। সেইজন্যই সে যক্ষলোক দেখার বর চেয়েছিল। তারপর যক্ষিণীর অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সে দু-বেলা খাওয়ার বর চেয়েছিল। ওর একমাত্র সম্বল যে ওই অক্ষয় পাত্র সে-কথা সে ভুলে গিয়েছিল। ভুলে সে ওই পাত্রটি ভেঙে ফেলল। তাই তাকে আগের অবস্থায় চলে যেতে হল।’

রাজার এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে চলে গেল সেই গাছে।

৮. দুই রূপ

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে এসে, গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তোমার এই পরিশ্রম যদি অপূর্ব কোনো ক্ষমতা অর্জনের জন্য হয়, তাহলে সেই ক্ষমতা বা শক্তিকে বিশ্বশ্লোকের মতো অপদার্থের হাতে কখনো সঁপে দিও না। বিশ্বশ্লোকের কাহিনি বললে তোমার শুনতে ভালো লাগবে আর পথচলার পরিশ্রমও লাঘব হবে।' বলে বেতাল বিশ্বশ্লোকের কাহিনি বলতে শুরু করল:

প্রাচীন কালে বিশ্বশ্লোক নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। মন্ত্রশক্তির উপর তার ছিল অগাধ বিশ্বাস। সেই শক্তিকে অর্জন করার জন্য সে বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে সিদ্ধপুরুষের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এইভাবে বহুদিন ধরে খোঁজাখুঁজি করার পর বিন্ধ্যপর্বতে সে এক সিদ্ধপুরুষের সন্ধান পেল। বিশ্বশ্লোক দিনরাত সেই সিদ্ধপুরুষের সেবা করে তাঁর কাছ থেকে একসঙ্গে দুটো রূপ ধারণ করার শক্তি পেল।

'এটা তুমি যাকে-তাকে শিখিও না। যাকে শেখালে জগতের মঙ্গল হবে এমন লোককেই শেখাবে।' বলে তার গুরু বার বার তাকে উপদেশ দিল।

গুরুর কাছে বিদায় নিয়ে বিশ্বশ্লোক দেশে দেশে ঘুরে নিজের এই দুই রূপ ধারণের অসীম ক্ষমতা দেখিয়ে যথেষ্ট সুনাম ও খ্যাতি অর্জন করল।

এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে সে গেল কলিঙ্গ দেশে। তখনকার কলিঙ্গদেশের রাজা ছিলেন দানশীল। রাজা বিশ্বশ্লোককে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'হে মহাত্মা, আপনার এই দুই রূপ ধারণ করার ক্ষমতা দেখে আমি অবাক হয়েছি। আপনি তো দেখেছেন আমি প্রজাদের কত সুখে রেখেছি। আপনার এই অসীম ক্ষমতা আমি যদি পেতাম তাহলে আমি আমার প্রজাদের আরও বেশি করে সেবা করতে পারতাম।'
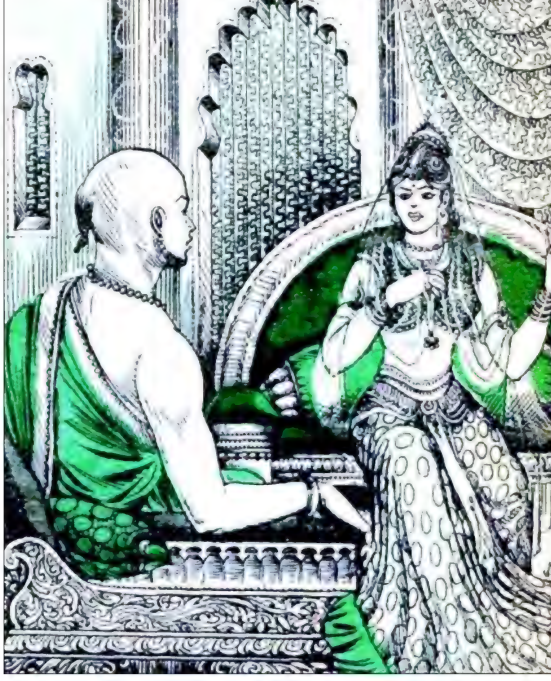
রাজার কথা শুনে বিশ্বশ্লোক মুগ্ধ হল। সেদিন পর্যন্ত বিভিন্ন রাজা তার ওই রূপধারণের খেলা দেখে অবাক হয়েছিল, তাকে পুরস্কার দিয়েছিল। কিন্তু কোনো রাজা ওই বিদ্যা শিখতে চায়নি। কি যে করবে ভেবে পাচ্ছিল না বিশ্বশ্লোক। শেষে সে রাজাকে বলল, 'আপনার প্রস্তাব শুনলাম। এই বিষয়ে আমাকে একটু ভাবতে হবে। আপনাকে এই বিদ্যা শেখানোর ইচ্ছা থাকলে ছ-মাসের মধ্যে আমি আবার আপনার কাছে আসব।' এই কথা বলে বিশ্বশ্লোক বিদায় নিয়ে চলে গেল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে অন্য এক দেশে বিশ্বশ্লোকের খেলা দেখে সেই দেশের রাজকুমারী তাকে বলল, 'হে মহাপুরুষ, আপনি আমার পিতার তুল্য। আমি নিজের একটি সমস্যা নিবেদন করছি। আমাদের আশেপাশে দুটো দেশের দুই যুবরাজ আমার রূপে মুগ্ধ হয়ে আমাকে বিয়ে করতে চায়। একজনকে বিয়ে করলে অন্য যুবরাজ ভীষণ চটে যাবে। তার ফলে হয়তো ওরা আমাদের আক্রমণ করবে। আমাদের চেয়ে আশেপাশে দুটো দেশই যুদ্ধের ব্যাপারে অনেক বেশি শক্তিশালী। এই অবস্থায় দুটো রূপ ধারণ করার বিদ্যা যদি আমাকে শিখিয়ে দেন তাহলে আমি এই সমস্যার সমাধান করতে পারি।'

'আমি ছ-মাসের মধ্যে আমার মত জানাব।' বলে বিশ্বশ্লোক সেখান থেকে চলে গেল।

কাশ্মীরের এক রাজবৈদ্য বিশ্বশ্লোকের হাতে-পায়ে ধরে বলল, 'আপনার মতো মহান পুরুষ আমি আর দেখিনি। আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমাকে দুই রূপ ধারণ করার ক্ষমতা দেন তাহলে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হব।'

বিশ্বশ্লোক ছ-মাসের মধ্যে নিজের মত জানানোর কথা দিয়ে ফিরে গেল।

তারপর বহুদিন পরে সে একটি দেশে গেল। সে দেশের নাম ছিল চন্দনদেশ। সেখানকার লোক খেতে পাচ্ছিল না। যখন-তখন ওদের উপর

চোর-ডাকাতরা অত্যাচার চালাত। সেই দেশের নামকরা ডাকাতের নাম ছিল গঙ্গোত্রী। তাকে লোকে বাঘের মতো ভয় করত। তাকে ধরার জন্য সেদেশের রাজা অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কোনো ফল হল না। চন্দনদেশের রাজা বিশ্বশ্লোকের খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে প্রজাদেরও ওই খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করলেন। একই লোককে দুটো চেহারা ধারণ করতে দেখে প্রজারা খুবই অবাক হয়ে গেল।

কিন্তু সেদিন রাত্রেই বিশ্বশ্লোকের ঘরে ডাকাত গঙ্গোত্রী ঢুকল। সে সোজা তার সামনে এসে বলল, 'জানো, আমি কে? আমার নাম গঙ্গোত্রী। তোমার খেলা আমি দেখেছি। ওই খেলা আমাকে শিখিয়ে দাও, নাহলে আমি তোমার মুণ্ডু কেটে ফেলব।'

বিশ্বশ্লোক হেসে বলল, 'ওই একটা খেলা শেখালেই কি হবে? না অন্যগুলোও তুমি শিখতে চাও?'

'অন্যগুলো শিখে কী হবে? ওই একটাতেই আমার কাজ চলে যাবে।' বলল গঙ্গোত্রী ডাকাত।

'একটা শর্তে শেখাতে পারি। এই বিদ্যা শিখে তুমি কী করবে তা আমাকে জানাতে হবে।' বিশ্বশ্লোক বলল।

'প্রত্যেক দিন চুরি করতে বেরোতে হয়। এ আমার আর ভালো লাগছে না। আমি চাই মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার। একবার রাজার খাজনা খালি করতে পারলে সারাজীবন সুখে বসে খেতে পারব। এই ধরনের কাজ করতে হলে ভীষণ বিশ্বাসী লোক চাই। কিন্তু আমি কাউকে বিশ্বাস করি না। তাই তোমার এই বিদ্যা আমি শিখতে চাই।' গঙ্গোত্রী বলল।

'তুমি যা পাবে তার চার ভাগের এক ভাগ আমাকে দিতে হবে। তবে জেনে রাখো— তোমার একটি শরীর ব্যথা পেলে তুমি অন্য শরীরেও ব্যথা পাবে। আমার বিনা অনুমতিতে তুমি এই বিদ্যা অন্য কাউকে শেখাতে পারবে না। আমার এই সব শর্ত তুমি মেনে চলতে রাজি আছ?' বিশ্বশ্লোক জিজ্ঞাসা করল।

'অত শর্তের কী আছে! আমার তো এই বিদ্যা দরকার শুধু একদিনের জন্যে।' গঙ্গোত্রী চটপট জবাব দিল।

বিশ্বশ্লোক ওই ডাকাতকে দুই রূপের বিদ্যা শিখিয়ে দিয়ে রাজার কাছে গেল। ডাকাত গঙ্গোত্রী যে তাঁর কোষাগার লুণ্ঠন করার তালে আছে তা রাজাকে জানিয়ে বিশ্বশ্লোক নিজের পথে ফিরে গেল।

বেতাল এই কাহিনি বলে রাজা বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করল, 'রাজা,

বিশ্বশ্লোক যে-বিদ্যা কলিঙ্গের রাজা, রাজবৈদ্য ও রাজকুমারীকে শেখাল না তা একটা ডাকাতকে শেখাল কেন? প্রাণের ভয়ে? নাকি চার ভাগের এক ভাগ পাওয়ার আশায়? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হবে।'

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'টাকাপয়সার লোভ থাকলে বিশ্বশ্লোক রাজা, রাজকুমারী অথবা রাজবৈদ্যকে ওই বিদ্যা শিখিয়ে দিত। ডাকাতকে শিখিয়ে সে ভাগ নেওয়ার আশায় সেখানে অপেক্ষা করেনি। সে চন্দনদেশের রাজাকে গোপনে জানিয়ে নিজের পথে চলে গেল। তার কোনো প্রাণের ভয় ছিল না। সে রকম অবস্থায় সে অন্য রূপ ধারণ করে বেঁচে যেতে পারত। ডাকাতকে শিখিয়ে সে দেশের উপকারই করেছে। ঠিক সময়ে গঙ্গোত্রী ডাকাতকে ধরার জন্যই সে রাজাকে আগেভাগে সব কিছু জানিয়ে দিল। রাজা, রাজকুমারী বা রাজবৈদ্যকে শিখিয়ে দেশের কোনো উপকার হত কি না সন্দেহ। ঠিক সময়ে ধরতে না পারলে গঙ্গোত্রী যখন ভাগ দিতে বিশ্বশ্লোকের কাছে আসত তখন সে তাকে রাজার লোকের হাতে তুলে দিতে পারত। এইভাবে একজন ভয়ংকর ডাকাত ধরা পড়ত।'

রাজা বিক্রমাদিত্য উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে আবার ফিরে গেল সেই গাছে।

৯. দার্শনিক

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, কিছু লোক নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে অপমানিত হয়। পতনের পরেও তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ আমি যমদগ্নি নামে এক দার্শনিকের কাহিনি বলছি। এই কাহিনি শুনলে পথচলার পরিশ্রম লাঘব হবে।'

বেতাল তার কাহিনি শুরু করল:

প্রাচীন কালে লক্ষ্মীপুরে যমদিগ্ন নামে একজন লোক ছিল। সে ছিল খুব গরিব ঘরের ছেলে। অভাবের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে, জীবনের প্রতি বিরক্ত হয়ে, সাধু হয়ে দেশে দেশে ঘুরে অনেক জ্ঞান অর্জন করে। যমদগ্নির ধারণা হল জীবনে আনন্দ পেতে হলে দার্শনিক হতে হবে। তার এই ধারণা প্রচার করার জন্য সে ফিরে গেল নিজের গ্রামে, লক্ষ্মীপুরে।

যমদগ্নিকে সাধুবেশে ফিরে আসতে দেখে লক্ষ্মীপুরের গ্রামবাসীরা প্রথমে অবাক হল। পরে সাদরে তাকে গ্রহণ করল। সাধু হওয়ার পর যমদগ্নি নিজের নাম রেখেছিল দয়ানন্দ স্বামী। তার জ্ঞানগর্ভ কথা শুনে গ্রামবাসীরা মুগ্ধ হল। তার উপদেশ শোনার জন্য দিনে দিনে অন্যান্য গ্রামের লোকও দলে দলে আসতে লাগল লক্ষ্মীপুরে।

মানুষের শেষ লক্ষ্য পরমাত্মায় লীন হওয়া। মানুষ হিসেবে যে উত্তম তারই মধ্যে এই উপলব্ধি আসতে পারে। এই বোধ যাতে মনের মধ্যে জাগে তারজন্য মানুষের উচিত বেশিরভাগ সময়ে ভগবানের চিন্তায় সময় কাটানো। যেটুকু পরিশ্রম না করলে সাংসারিক কাজ অচল হয়ে পড়ে সেটুকুই করা উচিত। তার বেশি সময় সাংসারিক কাজে ব্যয় করা উচিত নয়। এ ধরনের নানারকম উপদেশের সঙ্গে অসংখ্য নীতিধর্মের কাহিনি দয়ানন্দ স্বামী বলে যেত।

এই ধরনের উপদেশ দিনের পর দিন শুনতে শুনতে লক্ষ্মীপুরের মানুষের ইচ্ছে করল ঘণ্টার পর ঘণ্টা উপদেশ ও কাহিনি শোনার। কার্যত তারা তাই করত। ওদের মধ্যে একজন ছিল ব্যতিক্রম, নাম রামনাথ। সে লেখাপড়া শিখেছিল। এভাবে সময় কাটানো তার পছন্দ হত না। সে দয়ানন্দ স্বামীকে বলল, 'ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ভালো কিন্তু ঈশ্বরের নামে অলসতাকে প্রশ্রয় দেওয়া ভালো নয়।' দয়ানন্দ স্বামী রামনাথের সঙ্গে একমত হতে পারল না। তার মতে, 'ঈশ্বরের আরাধনাই মানুষের শ্রেষ্ঠ কাজ। একে অলসতা বলা মোটেই উচিত নয়।'

রামনাথও নিজের মতে অটল। সে ঠিক করল, গ্রামবাসীদের মন বদলাতে হবে। কিন্তু সে বুঝতে পারল, যতদিন দয়ানন্দ ওই গ্রামে আছে, গ্রামবাসীরা তার কথায় গুরুত্ব দেবে না। তাই সে পরিকল্পনা করে চেষ্টা করল যাতে দয়ানন্দ অন্য গ্রামে যায়। রামনাথের বন্ধু অন্য গ্রামে ছিল। সেই বন্ধু দয়ানন্দকে অনুরোধ উপরোধ করে, রামনাথের পরিকল্পনা অনুসারে, তার গ্রামে নিয়ে গেল।

তার চলে যাওয়ার পর রামনাথের পরিকল্পনা অনুসারে গাঁয়ের একজনের মাথায় ভগবান ভর করল। সেই লোকটা গাঁয়ের লোকের সামনে বলল, 'এবছর লক্ষ্মীপুরের যে লোক বেশি উৎপাদন করবে সে-ই আমার দর্শন লাভ করবে।'

তারপর থেকে গ্রামবাসীরা চাষ-আবাদের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রত্যেক গ্রামবাসীরা দিনরাত পরিশ্রম করে ফসল বাড়াল। সে বছর সবচেয়ে বেশি ফসল উৎপাদন করল শম্ভু দাস।

সবচেয়ে বেশি ফসল উৎপাদনকারী হিসেবে শম্ভু দাসের নাম ঘোষিত হল। তার পরের দিন পাশের গ্রামের এক ব্রাহ্মণ শম্ভু দাসের বাড়িতে এসে ভিক্ষে চাইল। শম্ভু দাস মহানন্দে ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা দিল। ব্রাহ্মণ শম্ভু দাসকে আশীর্বাদ করে বলল, 'তোমার ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি হোক, তুমি সুখে থাক।'

ওই ব্রাহ্মণ গ্রামের সীমা পেরিয়ে গেলে রামনাথ তার সঙ্গে দেখা করল। রামনাথের কথা অনুসারে সে কাজ করায় তার হাতে কিছু অর্থ দিল। সেখান থেকে ফিরে এসে রামনাথ সোজা শম্ভু দাসের বাড়িতে গেল। তাকে রামনাথ বলল, 'আজকে আমি এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছি।'

শম্ভু দাস সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, 'কী দৃশ্য দেখেছ ভাই রামনাথ, বল না?'

'কিছুক্ষণ আগে গ্রামের সীমানায় এক তেজি ব্রাহ্মণকে দেখেছি। তাকে দেখেই শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে গেল। ঝট করে তাকে প্রণাম করে ফেললাম। আমার প্রণাম গ্রহণ করে তিনি বললেন, 'তোমাদের গ্রাম আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এই গ্রামে খুব পরিশ্রমী ভক্ত আছে।' তাঁর এই কথা শুনে আমি, আমরা কীভাবে কাজ করি, এবছর সবচেয়ে বেশি উৎপাদন কে করেছে, কেন করেছে ইত্যাদি বললাম। হ্যাঁ, ভালো কথা, তুমি যে ভগবানের দর্শন লাভের জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করছ তাও জানিয়েছি। আমার কথা শুনে ওই তেজি ব্রাহ্মণ একগাল হেসে বললেন, 'পরিশ্রমের অন্য নাম পূজা। অধিক পরিশ্রম করেছে বলেই শম্ভু দাস অধিক ফসল পেয়েছে। আমি জানি, আজকেই শম্ভু দাস ভগবানেরও দর্শন পেয়ে গেছে।' তারপর জানো, আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। অনেক প্রশ্ন তাঁকে করার ইচ্ছা হতেই তিনি চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ আমি সেখান থেকে নড়তে পারিনি। এখন আমি সেখান থেকেই ছুটে এলাম। কী ব্যাপার বল তো শম্ভু? তুমি কি সত্যই ভগবানের দর্শন পেয়েছ?

রামনাথের কথা শুনে শম্ভু দাসের মনে হল, ভিক্ষে করতে যে ব্রাহ্মণ এসেছিল সে-ই ছিল স্বয়ং ভগবান। তারপর, কিছুক্ষণের মধ্যেই এই খবর সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। গ্রামবাসীরা মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করতে লাগল, 'পরিশ্রমের অন্য নাম পূজা।' গ্রামবাসীদের মধ্যে সে কী উন্মাদনা! প্রত্যেকেই পরিশ্রম করতে লাগল, ফলে ফসল বেশি হল।

কয়েক বছর পরে দয়ানন্দ স্বামী গ্রামে ফিরে এল। গ্রামে ঢুকে সকলের অবস্থা এবং পুজোপাট হচ্ছে না দেখে বড়ো দুঃখ পেল। কেউ তার উপদেশ শোনার জন্য ছুটে আসছে না। প্রত্যেকেই যে-যার কাজে মগ্ন। দয়ানন্দ মনের দুঃখ মনেই চেপে রেখে নতুন উদ্যোগে গ্রামবাসীদের মধ্যে উপদেশ

বিতরণ করতে লাগল। একদিন হঠাৎ রামনাথ তার সামনে হাজির হয়ে তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করে তাকে ঘাবড়ে দিল। রামনাথের প্রশ্ন ছিল, 'হে মহাপুরুষ, বিশাল এই বিশ্বে এত জায়গা থাকতে আপনি শুধু এই গ্রামেই পড়ে থাকতে চান কেন?'

'এটাই যে আমার জন্মস্থান!'

'তাহলে এই গ্রামের প্রতি আপনার মোহ আছে। আপনারই যখন মোহ আছে, সাধারণ মানুষের মোহ থাকবে না কেন?' রামনাথ বলল।

'আমার মোহ নেই। মানুষ যদি কামনা বাসনা মেটাতেই সারাজীবন কাটায় তাহলে ভগবানের চিন্তা করবে কখন? সাধারণ মানুষকে মোহমুক্ত করা আমার কর্তব্য।' দয়ানন্দ বলল।

'আপনিও কোনো-না-কোনো মোহের বশেই এসব করছেন। নিশ্চয় আপনার কোনো স্বার্থ আছে।' রামনাথ বলল।

জবাবে দয়ানন্দ রেগে গিয়ে বলল, 'না, কোনো মোহ নেই, কোনো স্বার্থ নেই।'

'গাঁয়ের মানুষ এত যে পরিশ্রম করছে এতে ওদেরও কোনো স্বার্থ নেই। স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের জন্য ওরা পরিশ্রম করছে। নরের মধ্যেই তো নারায়ণ আছে। ঋষিরা বলেন, মানব সেবাই শ্রেষ্ঠ সেবা। তাই একজন মানুষ আর একজন মানুষের জন্য যদি পরিশ্রম করে তবে দোষের কি আছে? সেটা কি ভগবানের পূজা নয়?' রামনাথ দয়ানন্দকে মোক্ষমভাবে ধরল।

দয়ানন্দ বিরক্ত হয়ে বলল, 'দেখ ভাই, মানব সেবার নামে তুমি ভগবানের নিন্দা করছ। ওসব হল উপলব্ধির ব্যাপার। তোমার মতো মূর্খরাই মানুষকে খারাপ করে দেয়।'

'এই দেখুন, আপনি সমস্ত রিপু জয় করেছেন বলেছিলেন। অথচ এখন রেগে যাচ্ছেন। রাগও তো রিপু।' রামনাথ কিছুটা উত্তেজিত হয়েই বলল।

দয়ানন্দ তার প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে হাত জোড় করে রামনাথকে নমস্কার করে বলল, 'আমার ধারণা ছিল, দর্শনের সারকথা আমি বুঝে ফেলেছি, যা বুঝেছি, অন্যদের তা বোঝাতে পারি। কিন্তু আজ বুঝলাম, যে আমি কিছুই জানি না দর্শন সম্পর্কে। আমার আচরণের জন্য আমি দুঃখিত। ভাই রামনাথ— আমায় ক্ষমা কর।'

তারপর সে বাকি জীবনটা সাধারণ মানুষের মতো চাষ-আবাদের কাজ করে কাটাতে চেয়েছিল। কিন্তু রামনাথ তাকে অনুরোধ করল, 'আপনি এবার থেকে গাঁয়ের ছেলে-মেয়েদের একটি ঘরে বসিয়ে লেখাপড়া শেখান। গাঁয়ের মানুষের অক্ষরজ্ঞান অন্তত হোক।'

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, রামনাথ তো দয়ানন্দকে পছন্দ করত না, তবু তাকে বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখাতে বলল কেন? কোন উদ্দেশ্যে তাকে তর্কে পরাজিত করল? আমার এই প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তালে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এই প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'রামনাথ দয়ানন্দ নামধারী যমদগ্নিকে কোনোদিন গ্রামছাড়া করতে চায়নি। যমদগ্নির প্রতি রামনাথের ভালোবাসা ছিল। কারণ গ্রামের প্রতি টান ছিল। যে মুহূর্তে দয়ানন্দ নিজের ভুল বুঝতে পারল সেই মুহূর্তে রামনাথের মন তার প্রতি দরদি হয়ে উঠল। তাই তাকে সে অন্য গ্রামে যেতে দিল না, চাষ-আবাদের কাজও করতে দিল না। উপযুক্ত কাজ করাল। যমদগ্নি খেতে না পেয়ে ভবঘুরের জীবনযাপন করতে করতে দয়ানন্দ হয়েছিল। তার ওই জীবনের মূলে ছিল দারিদ্র্য। আবার যাতে যমদগ্নি খেতে না পেয়ে ভবঘুরের জীবন না নেয় তারজন্যই গ্রামের ছেলে-মেয়েদের রামনাথ লেখাপড়া শেখাতে বলল। মানুষকে শ্রমবিমুখ না করে শ্রমমুখীন করার উদ্দেশ্যে রামনাথ দয়ানন্দকে তর্কে পরাজিত করেছিল।'

রাজা এইভাবে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে আবার ফিরে গেল সেই গাছে।

১০. গরিবের কথা

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবের বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি মনে কর না যে একমাত্র সাধনা এবং তপস্যার মাধ্যমেই বিরাট শক্তির অধিকারী হওয়া যায়। যে শক্তি পাওয়ার জন্য তুমি এত চেষ্টা করছ তা একজন সাধারণ গরিব মানুষের মধ্যেও থাকতে পারে। আমি এমন এক গরিবের কাহিনি শোনাব যার ফলে আমার বক্তব্য তুমি পরিষ্কার বুঝতে পারবে, আর শুনতে শুনতে হাঁটলে তোমার পরিশ্রমও লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল:

কোনো এক গ্রামে একজন গরিব ছিল। তার কোনো আত্মীয়স্বজন ছিল না। সে প্রত্যেক দিন ওই গ্রামের একটি পুকুরে চান করে শিবমন্দিরে ঢুকত। যেসব ভক্ত মন্দিরে আসত, পুজো দিত, তারা তাকেও দু-একটি ফল খেতে দিত। কেউ কেউ পয়সাও দিত। যেদিন যা পেত তাই ওই গরিব লোকটা খেত। যেদিন পেত না সেদিন খেত না। সে না খেয়েও সেখানেই পড়ে থাকত। অন্য কোথাও সে যেত না।

একদিন এক লক্ষপতি বউকে নিয়ে শিবমন্দিরে পুজো দিতে এসেছিল। তার কোনো ছেলে-মেয়ে ছিল না।

সে পুজো দিয়ে ফেরার সময় তার সামনে একটি কলা ফেলে দিয়েছিল। কলাটি তুলে নিয়ে লক্ষপতিকে ফেরত দিতে দিতে ওই গরিব লোকটা বলল, 'এই কলা তোমার বউকে খেতে দাও। এক বছরের মধ্যে তার একটি ছেলে হবে।'

যার যা থাকে না তারজন্য তার দুঃখ থাকে বেশি। যে যা চায় সে তা পায় না। লক্ষপতি সন্তান চায় কিন্তু সে তা পায়নি।

লক্ষপতির সন্তানের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। সে বউকে কলা খেতে দিল।
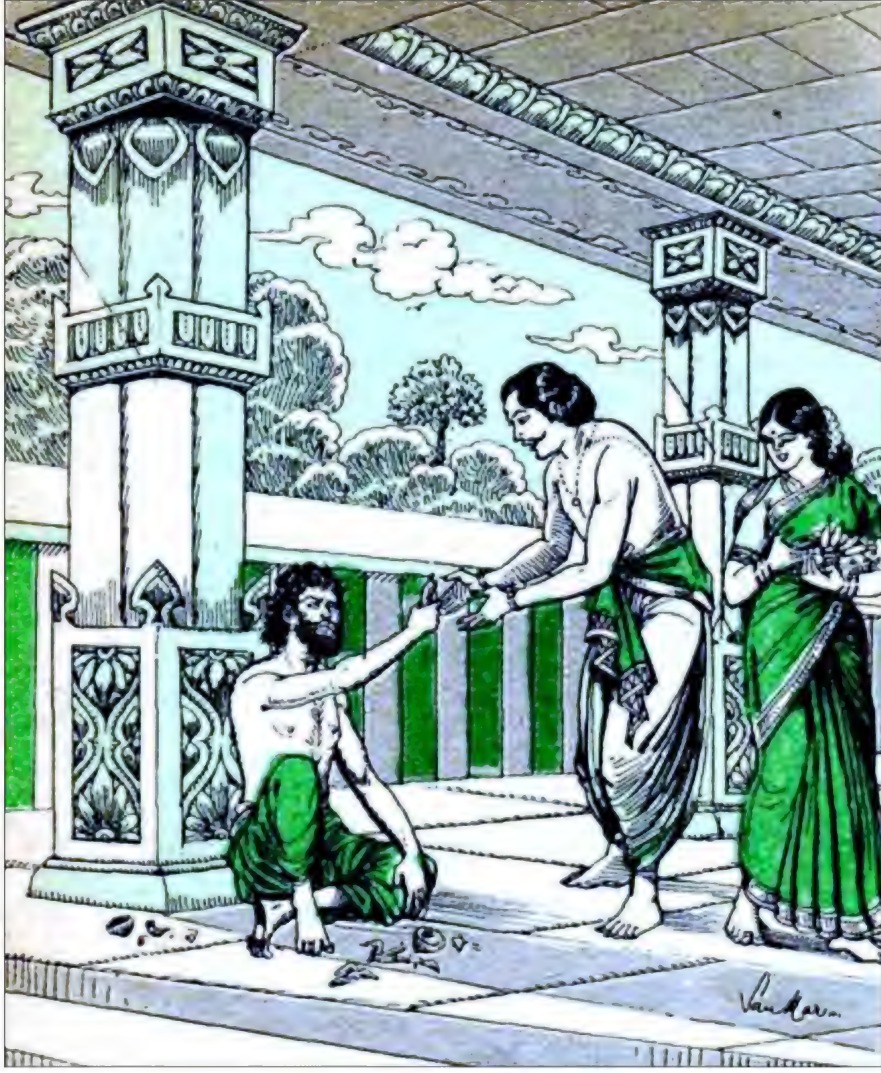
এক বছরের মধ্যে লক্ষপতির বউ একটি ছেলের মা হল। লক্ষপতি ভাবল, গরিব লোকটা সাধারণ লোক নয়। অসীম ক্ষমতার অধিকারী সে। এই কথা ভেবে সে ওই গরিব লোকটার কাছে গেল। তাকে দেখে গরিব লোকটা বলল, 'কি ছেলে রাতদিন কাঁদছে বুঝি?'

লক্ষপতি তার কথা শুনে অবাক হয়ে বলল, 'আপনি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন। আপনার ক্ষমতা অসীম। আপনার আশীর্বাদে আমি ধন্য হয়েছি। আপনি যা চাইবেন আমি তাই দেব। আপনি অনুগ্রহ করে কিছু নিলে আমি ধন্য হব। বলুন, আমি আপনাকে কী দিয়ে ধন্য হতে পারি।'

লক্ষপতি বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও গরিব লোকটা একটি কথাও প্রথমে বলল না। অনেকক্ষণ ধরে একই কথা বলতে থাকায় গরিব লোকটা মুখ খুলল।

'আমার কোনো কিছুর দরকার নেই। তবে তুমি একটু ভালো হও। গরিবদের বড্ড ঠকাচ্ছ। চুরিচামারি করে বড্ড বেশি লাভ করছ। এত লাভ কর না। পাপ বেড়ে যাবে। তোমার অপকর্মের জন্যে তোমার ছেলের অমঙ্গল হবে।'

লক্ষপতি সেদিন থেকে গরিবদের ঠকানো বন্ধ করে দিল। যার যত জিনিস বন্ধক রেখেছিল সব ফেরত দিল। তারপর থেকে সাধারণ ছোটোখাটো ব্যাবসা করে সে দিন যাপন করতে লাগল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, গরিব লোকটার কথা খেটে গেল কী করে? ওর কথায় এত শক্তি এল কোত্থেকে? শুধু শিব ঠাকুরের প্রসাদের উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করলেই কি এতটা ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এই প্রশ্নের জবাবে বিক্রমাদিত্য বললেন, 'গরিব লোকটার প্রত্যেকটি কথা যদি ফলে যেত তাহলে গাঁয়ের লোক হয়তো অনেক দিন আগেই তাকে মাথায় করে রাখত। কোনো কোনো কথা মাঝে মাঝে ফলে যায়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। অনেক তীর্থ ঘুরে যা হয়নি গরিব লোকটার দেওয়া কলা খেয়ে যখন সন্তান হল তখন স্বাভাবিকভাবেই তাকে অসীম ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে হয়েছিল লক্ষপতির।

বিক্রমাদিত্যের মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শবসহ নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

১১. ঋণ মুক্তি

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, জানি না, জীবনের উপর বিরক্তি জাগার ফলে হয়তো তুমি এভাবে এতটা পরিশ্রম করছ। তবু আমি যতটা জানি বিরক্ত হয়ে অনেক সময় মরতে চাইলেও মৃত্যু আসে না। আমার কাহিনির প্রমাণ স্বরূপ আমি তোমাকে গোপালের কাহিনি শোনাব। আমার এই কাহিনি শুনলে পথ চলার পরিশ্রম কমবে।' এই কথা বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল:

মহান্তিপুরে গোপাল পামে এক গরিব লোক নিরুপায় হয়ে ভিক্ষে করে দিন কাটাত। লোকটা এমন হতভাগা যে এক বেলা খেতে পেলে তিন বেলা উপোস করতে বাধ্য হত।

একদিন রামানন্দ নামে এক দৈবজ্ঞ পণ্ডিত শিষ্যদের নিয়ে কাশী যাওয়ার পথে মহান্তিপুরে পৌঁছাল। অত বড়ো পণ্ডিতকে নিজেদের গাঁয়ে পেয়ে প্রত্যেকে তাকে সুখ-দুঃখের কথা বলল এবং কীভাবে যে তারা নিজেদের সীমাহীন দুঃখ দূর করবে তা জানতে চাইল।

পাড়ার সবাই যখন ওই পণ্ডিতের কাছে তখন গোপাল আর স্থির থাকতে পারল না। সেও গিয়ে নিজের খেতে না পাওয়ার, দুঃখের দিনগুলোর কথা সবিস্তারে পণ্ডিতকে জানাল। সব কথা জানানোর পরে এর প্রতিকার কীভাবে হবে তাও গোপাল জানতে চাইল।

'জীবনে তোমার দুঃখ-দারিদ্র্য দূর হবে না।' রামানন্দ পণ্ডিত বলল।

'প্রভু, তাহলে আমাকে বলে দিন কীভাবে আমি মুক্তি পেতে পারি।'

পাশের শহরে রামসাহা, ভীমসাহা ও সোমনাথ সাহা নামে তিন জন ব্যবসায়ী আছে। এই তিন জন তোমার কাছে ঋণী। প্রত্যেকের কাছ থেকে

তুমি একটি করে স্বর্ণমুদ্রা পাবে। এই ঋণ ওরা শোধ করার পরে তোমার মৃত্যু হতে পারে।' রামানন্দ পণ্ডিত বলল।

গোপাল রামানন্দ পণ্ডিতের কথা শুনে তাকে প্রণাম করে চলে গেল পাশের শহরে। গিয়ে ওই তিন জনের সঙ্গে দেখা করল। গোপাল প্রত্যেককে একটা করে সোনার মুদ্রা দিতে বলল। ওরা আর কথা না বাড়িয়ে প্রত্যেকে গোপালকে একটি করে সোনার মুদ্রা দিয়ে দিল।

গোপাল ওই তিনটি সোনার মুদ্রা খরচ করে গরিবদের খাইয়ে দিয়ে ভাবল, 'সত্যি আজ আমি মুক্তি পাব। আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে সে কী বলব! যেকোনো মুহূর্তে আমার মৃত্যু হতে পারে। বনে গিয়ে মরাই ভালো। কারণ বনে মরে গেলে যেকোনো জন্তুজানোয়ার মহানন্দে পেটপুরে আমাকে খাবে।

সে গভীর বনে গেল। দু-দিন ধরে সেখানে পড়ে রইল। দু-দিনেও তার মৃত্যু না হওয়ায় সে অবাক হল। বনের বাঘ বা সিংহ এসে তাকে খেল না। অত বড়ো পণ্ডিতের কথা কেন যে ফলছে না তা সে ভেবে পেল না। সে টলতে টলতে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে একটি গর্তে পড়ে গেল।

'যাক, স্বয়ং ভগবান তাহলে আমার জন্য একটা গর্ত খুঁড়ে রেখেছেন। আর দেরি নেই, এই গর্তেই আমার মৃত্যু হবে।' ভাবতে ভাবতে গোপাল এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। তার চোখে পড়ল চকচকে একটি জিনিস। হাতে তুলে নিয়েই গোপাল বুঝতে পারল ওটা সোনা। তারপর সে যত তুলল তত সোনা পেল। যত সোনা পারল তুলে গোপাল বাড়ি ফিরল। সেই

সোনা দিয়ে চাল, ডাল, নুন, তেল কিনে সে গরিবদের খাওয়াতে লাগল। গোপাল কোত্থেকে যে অত সোনা পেল তা সে কাউকে জানাল না, কেউ তাকে সে প্রশ্নও করল না।

মোটকথা পণ্ডিতের কথা ফলেনি। অত সোনা পেয়েও সে অহংকারী হয়নি, সে গরিবদের সঙ্গে ছিল, তাদেরই জন্য সে সোনা খরচ করতে লাগল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, গোপাল মরল না কেন? অত বড়ো পণ্ডিতের কথার কি দাম নেই? একেবারে মিথ্যে হয়ে গেল অত বড়ো পণ্ডিতের কথা? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে একেবারে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'রামানন্দ পণ্ডিতের কথা মিথ্যা হয়নি। কারণ গোপাল ওই তিন জন ব্যবসায়ীর কাছে যা পেয়েছিল তার অনেকগুলো গরিবদের দিয়ে ওদের ঋণী করে রাখল। যে তিনটি সোনার মুদ্রা পেয়েছিল সেগুলো খরচ করে সে যদি নিজের পেট পূরণ করত তাহলে হয়তো তার মৃত্যু হত। কিন্তু সে দান করত বলেই যেভাবে যা ঘটার ছিল তা ঘটেনি। মৃত্যুর পরে ওর দেহ যাতে জন্তুরা খায় তারজন্য সে বনে গেল। নিজেকে নিঃশেষে অন্যের স্বার্থে লাগানোর এই ইচ্ছার জন্যই সে গর্তে পেল অত সোনা। ফলে তার ঋণীদের সংখ্যা আরও বেড়ে গেল।'

রাজার এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শবসহ আবার ফিরে গেল সেই গাছে।

১২. প্রতিজ্ঞা

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্য আবার গাছের কাছে গিয়ে গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে আগের মতোই যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি হয়তো তোমার কোনো প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য এত পরিশ্রম করছ। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঝোঁকের মাথায় প্রতিজ্ঞা করলেও শেষপর্যন্ত সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা যায় না। আমার এই কথার নিদর্শন স্বরূপ তোমাকে একটি সুন্দর কাহিনি বলছি। এই কাহিনি শুনলে তোমার ভালো লাগবে ও পথ চলার পরিশ্রম কমবে।' এই কথা বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল:

প্রাচীন কালে মালবদেশ ও পঞ্চালদেশের মধ্যে একবার প্রচণ্ড বিরোধিতা দেখা দিল। মালবদেশের রাজার নাম ছিল বীরসেন। তার ছেলের নাম ছিল বিজয়সিংহ। পঞ্চালদেশের রাজার নাম ছিল বিমলাদিত্য। ওই রাজার একটি মেয়ে ছিল। নাম মণিমালা। সে খুব সুন্দরী ও নম্রস্বভাবা ছিল। যথাসময়ে মণিমালার জন্য পাত্র বাছাই করতে স্বয়ংবর সভা ডাকা হল। বিভিন্ন দেশে খবর পাঠানো হল। সুন্দরী মণিমালাকে বিয়ে করার আশায় বহু যুবক, এমনকী বহু দেশের বহু বয়স্ক রাজাও মণিমালার স্বয়ংবর সভায় এসে হাজির হল।

তবে বিমলাদিত্য তার শত্রু বীরসেনের কাছে মণিমালার এই স্বয়ংবর সভার কোনো খবর বা আমন্ত্রণ পাঠায়নি। এতে বীরসেনের ভীষণ রাগ হল। এদিকে বীরসেনের ভীষণ আগ্রহ ছিল মণিমালাকে যেনতেনপ্রকারেণ নিজের কবলে আনার।

বীরসেন তার ছেলে বিজয়সিংকে ডেকে বলল, 'তুমি এক্ষুনি তৈরি হও। তোমাকে যুদ্ধে যেতে হবে। তুমি একাই পারবে। সৈন্য নিয়ে পঞ্চালদেশ আক্রমণ করে রাজকুমারী মণিমালাকে তুলে নিয়ে এসো। হ্যাঁ, শোনো, আমি স্থির করেছি মণিমালাকে বিয়ে করব।'

বিজয়সিংহ পঞ্চালদেশ আক্রমণ করে জয়ী হল। পরাজিত বিমলাদিত্য পালিয়ে প্রাণে বাঁচল। রাজবাড়ির সবাই বিজয়সিংহের হাতে বন্দি হল। বিজয়সিংহের নির্দেশে মণিমালাকে সসম্মানে তার সামনে হাজির করা হল। বিজয়সিংহকে দেখে মণিমালা চোখ ফেরাতে পারল না।

কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেকে সংযত করে বিজয়সিংহ বলল, 'রাজকুমারী, আপনাকে বিয়ে করতে আমার বাবা আগ্রহী। তাই আগামীকাল আমাদের দেশে যাওয়ার জন্য তৈরি থাকবেন।'

মণিমালা বিজয়সিংহের এই কথার জবাবে কোনো কথা না বলে বিজয়সিংহের কথা শেষ হওয়ার পর ধীরে ধীরে নিজের ঘরে চলে গেল।

সেই রাত্রে বিজয়সিংহের ঘুম হল না। সারাক্ষণ তার চোখের সামনে মণিমালার মুখ ভাসতে লাগল। সে মাঝে মাঝে বিছানা ছেড়ে উঠে বারান্দায় পায়চারি করছিল। হঠাৎ মণিমালার এক চাকর একটি চিঠি এনে তার হাতে দিল। সেই চিঠিতে লেখা ছিল: 'যুদ্ধ করে বীরের মতো যে বস্তু জয় করা হয় তা অন্যের হাতে দিয়ে দেওয়া একান্ত অনুচিত।'

বিজয়সিংহ বুঝতে পারল মণিমালা তাকে বিয়ে করতে চায়। প্রথম দর্শনেই মণিমালাকে তার ভালো লেগেছে। তার ওপর এই চিঠি পেয়ে বিজয়সিংহ ঠিক করল মণিমালাকে সে-ই বিয়ে করবে। পরের দিন মণিমালাকে নিয়ে মালবদেশে ফিরে যাওয়ার কথা। বহু সময় ধরে ভেবে ভেবে অবশেষে সেদিনই বিজয়সিংহ মণিমালাকে বিয়ে করল।

সেই রাত্রে সে মণিমালাকে স্ত্রী হিসাবে পেয়ে মহানন্দে তাকে কাছে টানতে যেতেই তার বুকে একটি ছোরা ঠেকে গেল। মণিমালা ছোরা নিয়ে প্রস্তুত ছিল। বিজয়সিংহ তাকে আলিঙ্গন করতে যাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে সে ছোরা চালাতে গেল। বিজয়সিংহ ঝট করে তার হাত ধরে বেঁকিয়ে তাকে প্রশ্ন করল, 'আমাকে যে চিঠি দিয়েছিলে তাতে আমার মনে হয়েছিল তুমি আমায়

ভালোবাস; তুমি কি ভালোবাসার অভিনয় করেছিলে? সত্যি বল, তা না হলে তুমি আমার হাতেই কঠোর শাস্তি পাবে।’

‘যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বাবা আমাকে শেষ কথা বলেছিলেন প্রতিশোধ নিতে। আমি তাঁর শেষ ইচ্ছা পূরণ করার চেষ্টা করেছি মাত্র।’

বিজয়সিংহ কিছুক্ষণ কী যেন ভেবে, কর্তব্য স্থির করে হঠাৎ কোথায় যেন চলে গেল। তারপর থেকে তার খোঁজ আর কেউ কোনোদিনই পেল না।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, ‘রাজা, মণিমালাকে বিজয়সিংহও তো ভালোবেসেছিল, তাকে ছেড়ে সে চলে গেল কেন? সে কি মণিমালাকে ক্ষমা করতে পারেনি? মণিমালা তো বলেছিল তার ভালোবাসা অভিনয় নয়। তবু তার কথা কি বিজয়সিংহের বিশ্বাস হল না? আমার প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও না দিলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।’

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, ‘মণিমালাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য বিজয়সিংহকে দোষ দেওয়া যায় না। মণিমালার ছোরা তার বুকে বিদ্ধ হলে সে মারা যেত, মণিমালা একাই পড়ে থাকত। ওর চলে যাওয়ার কারণ অন্য। সে মণিমালার কাছে একটি শিক্ষা পেয়েছিল। মণিমালা বিজয়সিংহকে ভালোবেসেও বাপের ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করেছে। কিন্তু সে মণিমালাকে ভালোবেসে বাপের ইচ্ছার কথা ভুলে গিয়েছিল। তাই সে নিজের দেশে না ফিরে অন্য দেশে পাড়ি দিল।’

রাজার এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে আবার ফিরে গেল সেই গাছে।

১৩. অনুভবানন্দ

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। এমন সময় শব থেকে বেতাল বলল, 'রাজা, বার বার ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও তুমি যে বিরক্ত হচ্ছ না তাতে আমি অবাক হচ্ছি। ভাগ্য বিরূপ হলে অনেকে বিফল মনে, হতাশ হয়ে অরণ্যের দিকে পাড়ি দেয়। আমার কথার প্রমাণ স্বরূপ তোমাকে আমি ধনগুপ্তের কাহিনি শোনাব। সেই কাহিনি শুনে তোমার খুব ভালো লাগবে এবং তোমার পথচলার পরিশ্রমও লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল:

ধনগুপ্ত ছিল এক ব্যাবসাদারের ছেলে। বাপের অনেক সম্পত্তি সে পেয়েছিল। তার ঝোঁক ছিল ভোগবিলাসের দিকে। কিন্তু ব্যাবসা এমন একটা জিনিস যা করতে হলে ভোগবিলাসে গা ভাসানোর সময় তেমন থাকে না। ফলে ধনগুপ্তের কিছুদিনের মধ্যেই বিরক্তি জাগল। সে ভাবল, অত কষ্ট করে ব্যাবসা না করে জুয়ো খেলে টাকা রোজগার করবে। ধনগুপ্ত আস্তে আস্তে ব্যাবসা ছেড়ে চুটিয়ে জুয়ো খেলা শুরু করল। খেলতে খেলতে সে যেমন মোটা টাকা হারত আবার তেমনি জিততও। কিছুদিন এইভাবে চলার পর একদিন সে হঠাৎ সমস্ত ধনসম্পত্তি খুইয়ে রাস্তার ভিখারি হল।

এই ঘটনার ফলে ধনগুপ্তের মনে জীবনের প্রতি বিরক্তি জাগল। তার আর ইচ্ছা করল না সমাজে বাস করতে। সে হিংস্র জন্তুর কথা ভেবেও, জীবনের মায়া ছেড়ে অরণ্যের দিকে পা বাড়াল। কিছুকাল পরে তার চুল দাড়ি বেড়ে গেল, চুলে জট ধরল। তাকে তখন ঠিক একটা পাগলের মতো দেখাচ্ছিল।

একদিন ধনগুপ্ত কাউকে কিছু না বলে একবস্ত্রে বাড়িঘর ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। সে ভাবল: যেদিকে দু-চোখ যায় সেদিকেই যাবে। এইভাবে অত সম্পদ হারিয়ে, ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় তার যে খারাপ

লাগছিল না তা নয়, তবে বন্ধনহীন মুক্ত জীবনও কম আকর্ষণীও নয়। এবং সেই আকর্ষণেই ধনগুপ্ত এত সহজে সব ছেড়েছুড়ে চলে যেতে পারল। এইভাবে বহুদূর গিয়ে সে বিরাট অরণ্যের প্রান্তে এসে দাঁড়াল।

অদূরে বহু অরণ্যবাসী ছিল। সে বছর ফসল না হওয়ায় ওরা দূরে দূরে গিয়ে শিকারে লাগল। হঠাৎ ওদের নজর পড়ল ধনগুপ্তের ওপর। তার বিরাট বিরাট দাড়ি গোঁফ দেখে তারা অবাক হল। তারা আরও অবাক হল এই দেখে যে ধনগুপ্তের কাছে কোনো অস্ত্র নেই। যে বনে এত বাঘ ভালুক সেখানে নিরস্ত্র মানুষকে দেখে ওদের অবাক হওয়ারই কথা। ওরা ভাবল এ মানুষ নয়, দেবতা নিশ্চয়। ওরা তার পায়ে পড়ে প্রণাম করল। তখন ওদের দিকে তাকিয়ে ধনগুপ্ত হাসি হাসি মুখে বলল, 'কী চাও তোমরা?'

'আপনি আমাদের আস্তানায় এলে আমাদের ভাগ্য খুলে যাবে।' ওরা বলল।

কথা না বাড়িয়ে ধনগুপ্ত ওদের ডেরায় চলে গেল। ধনগুপ্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এতদিন বাদে মুষলধারে বৃষ্টি হল।

অরণ্যবাসীরা ভাবল, এটা ধনগুপ্তের মাহাত্মের ফলে হয়েছে। ভালো বৃষ্টি হওয়ায় সে বছর সমস্ত এলাকায় ভালো ফসল হয়েছিল। তার ফলে অরণ্যবাসীদের ঘরে ঘরে আনন্দ দেখা দিল।

সে দেশের রাজার সঙ্গে অরণ্যবাসীদের বিবাদ ছিল। ওদের সবসময় রাজা দাবিয়ে রাখতেন। রাজার কানে গেল যে অরণ্যবাসীদের অবস্থা ভালো হচ্ছে। তিনি তাদের দাবিয়ে রাখার জন্য বিরাট এক সেনাবাহিনী পাঠালেন। এদিকে অরণ্যবাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তারা যেহেতু একজন মহাপুরুষকে তাদের কাছে পেয়ে গেছে সেহেতু তারা হেরে যেতে পারে না। তাই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুদ্ধ করে রাজার সেনাবাহিনীকে তারা হটিয়ে দিল।

রাজার সেনাবাহিনী হেরে যাওয়ায় রাজা খুব অবাক হলেন। তিনি কারণ জানতে গুপ্তচর পাঠালেন। গুপ্তচর ফিরে এসে মহাপুরুষের আগমনের কথা জানাল। শুনে রাজারও বিশ্বাস হল যে নিশ্চয় কোনো মহাশক্তি অরণ্যবাসীকে সাহায্য করছে। তাই তিনি ভাবলেন, অরণ্যবাসীকে জব্দ করার আগে ওই মহাপুরুষকে লাভ করা তাঁর পক্ষে উচিত হবে। রাজা গোপনে ধনগুপ্তের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে তাঁর রাজ্যে আসার আহ্বান জানালেন।

ধনগুপ্ত ভাবল যে ওই অরণ্যে থাকার চেয়ে রাজার অধীনে থাকলে তার অনেক উন্নতি হবে। তাই সে অরণ্যবাসীদের না জানিয়ে সোজা রাজার কাছে চলে গেল।

রাজা সাদরে তাকে গ্রহণ করে তার নাম জানতে চাইলেন। জবাবে ধনগুপ্ত বলল, ‘আমার নাম অনুভবানন্দস্বামী।’

ধনগুপ্তের এই রাজার কাছে আসার দু-এক দিনের মধ্যেই তাঁর একটি কঠিন রোগ সেরে গেল। রাজা যথারীতি রোগমুক্তির জন্য বৈদ্যদের প্রশংসা করলেও মনে মনে তিনি বুঝেছিলেন যে এ নিশ্চয় এই মহাপুরুষ অনুভবানন্দের মহিমা।

রাজা তাঁর অনুভবানন্দের জন্য একটি বাড়ি তৈরি করালেন। দেখতে দেখতে রাজার কাছাকাছি যারা থাকে তারাও অনুভবানন্দের ভক্ত হয়ে গেল। ধনগুপ্ত অবস্থা বুঝে দু-চারটি করে কথা বলত। রাজধানীর মতো ধনবহুল স্থানে অনুভবানন্দ হয়ে থাকা যে কত কষ্টকর তা সে কিছুদিনের মধ্যে হাড়ে হাড়ে টের পেল।

কিছুদিন পরে ওই রাজার সঙ্গে ধনগুপ্তের দেশের রাজার বিরোধ বাধল। রাজা যুদ্ধে যাওয়ার আগে ধনগুপ্তের কাছে এসে আশীর্বাদ প্রার্থনা করল। ধনগুপ্ত বাধ্য হয়ে বলল, 'বিজয়োস্তু।' এইভাবে নিজের দেশের পরাজয় কামনা করে ধনগুপ্ত মনে মনে দগ্ধ হল। কিন্তু তখন এ ছাড়া আর তার করার কিছু ছিল না।

রাজা যুদ্ধে গেলেন। কিছুদিনের মধ্যেই যুদ্ধ জয় করে ফিরে এলেন। ফেরার পথেই রাজা ঠিক করলেন: এবার অনুভবানন্দস্বামীর আশ্রম বড়ো করব। আরও ঘটা করে তার পুজো দেব। কিন্তু ফিরে এসে রাজা আর অনুভবানন্দস্বামীর দর্শন পেলেন না। তারপর আর কেউ কোনোদিন এই অনুভবানন্দকে দেখেনি।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, অরণ্যবাসীর নজরে পড়ার পর ধনগুপ্তের মনে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। জীবনের প্রতি তার যে বিরক্তি জেগেছিল সেটাও লোপ পেয়েছিল। কিন্তু আবার সে সংসারে ঝামেলায় কেন গেল? নিজের দেশকে যে রাজা পরাজিত করেছে তার কাছ থেকে সে কি প্রশংসা পেতে চায়নি? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি তুমি না দাও তাহলে জেনে রাখ তোমার মাথা এক্ষুনি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

রাজা বিক্রমাদিত্য জবাবে বললেন, 'ধনগুপ্ত জানত নিজের দেশ ও নিজের দেশের রাজাকে। সে বুঝেছিল যে তার দেশ হেরে যাবে। তার নিজের যে তেমন কোনো ঐশ্বরিক ক্ষমতা নেই, তাও সে জানত। অত ক্ষমতা তার থাকলে সে জুয়ো খেলায় ধনসম্পত্তি হারাত না। তবু তার নিজের দেশের পরাজয়ের জন্য রাজাকে সে আশীর্বাদ করল। এতে সে মনে মনে খুবই দুঃখ পেল। আর তা ছাড়া একটি ভয় ছিল তার সবসময়। তা হল তার যে তেমন কোনো ঐশ্বরিক ক্ষমতা নেই তা যেকোনো মুহূর্তে লোকের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। এই ভয়ে এবং ওই দুঃখে সে রাজধানীর সুখ ছেড়ে একদিন বনপথে হারিয়ে গেল।'

রাজা বিক্রমাদিত্য এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

১৪. নাস্তিকের দৈবভক্তি

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন তিনি নীরবে। তখন শব থেকে বেতাল বলল, 'রাজা, একজন মানুষ আস্তিক অথবা নাস্তিক হতে পারে। কিন্তু আমি একজনের কাহিনি বলব যে দুটোই ছিল। কাহিনিটি শুনলে পথচলার পরিশ্রমও লাঘব হবে।' বলে বেতাল তার কাহিনি শুরু করল:

কোনো এক দেশে রামেশ্বর নামে একজন লোক ছিল। গরিবদের সে খুব সাহায্য করত। গরিবের দুঃখে তার প্রাণ কাঁদত। তবে তার ঠাকুরদেবতার প্রতি ভক্তি ছিল না। কোনো মন্দিরে সে ঢুকত না। সে ছিল নাস্তিক। তার ধারণা ছিল অসহায় মানুষকে সেবা করার চেয়ে ইহজগতে বড়ো ধর্ম আর কিছু নেই।

একবার রামেশ্বরের মেজো ছেলের কঠিন অসুখ করল। তার কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নগরের বড়ো বড়ো বৈদ্য এসেও রামেশ্বরকে ভরসা দিতে পারল না। তার ওই বিপদের সময়ে বন্ধু আত্মীয়স্বজনরা তাকে বলল, 'যেহেতু তুমি নাস্তিক সেইহেতু তোমাকে ভগবান পরীক্ষা করে দেখছেন। ভালো চাও তো প্রায়শ্চিত্ত কর। ঠাকুরের নামে মানত কর।'

'আমি নাস্তিক হয়ে ভগবান অথবা মানুষের ক্ষতি করিনি। নাস্তিক বলে যদি ঠাকুর আমাকে শাস্তি দিতে চান তাহলে তিনি কী ধরনের ঠাকুর! যা ঘটে থাকুক, আমি কোনো দেবতার নামে মানত করব না।' রামেশ্বর পরিষ্কার বলল।

রামেশ্বরের স্ত্রী স্বামীকে না জানিয়ে এক হাজার এক টাকা খরচ করে পুজো দেওয়ার মানত করল। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হল না। কিছুদিন পরে ঠাকুরদেবতার উপর রামেশ্বরের স্ত্রীরও বিশ্বাস কমে গেল।

কিছুদিন পরে সেই গ্রামে এক মহাপুরুষ এল। চারদিকে রটে গেল ওই

মহাপুরুষের ক্ষমতা অসীম। তার হাতের ছোঁয়া পেলে অন্ধ লোক আলো দেখতে পায়, যেকোনো কঠিন অসুখ সে নাকি সারিয়ে দিতে পারে। রামেশ্বরের স্ত্রী স্বামীকে বলল, 'কে নাকি মহাপুরুষ এসেছেন, ছেলেকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে দেখালে হত না? উনি নাকি দেবতা।'

'মানুষ আবার দেবতা হবে কী করে? আমি তো শুনেছি একটা সাধু এসেছে। সাধু যদি রোগ সারায় বৈদ্য করবে কী? এসবে আমার বিশ্বাস নেই।'

তারপর ছেলেকে নিয়ে রামেশ্বর বিভিন্ন দেশ ঘুরে বহু নামকরা বৈদ্যকে দেখাল। কিন্তু কোনো ফল হল না। কিছুদিন পরে মহাবিষ নামে এক বৈদ্য দেশে দেশে ঘুরতে ঘুরতে রামেশ্বরদের গ্রামে এল। ওই বৈদ্যের হাত দিয়ে নাকি নানা ধরনের রুগি সেরে উঠেছে। মহাবিষ গ্রামে ঢোকার পরের দিন থেকে চারদিকের লোক এসে ভেঙে পড়ল। রামেশ্বরও ছেলেকে নিয়ে গিয়ে ওই বৈদ্যকে দেখাল। ছেলেকে পরীক্ষা করে মহাবিষ তিনটি পুরিয়া দিল। দিনে একটি করে খেতে হবে।

একপুরিয়া খাওয়ার পরেই ছেলের ঠোঁট নড়ে উঠল। মুখে ক্ষীণ শব্দ শোনা গেল। দ্বিতীয় পুরিয়া খাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে সে ভালোভাবেই কথা বলতে পারল। তৃতীয় পুরিয়া খাওয়ানোর পর রামেশ্বর মহাবিষের কাছে গিয়ে বলল, 'প্রভু, আপনি অসামান্য বৈদ্য। আমার দুর্ভাগ্য যে আমি এতদিন আপনার সন্ধান পাইনি।'

মহাবিষ হেসে বলল 'আমার কাছে নানা ধরনের ওষুধ আছে। রোগ যদি সেরে থাকে ওষুধের জন্যই সেরেছে। অন্য কোনো কারণে নয়। সাধারণ রোগ যেকোনো বৈদ্য সারাতে পারে। কিন্তু আমার কাছে বহু কঠিন কঠিন রোগ সারানোর ওষুধ থাকায় আমি দেশে দেশে ঘুরি। ওষুধ খেয়ে সেরে ওঠার পর যে যা আমাকে দেয় আমি তাই নিই।'

রামেশ্বর তার হাতে এক হাজার টাকা দিয়ে তার পায়ে প্রণাম করে বলল, 'প্রভু, এতদিন ভেবেছিলাম ভগবান নেই কিন্তু আজ মনে হচ্ছে আপনিই ভগবান।'

মহাবিষ রামেশ্বরকে হাত দিয়ে ধরে তুলে বলল, 'দেবতার প্রতি তোমার বিশ্বাস নেই? তুমি হয়তো প্রত্যক্ষ দৈবস্বামীর দর্শন পাওনি। তাঁর দর্শন পেলে দেবতার উপর তোমার বিশ্বাস জাগত। আমি তাঁর ভক্ত। তাঁর নির্দেশেই আমি দেশে দেশে ঘুরে রুগিদের দেখি। পারলে একবার তুমি তাঁর দর্শন করে এসো।'

মহাবিষ যেহেতু বলল, সেহেতু কথাটা যেন রামেশ্বরের মনে গেঁথে

গেল। সে প্রত্যক্ষ দৈবস্বামী দর্শন করে এল। ফেরার পর স্ত্রীর প্রশ্নের জবাবে রামেশ্বর বলল, 'ওঁকে দেখে তো এমন কিছু মনে হল না। লোকে যে তাঁকে কেন ভগবান মনে করে বুঝতে পারি না। আমার কাছে মহাবিষই হল সাক্ষাৎ দেবতা।'

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, এখন তুমিই বল, রামেশ্বরকে কী বলা যায়? নাস্তিক না আস্তিক? যে লোকটা কোনোদিন মন্দিরে ঢোকেনি সে মহাবিষের মধ্যে দেবতার সন্ধান পেল কী করে? মহাবিষ যাঁর শিষ্য তাঁর মধ্যে সে দেবতার সন্ধান পেল না কেন? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও না দিলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'
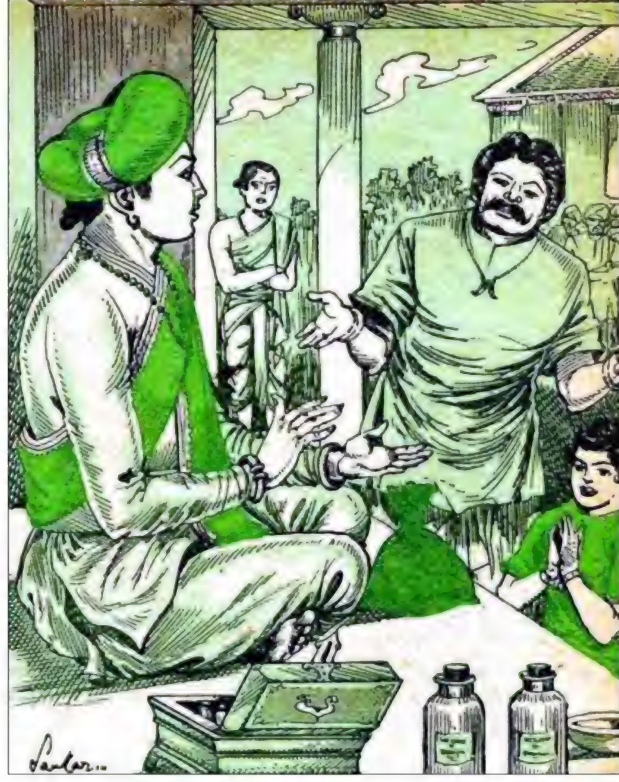
রাজা বিক্রমাদিত্য এই প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'ভগবানের কোনো আকার নেই। তিনি যে কখন কাকে কোনরূপে দেখা দেবেন তা কেউ জানে না। বিভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন মত। একমতের লোক অন্য মতের মানুষকে নাস্তিক বলে। যাঁরা ঠাকুরদেবতা বিশ্বাস করে তারা সব কিছুর জন্য ঠাকুরদেবতাকেই দায়ী করে। তা না করাতেই রামেশ্বর ওদের চোখে নাস্তিক হয়ে গেল। মহাবিষ রুগিদের রোগ সারানোই জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছে। নিজের ছেলে সেরে ওঠার পর মহাবিষের মধ্যে দেবতার দর্শন লাভ রামেশ্বরের পক্ষে স্বাভাবিক। যিনি একজায়গায় বসে উপদেশ বিতরণ করেন তাঁর মধ্যে দেবতার সন্ধান পায়নি রামেশ্বর। তাকে দেখে রামেশ্বরের মনে হয়েছে তিনি একজন সাধারণ মানুষ। তাই রামেশ্বরের মধ্যে পরস্পরবিরোধী কোনো মত নেই। সে যা ছিল তাই রইল।'

বিক্রমাদিত্য রাজার এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শবসহ আবার ফিরে গেল সেই গাছে।

১৫. ঠাকুরের ইচ্ছা

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের গাছে ফিরে গিয়ে গাছ থেকে শব নামিয়ে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলে উঠল, 'রাজা, মানুষের চেষ্টার উপর তোমার গভীর বিশ্বাস আছে। আমি তা লক্ষ করেছি। কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর এক। ভগবান যে কখন কোন কাজটা মানুষকে দিয়ে করিয়ে নেন তা কেউ বলতে পারে না। আমার কথা যে কতখানি সত্য তার প্রমাণ পাওয়া যাবে একটি কাহিনি শুনলে। কাহিনিটি শুনলে আমার ধারণা পথচলার পরিশ্রমও কমবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল:

বসন্তদেশের রাজা ছিল নামকরা বীর। তার সিংহাসনে বসার কিছুদিনের মধ্যেই প্রতিবেশী দেশ হেমন্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হল। ওই যুদ্ধে বসন্তদেশের রাজার জয় হল। ফলে সিংহাসনে বসতে না বসতেই বসন্তদেশের রাজা দু-টি দেশের রাজা হয়ে গেলেন।

যুদ্ধে দুটো দেশেরই প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হল। লোকজন মারা গেল। ধনসম্পত্তি নষ্ট হল। রাজা ছিল মহাবীর। এত সহজে একটি দেশ জয় করে ফেলায় তার মনে আরও অনেক দেশ যুদ্ধ করে জয় করার ইচ্ছা জাগতে পারে। ফলে বহু প্রজা মারা যাবে। অগাধ ধনসম্পত্তি নষ্ট হবে। এই কথা ভেবে মন্ত্রী রাজজ্যোতিষীকে রাজার ঠিকুজিকোষ্ঠী দেখতে বলল।

'মহামন্ত্রী, আমাদের রাজা শুধুমাত্র দু-টি দেশেরই রাজা হতে পারবেন। কোনো কারণে আর একটি বার যদি তাকে অন্য দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয় তখন কিন্তু তাকে দুটো দেশই হারাতে হবে।'

জ্যোতিষী মন্ত্রীকে গোপনে জানাতে চাইলেও হঠাৎ রাজা সেখানে উপস্থিত হওয়ায় কথাগুলোও রাজার কানে গেল। শুনেই রাজা জ্যোতিষীকে বলল, 'দেখ জ্যোতিষী বীরত্ব এমন একটা জিনিস যা দিনকে রাত করতে পারে।'

'মহারাজ, যেকোনো যুদ্ধের জয়-পরাজয় শুধু রাজার উপর নির্ভর করে না। সৈন্যরা যদি ঠিকমতো না চলে, তাদের খাদ্য যদি ঠিকসময় না পৌঁছায়, যুদ্ধে জয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। এ ছাড়া সবার উপরে আছে দেবতার আশীর্বাদ। আপনার ভাগ্যে দেবতার আশীর্বাদ বলতে যা বোঝায় তার কিছু নেই।' জ্যোতিষী সুচিন্তিত বক্তব্য বলার মতো বলল।

'তুমি যা বললে আমি তা মিথ্যা প্রমাণ করে দিতে পারি। আমি আরও একটা দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।' রাজা বলল।

'মহারাজ, তার আগে বিভিন্ন দেশের বীরদের আপনার বিরুদ্ধে তরবারি যুদ্ধে আহ্বান করতে পারেন। আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা যে কারও নেই আগে তা প্রমাণ হয়ে গেলে খুব ভালো হবে।'

রাজা তাই করল। বিভিন্ন দেশের বীরদের তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আহ্বান জানাল। বহু বীর এসে রাজার কাছে পরাজিত হল। যারা পরাজিত হত রাজা তাদের সসম্মানে পুরস্কার দিয়ে বিদায় করত। বহু রাজা মনে মনে ভাবল, এত বড়ো বড়ো বীর আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে না এটাই আমার ভাগ্য।

এইভাবে বহু বছর কেটে গেল। রাজজ্যোতিষীর ছোটো ভাই ছিল সমস্ত দেশের রাজজ্যোতিষী।

বসন্তদেশের রাজার কোনো ছেলে ছিল না। অপূর্ব সুন্দরী একটি মেয়ে ছিল। যেমন ছিল তার রূপ তেমনি ছিল তার গুণ। প্রকৃতপক্ষে সেই বসন্তদেশ এবং হেমন্তদেশের উত্তরাধিকারিণী ছিল।

সমন্তদেশের রাজা ছিল যুবক। ওই রাজকুমারীকে বিয়ে করার ইচ্ছা সমন্তদেশের রাজারও ছিল। সে ওই কথা রাজজ্যোতিষীর কাছে গোপনে প্রকাশ করল।

রাজজ্যোতিষী ঠিকুজি দেখে বলল, 'মহারাজ, আপনি তিনটি দেশের রাজা হবেন। এখন আপনি বসন্তদেশের রাজার কাছে দূত পাঠিয়ে জানিয়ে দিতে পারেন যে আপনার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা যদি তিনি না করেন তাহলে আপনি তার দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। তারপর দেখা যাক কী হয়।'

সমন্তদেশের রাজা বসন্তদেশের রাজার কাছে জ্যোতিষীর কথামতোই খবর পাঠাল। বসন্তদেশের রাজা তৎক্ষণাৎ সমন্তদেশের রাজার সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিলেন।

বেতাল এই কাহিনি বলে রাজা বিক্রমাদিত্যকে বলল, 'রাজা, বসন্তদেশের রাজার মতো একজন বীর রাজা সমন্তদেশের রাজার ছোট্ট হুমকিতে এতটা ভয় পেয়ে গেল কেন? অন্যের হাতেই তো চলে গেল নিজের দুটো দেশ। নাকি বসন্তদেশের রাজা নিজের বীরত্বের উপর বিশ্বাস হারিয়েছিল? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'বসন্তদেশের রাজার জ্যোতিষীর কথায় পুরো বিশ্বাস ছিল। তাই তিনি জ্যোতিষীর কথামতো চলেছেন। অন্য কোনো দেশ জয় করার চেষ্টা করেননি। সমন্ত রাজার রাজজ্যোতিষী এই রহস্যটুকু ভালোভাবেই জানত। সেইজন্যেই সে সমন্ত দেশের রাজাকে ওই পরামর্শ দিয়েছিল।'

রাজার মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল।

১৬. সাধুর বর

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে, কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, কথায় বলে পাত্র বুঝে দান করতে হয়। কিন্তু অনেক সময় অনেক সত্যবাদীর ভাগ্যেও দান জোটে না। উদাহরণস্বরূপ মণিগুপ্তের কাহিনি বলব। শুনলে পথ চলার শ্রম লাঘব হবে।' বেতাল কাহিনি শুরু করল:

প্রাচীন কালে এক সিদ্ধসাধু তার শিষ্যদের নিয়ে একটি নগরে এসেছিল। সেই নগরে একজন ধনী ছিল। তার নাম মণিগুপ্ত। তাকে লোকে দাতা কর্ণ নামে অভিহিত করত। সাধু মণিগুপ্তের বাড়িতে গেল। তার আশা ছিল মণিগুপ্ত তাকে নিশ্চয়ই অতিথি হিসাবে গ্রহণ করবে।

সাধু দেখল মণিগুপ্তের বাড়ির সামনে হাজার হাজার গরিব মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তার লোকজন তাদের দানদক্ষিণা দিচ্ছে। একদিন থাকার পর সাধু ফেরার আগে মণিগুপ্তকে বলল, 'আমি তোমার অতিথিসেবায় মুগ্ধ হয়েছি। তুমি যেকোনো বর চাইতে পার। তবে নিজের স্বার্থের কথা না ভেবে পরার্থে যদি বর চাও তবেই আমার সেই বরে তোমার কাজ হবে।'

মণিগুপ্ত সবিনয়ে প্রণাম করে সাধুকে বলল, 'প্রভু, আপনি এমন বর দিন যাতে আমি সারাজীবন এভাবে দানধর্ম করে যেতে পারি।' সাধু মনে মনে হেসে মাথা নেড়ে বর দিয়ে শিষ্যসহ ফিরে গেল।

ফেরাপথে শিষ্য প্রশ্ন করল, 'গুরুদেব, আপনি যে বর মণিগুপ্তকে দিয়েছেন তা কি ফলবতী হবে?'

মাথা নেড়ে সাধু বললেন, 'না।'

এই ঘটনার কিছুকাল পরে দেখা গেল মণিগুপ্তের সেই দানধর্ম করার ক্ষমতা নেই। সে তখন কোনোরকমে কালযাপন করছে এতই খারাপ অবস্থা।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, ‘রাজা, সাধুর দেওয়া বর ফলল না কেন? সাধুর কি বর দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও না দিলে তোমার মাথা ফেটে যাবে।’

বেতালের প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, ‘মণিগুপ্ত যদি পরার্থে বর চাইত তাহলে সে কামনা করত দেশের সবাই যাতে সুখে থাকে। কিন্তু সে দাতা হিসেবে অমর হয়ে থাকার জন্য বর চাইল। নিজের স্বার্থে চাওয়ায় সাধুর বর ফলবতী হল না।’

রাজা এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে আবার ফিরে গেল সেই গাছে।

১৭. ভুলের কাছে ঋণী

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে নীরবে হাঁটতে লাগলেন। এমন সময় শবস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি স্বার্থের জন্য এত পরিশ্রম করছ, না বিনা স্বার্থে তোমার এই পরিশ্রম আমি তা জানি না। তবে আমি একজনের কথা জানি সে নিজের স্বার্থের কথা না ভেবে কঠোর পরিশ্রম করেছিল। তার নাম পর্বত। সে অচেনা অজানা লোককে এত সাহায্য করেছিল সে বলার নয়। তার কাহিনি শুনলে তোমার পথচলার পরিশ্রম কমে যাবে। শোনো বলছি।' এই বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল:

প্রাচীন কালে একটি গ্রামের শেষপ্রান্তে পর্বত নামে একটি গরিব লোক ছিল। তার বউ আর সে একটি কুঁড়ে ঘরে থাকত। তার কুঁড়ের পাশে ছিল আর একটি ঘর। একদিন ওই ঘরে ঢুকল এক বুড়ো। বুড়োর আত্মীয়স্বজন কেউ ছিল না। বুড়ো অসুস্থ ছিল। এসব লক্ষ করে তাকে সাহায্য করার ইচ্ছা জাগল পর্বতের মনে। কিন্তু ইচ্ছা জাগলেও পর্বতের ক্ষমতা ছিল না। সাহায্য করতে না পারায় পর্বত মনে মনে দুঃখ পেয়েছিল।

তার মনের অবস্থা বুঝে তার বউ বলল, 'এত মাথামুণ্ডু কী ভাবছ? বুড়োটার কপালে কষ্ট পাওয়া আছে তাই পাচ্ছে। কর্মফল বলে একটা জিনিস আছে। যে আজ বাদে কাল মরবে তাকে নিয়ে তোমায় এত ভাবতে হবে না।'

বউ যা বলল তার একটি কথাও মিথ্যা নয়। তবু বুড়োর কষ্ট দেখে পর্বতের বড়ো কষ্ট হয়। বুড়ো সারারাত কাশে। এক-এক দিন পর্বত ভাবে বুড়োটার গলা টিপে মেরে ফেললে কেমন হয়। এত কষ্ট পেয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো। ভাবে বটে, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। একদিন পর্বত ঘরের বাইরে একটি গাছের নীচে ঘুমিয়ে রাত কাটিয়ে দেবে

ঠিক করল। গাছের নীচে শুতে না শুতেই একটা বিরাট ছায়ামূর্তি দেখে ঘাবড়ে গিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি?'

'আমি ভূত।' বলল ওই মূর্তি।

শুনে পর্বতের গোটা শরীর ভয়ে কাঁপতে লাগল। সে অনেক কষ্টে বলল, 'কী চাও তুমি?'

'তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। এই পোঁটলাতে টাকা আছে। এই টাকা ওই বুড়োকে দিয়ে তাকে নগরে নিয়ে গিয়ে সারাতে হবে।' আমার কথা বুঝতে পেরেছ? ভূত বলল।

এমন পরোপকারী ভূতকে দেখে পর্বতের মন থেকে ভয় মুছে গেল। সে ভূতের সঙ্গে কথা বলল, 'এই বুড়োর উপর তোমার এত দয়া কেন?

কোনো জ্যান্ত লোক বুড়োকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসছে না আর তুমি কোন স্বার্থে তাকে টাকা দিচ্ছ?'

ভূত বলল, 'এই বুড়োটা যে কত বড়ো ধনী লোক তা তুমি জানো না। অবশ্য সে আজকের কথা নয়। অনেক দিন আগে এই বুড়োটা ধনী ছিল। দানধর্মও করত। আমি তখন এক লক্ষপতির বাড়িতে কাজ করতাম। আমার ওই বাড়ির মালিক আমাকে দশ হাজার টাকা দিয়ে নগর থেকে একটা জিনিস আনতে বলেছিল। আমি যাওয়ার সময় একটি ধর্মশালায় রাত কাটিয়েছিলাম। রাত্রে আমার সমস্ত টাকা চুরি হয়ে যাওয়ার কথা আমার মালিক বিশ্বাস করেনি। বিচার হল। বিচারক আমাকে চোর বলে ঘোষণা করল। আমার ভীষণ দুঃখ হল। আমি সোজা গিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে গেলাম। কিন্তু সে যাত্রা মরতে পারলাম না। চার জন ধরে আমাকে বাঁচাল। তারপর সবাই আমায় জিজ্ঞেস করতে লাগল আমার আত্মহত্যার কারণ। সবাই শুনত আমার দুঃখের কথা। কে কতটা বিশ্বাস করত কে জানে! তবে আমাকে কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। আমার থাকার জায়গা নেই, খাবার নেই। এই অবস্থায় একজন যুবক আমাকে ধরে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। আমাকে গোপনে দশ হাজার টাকা দিল। এত টাকা নিয়ে ধর্মশালায় উঠতে বারণ করল। এত টাকা পেয়ে আমার জীবনের মোড় ঘুরে গেল। তারপর অনেক বছর পরে আমি দশ হাজার টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য ওই যুবককে খুঁজেছিলাম, পাইনি। অনেক খোঁজ করে জানতে পেরেছি যে এই বুড়োই সেই যুবক। তুমি যদি এই টাকাটা বুড়োকে দিয়ে দাও তাহলে আমি মুক্তি পেতে পারি।' বলে টাকার থলি পর্বতের হাতে দিয়ে ভূত উধাও হয়ে গেল।

টাকাটা নিয়ে পর্বত ঘরে ঢুকল। মনে মনে বলল, 'যা করার কাল সকালে করব। এখন টাকাটা থাক।'

এমন সময় দরজায় কে যেন আঘাত করতে লাগল। দরজা খুলে দেখে ভূত।

'কী হল, আবার এলে কেন?' পর্বত ভূতকে জিজ্ঞেস করল।

'আবার এলাম মানে। আমি তো এই প্রথম আসছি। তোমার পাশের বাড়ির বুড়োর কাছে আমি ঋণী। এই নাও, ধর। এই টাকার থলিটা বুড়োকে দাও। এই টাকা দিয়ে তার চিকিৎসা করাও।' বলে নতুন ভূতটা টাকার থলি পর্বতের হাতে দিল।

পর্বতের মনে কৌতূহল জাগল। সে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বুড়োর কাছে কীভাবে ঋণী হলে?' তার প্রশ্নের জবাবে দ্বিতীয় ভূত বলল, 'একবার আমার

পাঁচ বছরের মেয়ের ভীষণ অসুখ করেছিল। স্থানীয় বৈদ্যরা দেখে তাকে নগরের চিকিৎসালয়ে নিয়ে যেতে বলল। আমি সপরিবারে নগরে গেলাম। চিকিৎসকদের মতে ছ-মাস ধরে তার চিকিৎসা চলবে। পাঁচ-ছ-হাজার টাকা খরচ হবে চিকিৎসার জন্য। এত টাকা পাব কোথায়? দুঃখে আমি বসে বসে কাঁদতে লাগলাম। এমন সময় একজন এসে "মেয়ের জীবন আগে বাঁচুক" বলে আমাকে দশ হাজার টাকা দিল। মেয়ে বাঁচল। কিন্তু আমি ওই লোকটার ঋণ শোধ করতে পারিনি। মরেও মুক্তি পাচ্ছি না। অনেক খোঁজ করে জানতে পেরেছি এই বুড়োই সেই লোক। তুমি দয়া করে এই টাকাটা বুড়োকে দিয়ে দাও। এই ঋণ শোধ করতে পারলেই আমি এই ভূতের জীবন থেকে মুক্তি পাব।' দ্বিতীয় ভূতও টাকার থলি পর্বতকে দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

পর্বত বউকে জাগিয়ে বলল, 'কি গো, এত টাকা জীবনে কখনো দেখেছ? দেখে নাও কত টাকা।'

বউ অত টাকা দেখে প্রথমে অবাক হয়ে গেল। তারপর স্বামীকে বলল, 'দেখ বুড়োর যা অবস্থা বেশ বুঝতে পারছি একে আর বাঁচানো যাবে না। তার চেয়ে এই টাকা নিয়ে আমরা আমাদের ছেলেদের মানুষ করতে পারব।'

'না তা হয় না, এ টাকা আমি ওই বুড়োকে দিয়ে দেব।' পর্বত বলল।

'দিতে চাও দাও। একটা থলির টাকা দাও। অন্য থলিটা রেখে দাও।' পর্বতের বউ বলল।

পর্বত প্রথমে ভাবল কথাটা মন্দ নয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তার মনে হল তা করা তার অন্যায় হবে। সে বউকে বলল, 'না, আমি দুটো থলিই বুড়োকে দিতে চাই।' বলে সে পরের দিন ওই দুটো থলি বুড়োকে দিয়ে দিল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, পর্বত এ-রকম করল কেন? সে যা করল তা কি বিনা স্বার্থে? নাকি ভূতদের টাকা হজম করতে তার ভয় করল? আমার এই প্রশ্নের জবাব যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'ব্যাপারটা অত জটিল নয়। পর পর দু-জন ঋণী থাকার ফলে যে ভূত হয়েছে তা জেনে পর্বতের ঋণী হয়ে ভূত হতে ইচ্ছা করল না। সেইজন্যেই ওই দু-জনের টাকা পর্বত নিজের কাজে খরচ করতে ভয় পেল।'

রাজা এই কথা বলার জন্য মুখ খুলতেই বেতাল শবসহ আবার ফিরে গেল সেই গাছে।

১৮. অর্থহীন পরীক্ষা

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবের ভেতর থেকে বেতাল বলল, 'রাজা, তোমাকে কেউ পরীক্ষা করে দেখছে কি না জানি না। তবে কেউ কেউ অর্থহীন পরীক্ষা করে নানা ধরনের কষ্ট দেয়। তাতে কোনো পক্ষেরই লাভ হয় না। কষ্ট দিয়েই যেন তারা আনন্দ পায়। আমার কথা যে যথার্থ তার উদাহরণস্বরূপ আমি কাঞ্চনবর্মার মেয়ে রত্নপ্রভার একটি কাহিনি শোনাব। এই কাহিনি শুনলে পথচলার পরিশ্রম লাঘব হবে।' এই বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল:

প্রাচীন কালে সিংহপুরীর রাজা ছিল কাঞ্চনবর্মা। রত্নপ্রভা নামে তার একটি মেয়ে ছিল। মেয়ের বিয়ের বয়স হওয়ার পর হঠাৎ কাঞ্চনবর্মার মৃত্যু হল। দেশ শাসন করার ক্ষমতা রত্নপ্রভা নিজের হাতে নিল। শাসন চালাতে সে যে ভালোভাবেই পারে তা কিছুদিনের মধ্যেই প্রমাণ করল। তার ধারণা ছিল, প্রজাদের অসুবিধা যত তাড়াতাড়ি দূর করা যায় ততই মঙ্গল।

বিজয়পুরের রাজা রবিবর্মা রত্নপ্রভাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠাল। রবিবর্মার ধারণা ছিল রত্নপ্রভাকে বিয়ে করলে সে সিংহপুরী এবং বিজয়পুরের রাজা হতে পারবে। আর তার চেয়ে বড়ো কথা রত্নপ্রভার মতো যোগ্য শাসক পাশে থাকলে দেশ শাসন করা অনেক সহজ হবে।

রবিবর্মা দূতের মাধ্যমে প্রস্তাব না পাঠিয়ে একদিন নিজেই ছদ্মবেশ ধারণ করে রত্নপ্রভার কাছে গিয়ে তার মনের কথা খুলে বলল।

তার কথা শুনে রত্নপ্রভা বলল, 'আপনি যে আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করেছেন এ তো আমার সৌভাগ্য। তবে আমাকে যিনি বিয়ে করবেন তাকে ছোটো একটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। আপনি কি তাতে রাজি আছেন?'

জবাবে রবিবর্মা বলল, 'রাজি না হওয়ার কোনো কারণ নেই। এখন

কী ধরনের পরীক্ষা দিতে হবে সে-কথা জানতে পারলে খুব সুবিধা হত।'

'পরীক্ষাটা তেমন একটা কিছু নয়। হিমালয়ে শঙ্খবৃক্ষ নামে একটি গাছ আছে। সেই গাছ থেকে ফুল পেড়ে এনে দিতে হবে।' বলল রত্নপ্রভা।

'ও, এই পরীক্ষা? ঠিক আছে।' এই বলে রবিবর্মা রওনা হয়ে গেল।

ঘোড়ায় চেপে হিমালয়ের কাছে পৌঁছাতে রবিবর্মার বেশি সময় লাগেনি। কিন্তু কয়েক-শো ক্রোশ খুঁজেও এমন একজনকে পেল না যে শঙ্খবৃক্ষ চেনে। এমনকী গাছটা যে হিমালয়ের কোনদিকে থাকতে পারে তারও সন্ধান কেউ দিতে পারল না। হিমালয়ের বিভিন্ন অংশে ঘুরে ঘুরে শঙ্খবৃক্ষের সন্ধান রবিবর্মা পেল না। ইতিমধ্যে অনেক মাস কেটে গেছে। শেষে বাধ্য হয়েই ফিরতে হল।

ফেরা পথেই রবিবর্মা জানতে পারল যে তার প্রতিবেশী রাজা তার দেশ আক্রমণ করে দখল করে নিয়েছে। রবিবর্মা বুঝল, দেশরক্ষার সুব্যবস্থা না করে হঠাৎ এভাবে হিমালয়ে চলে যাওয়া তার ঠিক হয়নি। বেগতিক দেখে সে আর নিজের দেশে না ফিরে সোজা রত্নপ্রভার কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা জানাল।

রত্নপ্রভা তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে বলল, 'আপনি দুঃখ করবেন না, আমি শুনেছিলাম যে আপনার প্রতিবেশী রাজা আপনার অনুপস্থিতির সময় আপনার দেশ আক্রমণ করে দখল করে নিয়েছে। তবে সেজন্য দুশ্চিন্তার কিছু নেই, আমার সেনাবাহিনী আপনার শত্রুকে হটিয়ে, আপনার দেশ উদ্ধার করে আপনার হাতে তুলে দেবে।'

রত্নপ্রভা যা বলল তাই করল। যুদ্ধ করে তার হাতে ওই দেশটাকে আবার তুলে দিয়ে রত্নপ্রভা বলল, 'এবার থেকে আপনি মন দিয়ে দেশ শাসন করুন।'

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, রত্নপ্রভা যেভাবে পরীক্ষা করল তার কি কোনো মানে হয়? সে যখন রবিবর্মার দেশটাকে উদ্ধার করে তার হাতে তুলে দিল তখন কি তার উচিত ছিল না তাকে বিয়ে করা? প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'রত্নপ্রভা রাজনীতি বুঝত। সে বুঝতে পেরেছিল রবিবর্মা কেন তাকে বিয়ে করতে চাইছে? এই বিয়ের উদ্দেশ্য যে ভালোবাসা নয়, একটি দেশ পাওয়ার লোভ তা সে ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল। রত্নপ্রভা তাকে বাজিয়ে দেখল তার মধ্যে দেশ শাসন করার ক্ষমতা কতখানি আছে। এই পরীক্ষা করার জন্যই সে এমন একটি গাছের নাম বলল যে নামে পৃথিবীতে কোনো গাছ নেই। তার যা জানার ছিল তা জানা হয়ে গেল। রবিবর্মা ফিরে আসার পর তার দেশ উদ্ধার করে তার হাতে তুলে দিল। এইভাবে পরীক্ষা করে সে বুঝল যে তার স্বামী হওয়ার যোগ্যতা রবিবর্মার নেই।'

এইভাবে রাজা বিক্রমাদিত্য মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে আবার ফিরে গেল সেই গাছে।

১৯. সুগন্ধি বৃক্ষ

নাছোড়বান্দা বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে গিয়ে, গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তোমার এই ধরনের কাজ দেখে, বিশেষ করে এই পরিশ্রম দেখে যেকোনো লোক তোমাকে বুদ্ধিহীন ভাবতে পারে; কিন্তু অনেক সময় বুদ্ধিহীন লোকও হঠাৎ বুদ্ধিমান হয়ে যায়। তার প্রমাণ স্বরূপ বিক্রমবর্মা নামে এক রাজার কাহিনি বলছি। এই কাহিনি শুনতে শুনতে হাঁটলে তোমার পথচলার পরিশ্রম লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল:

বিক্রমবর্মা মগধদেশের রাজা ছিল। তার মন্ত্রীর নাম বিশ্বকুম্ভ। রাজা যত ভালো ছিল মন্ত্রী ছিল তত খারাপ। সে রাজকাছারি, সৈন্যবাহিনী প্রভৃতি রাজার বিভিন্ন দপ্তরে নিজের আত্মীয়স্বজনদের চাকরি দিয়ে ঢুকিয়েছিল। রাজার অজান্তে সে বহু দুষ্কর্ম করত কিন্তু সেইসব কুকাজের খবর যাতে রাজার কাছে না পৌঁছায় সেদিকে তার তীক্ষ্ণ নজরও ছিল। বিশ্বকুম্ভ অতিশয় ধূর্ত হলেও ছিল প্রচণ্ড পরিশ্রমী। সে দিনরাত পরিশ্রম করত আর রাজাকে তার চোখে চোখে রাখত। কিছুতেই রাজকে তাঁর রাত্রিকালীন বিশ্রামের আগে চোখের আড়াল করত না।

রাজার ইচ্ছা ছিল মন্ত্রীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে তার ইচ্ছামতো, তার পরিকল্পনা মতো দেশ শাসনের কাজ চালিয়ে যাওয়া। কেননা রাজা বিক্রমবর্মা নামে বিক্রম হলেও কাজের বেলায় তাঁর তেমন বিক্রম ছিল না। বরঞ্চ রাজা হিসাবে তাঁর তেমন কোনো যোগ্যতা ছিলই না বলা চলে। তাই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আকারে-ইঙ্গিতে কোনো অনুযোগ এলেও রাজা তাতে কান দিত না। বহু অনুযোগ রাজার কাছে পাঠানো সত্ত্বেও যখন কোনো কাজ হল না তখন বিক্রমবর্মার শিক্ষাগুরু রাজশর্মা ভাবল, সরাসরি রাজার কাছে মন্ত্রীর কুকাজের খবর পাঠাতে হবে। এই কথা ভেবে রামশর্মা একদিন রাজার কাছে এল।

গুরুকে দেখে রাজা বিক্রমবর্মা খুব খুশি হয়ে শ্রদ্ধাভরে তাকে বসিয়ে আলাপ আলোচনা করল। তারপর কথায় কথায় গুরুর আসার উদ্দেশ্য রাজা গুরুর কাছ থেকে জানতে চাইল।

জবাবে রামশর্মা বলল, 'তেমন কোনো কাজ নেই, একটু জানতে এসেছি দেশের হালচাল কেমন চলছে?'

রাজা তৎক্ষণাৎ বলল, 'গুরুদেব, আমি কীভাবে দেশ শাসন করছি তা আমি কী করে বলব! আপনি কীরকম দেখছেন তাই বলুন।'

'প্রজারা তো ভালোই আছে। আমার তো মনে হয় প্রজারা তোমার সুগন্ধি বৃক্ষের ছায়ায় আছে। সুগন্ধও পাচ্ছে সবসময়। তোমার ভালোমানুষির সৌরভ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।' রামশর্মা বলল।

গুরু রামশর্মার কথা রাজার কাছে হেঁয়ালির মতো লাগল। রামশর্মার কথা সে পরিষ্কার অনুধাবন করতে পারল না। কিন্তু এই কথার মধ্যে যে কিছু একটা গূঢ়তত্ত্ব আছে সেটুকু বুঝল। রাজা একমুহূর্ত নীরব থেকে পরক্ষণেই বলল, 'গুরুদেব, আপনি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন।'

তারপর সেইদিনই রাজা গুপ্তচরের মাধ্যমে দেশের খবর জানার চেষ্টা করল। জানতে পারল মন্ত্রীই সবচেয়ে বড়ো অপরাধ করে বেড়াচ্ছে। পরের দিনই মন্ত্রীকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। মন্ত্রীকে সরানোর পর প্রজাদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বইল। এত ভালো প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে রাজা বুঝল যে সে যা করছে ঠিক করেছে।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, এই যে কাহিনি বললাম এর মধ্যে আমার কয়েকটা প্রশ্ন করার আছে। রামশর্মা এসেছিল রাজাকে সব কিছু জানিয়ে দিতে কিন্তু সে তা না জানিয়ে শুধু রাজার প্রশংসা করেই চলে গেল। যে গুরু মন্ত্রীর নিন্দা করতে এসেছিল সে রাজার প্রশংসা করে চলে গেল কেন? আর একটা প্রশ্ন, রাজাই বা রামশর্মা আসার আগে অনেকগুলো

অনুযোগ পেয়েও মন্ত্রীর কাজকর্মের ব্যাপারে কোনো খোঁজখবর করল না কেন? আমার এই দুটো প্রশ্নের সঠিক জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে একেবারে চৌচির হয়ে যাবে।'

প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'রামশর্মা যে কাজে এসেছিলেন তা সফল হয়েছে। কথা অনেকভাবেই বলা যায়। সরাসরি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে না বলে সূক্ষ্মভাবে রাজাকে বিদ্রূপ করে তিনি চলে গেলেন। এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ, রাজা রামশর্মার সঙ্গে গোপনে দেখা করেননি। অনেকের মধ্যে দেখা করা, কথা বলা রামশর্মার ভালো না লাগতে পারে। রামশর্মা যদি সেখানে বলতেন, "বিক্রমবর্মা তোমার সঙ্গে গোপনে কিছু কথা আছে।" তাহলে সঙ্গেসঙ্গে মন্ত্রী তার গুপ্তচর লাগিয়ে দিত। ফলে রাজা এবং রামশর্মার মধ্যে যে কথা হত সে কথা মন্ত্রী জানতে পারত। যে মন্ত্রী সারা দেশে কুকাজ করে বেড়াতে পারে সে যেকোনো মুহূর্তে রাজাকে মেরে ফেলতেও পারে। এই বিষয়টা বুঝতে পেরে রামশর্মা ঘুরিয়ে রাজার প্রশংসা করে চলে গেল। রামশর্মার ওই একটি কথাতেই কাজ হয়েছিল। এতদিন রাজাকে মনে করা হত তার বুদ্ধি নেই কিন্তু এখন বোঝা গেল রামশর্মার কথা বোঝার মতো ক্ষমতা রাজার আছে। সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছে শুনেই রাজা বুঝে নিয়েছিলেন যে রাজার কাজকর্মের ব্যাপারে দ্রুত প্রতিক্রিয়া হচ্ছে প্রজাদের মধ্যে। তাই তিনি কালমাত্র বিলম্ব না করে দেশের কাজের খোঁজ নিলেন। খোঁজ নিতে গিয়ে কানে টান পড়তেই মাথা এগিয়ে এল। মন্ত্রীর স্বরূপ ধরা পড়ল।'

রাজা বিক্রমাদিত্যের এই সদুত্তর শুনে বেতাল খুবই খুশি হল এবং রাজার এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে সেই শব নিয়ে আবার ফিরে চলে গেল সেই গাছে।

২০. পরামর্শ

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি তিনি শ্মশানের দিকে নীরবে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, আমার ধারণা মন্ত্রীদের পরামর্শ নিয়েই তুমি এই ধরনের পরিশ্রম করছ। তবে অনেক যোগ্য মন্ত্রীকেও অবাস্তব পরামর্শ দিতে দেখা গেছে। আমার কথার স্বপক্ষে উদাহরণস্বরূপ আমি রাজা মণিকেত-এর কাহিনি শোনাব। এই কাহিনি শুনতে শুনতে তোমার পথচলার পরিশ্রম লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল:

মণিপুরের রাজা ছিলেন মণিকেত। তাঁর কোনো ছেলে-মেয়ে ছিল না। অনেক বছর পরে তাঁর একটি মেয়ে হল। বাচ্চা বয়স থেকে মেয়েটিকে ওঁরা আদরযত্নে লালনপালন করল। মেয়েটি যা ইচ্ছা তাই করত, যা মুখে আসত তাই বলত। যখন-তখন সে রেগে যেত। রাগের মাথায় হাতের কাছে যা পেত তাই দিয়ে যাকে-তাকে মারত। তার এত রাগের কারণ যে কী তা মণিকেত রাজা অনেক চেষ্টা করেও আবিষ্কার করতে পারেননি। রাজার এই বদমেজাজি ও খেয়ালি মেয়েটির নাম মণিমঞ্জরী।

মণিমঞ্জরী বড়ো হল। তার বিয়ের বয়স হওয়ার পর মণিকেত রাজার দুশ্চিন্তা অনেকগুণ বেড়ে গেল। এত রাগী খেয়ালি মেয়েকে কে বিয়ে করবে? তা ছাড়া মেয়েটির বিয়ের আগে যদি মণিকেত রাজার মৃত্যু হয়, তাহলে মণিমঞ্জরীকেই দেশের শাসনভার কাঁধে নিতে হবে। আর যাই হোক, দেশের শাসন বদমেজাজি লোককে দিয়ে হয় না। এই অবস্থায় একটিমাত্র পথ খোলা ছিল। তা হল আগে থেকেই ঘোষণা করা যে মণিমঞ্জরীকে যে বিয়ে করবে তাকেই মণিপুরের সিংহাসনে বসানো হবে। ফলে যেসব রাজকুমার মণিমঞ্জরীকে তার মেজাজ এবং খেয়ালের জন্য ভয় পেয়ে বিয়ে করতে রাজি হয়নি রাজা হওয়ার আশায় তাদের কারো কারো মনে মণিমঞ্জরীকে বিয়ে করার ইচ্ছে

জাগতে পারে। আর যে রাজকুমার রাজা হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে তার মধ্যে মণিমঞ্জরীর মতো মেয়েকে পরিবর্তন করার ক্ষমতাও থাকতে পারে।

এই কথা ভেবে রাজা মণিকেত বিজয় ও জয় নামে দুই রাজকুমার সহ বিভিন্ন দেশের রাজকুমারদের ডেকে পাঠালেন। তারপর এক এক রাজাকুমারকে ডেকে রাজা গোপনে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন।

রাজা মণিকেত বিজয়কে নিজের মেয়ের সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে শেষে বললেন, 'আমার মেয়েকে যে বিয়ে করবে কার্যত সেই হবে আমার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী। তবে একটি কথা আবার আমি বলছি, আমার মেয়ে ভীষণ বদমেজাজি। বিনা কারণে সে যখন-তখন চটে যায়। রাগের মাথায় সে যে কী করবে তা কেউ বলতে পারে না। মানে, বলা চলে দুর্বাশার একটি নারীসংস্করণ। তাই তাকে বিয়ে করলে সম্পত্তি পাওয়ার আনন্দ যেমন হতে পারে, তেমনি এহেন রাগী মেয়েকে বিয়ে করার ফলে দুঃখ হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। এখন তোমাকে সব কথা জানিয়েছি। ভেবে-চিন্তে তোমার মতামত আমাকে জানাও।'

বিজয় বিরক্ত হয়ে বলল, 'ওসব আমি জানি। জেনেই এসেছি। এখন বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করুন।'

রাজা তাকে বিদায় দিয়ে জয়কে ডেকে সমস্ত কথা জানালেন।

ধৈর্যের সঙ্গে রাজার সমস্ত কথা শুনে জয় বলল, 'মহারাজ, যেকোনো লোকের রাগের মূল কারণ দুর্বলতা। কেন জানি না, রাগী লোককে দেখে

আমার মনে করুণা জাগে। যেকোনো লোক রেগে গেলে আমি রাগী লোকের ওপরে রাগ না করে রাগের কারণ আবিষ্কার করার চেষ্টা করি। আপনি যা বললেন তা শুনেই বলছি, মণিমঞ্জরীকে বিয়ে করায় আমার আপত্তি নেই।'

এই দু-জনের মধ্যে কার সঙ্গে মণিমঞ্জরীর বিয়ে দিলে যে ভালো হবে তা রাজা বুঝে উঠতে পারলেন না। দু-জনের মধ্যে কেউ কম নয়। এই অবস্থায় রাজা মণিকেত মন্ত্রীর পরামর্শ চাইলেন।

মন্ত্রী কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'মহারাজ, আপনার মেয়েকে আপনি সবচেয়ে বেশি স্নেহ করেন। এই দেশের সবচেয়ে বড়ো দেশপ্রেমিক আপনি। তাই মেয়েকে এবং আপনার প্রিয় দেশকে কার হাতে তুলে দেবেন তা আপনি ভালোভাবে যাচাই করতে পারেন। আমি আর কতটুকু বুঝি।'

রাজা বললেন, 'মন্ত্রী, পিতা এবং রাজা হলেই যে একজন সর্বজ্ঞ হবেন এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। সাধারণ নিয়ম অনুসারে কোনো বিষয়ে রাজা পরামর্শ চাইলে মন্ত্রীর কর্তব্য হল সেই বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া।'

মন্ত্রী আর এড়াতে না পেরে বলল, 'মহারাজ, বিজয় ভীষণ অধৈর্য এবং অবুঝ ছেলে। মণিমঞ্জরীর সঙ্গে তার খাপ খাবে না। জয়ের ধৈর্য আছে। তাই আমার ধারণা, জয়ের সঙ্গে মণিমঞ্জরীর বিয়ে হলে ভালো হবে।'

জয় এবং মণিমঞ্জরীর বিয়ে হল। বিয়ের পর থেকেই মণিমঞ্জরীর সঙ্গে জয়ের কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। প্রত্যেক দিন মণিমঞ্জরী জয়ের সঙ্গে ঝগড়া করত। জয় কিন্তু মণিমঞ্জরীকে তেমন কিছু বলত না। তার কথা ধৈর্য ধরে শুনত, শুনে চুপ করে থাকত।

এসব কিছু লক্ষ করে রাজা মন্ত্রীকে বললেন, 'আমার ধারণা, জয় মণিমঞ্জরীর স্বভাব বদলাতে পারবে। এই কাজে সফল হলেই জয়কে সিংহাসনে বসিয়ে

দেব। কারণ যে নিজের স্ত্রীকে ঠিক পথে আনতে পারবে না সে গোটা দেশের প্রজাদের সঠিকপথে চালিত করবে কী করে?'

মন্ত্রী কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'মহারাজ, আমি তো প্রথমেই আপনাকে বলেছি দেশের মঙ্গল কীভাবে হবে তা আপনি সবচেয়ে ভালো করে জানবেন, তা ছাড়া পরামর্শ চাইলেই তো হয় না, পরামর্শ অনুসারে কীভাবে কাজ করলে কাজটা সফল হয় সে প্রশ্নও থেকে যায়।'

মন্ত্রীর এই কথা শুনে রাজা বুঝলেন, তাঁর ভুল কোথায় হয়েছে।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে রাজা বিক্রমাদিত্যকে বলল, 'রাজা, মণিকেত মন্ত্রীর পরামর্শ চেয়ে কি ভুল করেছেন? মন্ত্রীই বা প্রথমে পরামর্শ দিতে চায়নি কেন? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

বেতালের প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'মণিকেত রাজার মতে মন্ত্রীর পরামর্শ দেওয়া উচিত। আসলে রাজা দুটো সমস্যার মধ্যে পড়েছিলেন। মণিমঞ্জরীকে কে বিয়ে করবে আর যোগ্যতার সঙ্গে দেশ শাসন কে করবে? আসলে একজন এই দুটোর উপযুক্ত নাও হাতে পারে। তাই রাজা মন্ত্রীকে যে প্রশ্ন করলেন সেই প্রশ্নের জবাবে যে পরামর্শ তিনি পেলেন সেই পরামর্শ তিনি অনুধাবন করতে পারেননি। রাজা মন্ত্রীর পরামর্শ অত্যন্ত যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করেছেন, ফলে জয় রাজা হওয়ার উপযুক্ত কি না সে প্রশ্ন রাজার মনে দীর্ঘকাল থেকে গেছে।'

রাজা বিক্রমাদিত্যের এই সঠিক পর্যালোচনা ও প্রশ্নের উপযুক্ত ও যথার্থ উত্তর শুনে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

২১. পাপীর অর্জিত পুণ্য

নাছোড়বান্দা বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি তিনি শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। এমন সময় শবস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি হয়তো কোনো পাপ করেছ। সেই পাপের ফল যাতে ভোগ করতে না হয় তারজন্যই তুমি হয়তো এত পরিশ্রম করছ। এই ধরনের একটি ঘটনা আমি জানি। শরভকুমারের কাহিনি বললে আমার বক্তব্য পরিষ্কার হবে এবং তোমার পথচলার পরিশ্রমও লাঘব হবে।' বেতাল কাহিনি শুরু করল:

শরভকুমার ছিল কোটিপতির ছেলে। বাপের মৃত্যুর পর দু-হাতে টাকা ছড়িয়ে সে নানা ধরনের সুখের আয়োজন করল। বেশি সুখ আনন্দ ভোগ করার জন্য সে কিছু কিছু পাপ কাজও করেছিল। এইভাবে কয়েক বছর একটার পর একটা পাপ কাজ করে কাটানোর পর, বয়স পড়ে যাওয়ার পর তার মনে অনুতাপ এল।

একদিন সে ঠিক করল, আর কোনো পাপ কাজ সে করবে না। বাকি জীবনটা সে দানধর্ম করে পুণ্য অর্জনের চেষ্টা করবে।

কিছুকাল দু-হাতে দান করার পর অনেকে তাকে দেবতা হিসাবে গণ্য করতে লাগল। ভিখিরিরা শরভকুমারের এই পরিবর্তিত আচরণ দেখে অবাক হয়ে যেত। শরভকুমারের ছেলেরা বাপকে এত অপচয় করতে বারণ করল। তার বউ ভাবল, স্বামী পাগল হয়ে গেছে। দিনরাত দান করতে দেখে শেষে ছেলেরা তাদের নিজেদের ভাগ চেয়ে বসল। শরভকুমারের স্ত্রীও ছেলেদের পক্ষ নিল। শেষে ভাগ করতে হল।

যে যাই বলুক শরভকুমার যথারীতি দান করে যেতে লাগল। এইভাবে বেশ কিছুকাল দান করার পর তার ভাগের সমস্ত সম্পত্তি শেষ করল। এমনকী সে নিজের থাকার ঘরটাও বিক্রি করে দান করল। তারপর সে

বেরিয়ে পড়ল তীর্থযাত্রায়। তীর্থযাত্রায় বেরোনোর পর একদিন এক গভীর বনে ব্রহ্মদৈত্য তার পথ আগলে বলল, 'আপনি দয়া করে আমার একটা উপকার করবেন?'

শরভকুমার ব্রহ্মদৈত্যের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলল, 'কীভাবে তোমার উপকার করতে হবে?'

'আমি অনেক পাপ করেছি। তারই ফলে এই ব্রহ্মদৈত্যের জীবনযাপন করছি। আপনি আপনার পুণ্য আমাকে দান করলেই আমার মুক্তি হবে।' ব্রহ্মদৈত্য বলল।

'নিশ্চয় দান করব।' বলে শরভকুমার নিজের অর্জিত পুণ্য অবলীলাক্রমে তাকে দান করল।

কিন্তু দেখা গেল ব্রহ্মদৈত্যের রূপ বদলায়নি। তখন ওই ব্রহ্মদৈত্য বলল, 'ওহে শরভকুমার, তোমার কোনো পুণ্য অর্জিত হলে তো তুমি আমাকে দান করবে। তোমার অর্জিত কোনো পুণ্য নেই।'

ঠিক সেইসময় আকাশপথে একটি বিমান ওদের সামনে নামল। ব্রহ্মদৈত্য পরমানন্দে ওই বিমানে উঠতে গেল। কিন্তু বিমান চালক ব্রহ্মদৈত্যকে ঠেলে ফেলে দিয়ে শরভকুমারকে বিমানে তক্ষুনি তুলে নিল। ব্রহ্মদৈত্যের চোখের সামনে বিমান আকাশপথে উড়তে লাগল।

এই কাহিনি বলে বেতাল বলল, 'রাজা, সব কিছু দান করার পরেও শরভকুমারের পুণ্য অর্জিত হল না কেন? নাকি সে যা পাপ করেছিল তার

সঙ্গে তার অর্জিত সুনামের সমান হয়ে গেল? পুণ্য দান হিসাবে পেয়েও ব্রহ্মদৈত্যের মুক্তিলাভ হয়নি। অথচ পরমুহূর্তেই শরভকুমারকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিমান এসে গেল। আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও না দিলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হবে।'

বেতালের প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'শরভকুমারের পুণ্য অর্জিত হয়নি এই ধারণা ভুল। যে মুহূর্ত থেকে শরভকুমার অতীত জীবন সম্পর্কে অনুতপ্ত হল সেই মুহূর্ত থেকেই তার পুণ্য অর্জন শুরু হল। শরভকুমারের তুলনায় ব্রহ্মদৈত্য অতি নীচ। তা না হলে সে অন্যের অর্জিত পুণ্য দিয়ে মুক্ত হতে চাইত কেন। তার এই স্বার্থবুদ্ধির জন্যই তাকে ব্রহ্মদৈত্য হিসাবেই থাকতে হল। তাই শরভকুমারকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিমান পাঠিয়ে দেবতারা সঠিক কাজই করেছেন।'

রাজার উত্তর শুনেই বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

২২. সাধনায় ভুল

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে গিয়ে গাছ থেকে শব নামিয়ে, কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, কীসের জন্য যে তুমি এই শবদেহ নিয়ে এত সাধ্যসাধনা করছ জানি না। তবে সাধনা করলেই যে সুফল হয় এমন ধারণা ঠিক নয়। সাধনায় ভুল থাকলে ফল পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ আমি ধর্মনাথের কাহিনি বলছি। শুনলে তোমার পথচলার পরিশ্রম কমবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল:

প্রাচীন কালে মহানগরে রসরাজ ও ধর্মনাথ নামে দু-জন চোর ছিল। ওরা দু-জনে মিলে বড়ো বড়ো চুরি-ডাকাতি করত। বনে-জঙ্গলে ছিনতাই করত। এইভাবে দু-জনে প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে গিয়েছিল। রসরাজ নিজের ভাগের টাকা নিয়ে বাড়িঘর করে সম্পত্তি বাড়াতে লাগল। কিন্তু ধর্মনাথ ওই টাকা জমিয়ে রাখত না। সে ধর্মশালা করেছিল। ওই ধর্মশালায় প্রতিদিন বহু গরিব মানুষ এসে পেটভরে খেয়ে যেত। ধর্মনাথ সাধুর বেশে দিনের বেলা ওই ধর্মশালায় থাকত, সেবার কাজ করত আর রাত্রে রসরাজের সঙ্গে চুরি করতে বেরত।

কিছুদিনের মধ্যেই ধর্মনাথের সুনাম সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ল। ধর্মনাথের কথা রাজার কানেও গেল। রাজা ধর্মনাথকে রাজসভায় আমন্ত্রণ জানিয়ে তাকে 'ধর্মদাতা' উপাধি দিল।

এই ধর্মদাতাই যে একজন চোর তা কেউ জানত না। এমনকী রসরাজও জানত না।

কয়েক মাসের মধ্যেই সারা দেশে চুরির উপদ্রব বেড়ে যাওয়ায় রাজা সমস্যায় পড়ল। শেষে রাজা ঘোষণা করল চোরকে যে ধরিয়ে দেবে তাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেওয়া হবে। ঘোষণা শুনেই রসরাজ ধর্মনাথই যে চোর তা রাজাকে জানিয়ে দিল।

রসরাজ ভেবেছিল ধর্মনাথকে ধরিয়ে দিলে শুধু যে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাবে তাই নয়, এরপর চুরির ভাগ দিতে হবে না।

রাজার লোক গিয়ে ধর্মনাথকে বন্দি করল। রাজার সামনে ধর্মনাথ চুরি-ডাকাতির কথা স্বীকার করে নিল।

ধর্মনাথের বন্দি হওয়ার পর দুটো ঘটনা লক্ষ করা গেল। চুরি হতে লাগল, ধর্মশালায় খাওয়ানো বন্ধ হয়ে গেল। যে সাধু খাওয়াত তার আর পাত্তা ছিল না। এই কথা জানার পর রাজা ওই ধর্মশালায় খাওয়ানোর ব্যবস্থা করল।

কিন্তু চুরি চলতে থাকায় রাজা রসরাজকে বন্দি করে আনার নির্দেশ দিল। রসরাজ অবাক হয়ে রাজার সামনে দাঁড়াতেই রাজা বলল, 'রসরাজ, দু-একদিনের মধ্যেই ধর্মনাথের বিচার হতে পারে। বিচারের সময় তোমাকে সাক্ষী দিতে হবে।'

রাজার এই কথার পর রসরাজকে থাকতে হল কারাগৃহে।

দিনের পর দিন গেল কিন্তু ধর্মনাথের বিচার হল না। ফলে রসরাজকে কারাগারে আটকে থাকতে হল। ধর্মনাথকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে হঠাৎ একদিন রাজা ধর্মনাথকে ধর্মশালার অধিকর্তার পদে নিয়োগ করল। রসরাজকে কারাগারে রাখার পর থেকে দেশে চুরি আর হল না।

রসরাজ কিন্তু মুক্তি পেল না।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, ওই রাজাটা কী ধরনের রাজা? ধর্মনাথ স্বীকার করেছিল যে সে চোর। তবু তাকে শাস্তি না দিয়ে

ধর্মশালার অধিকর্তার পদে নিয়োগ করল। আর ধর্মনাথকে যে ধরিয়ে দিল সেই রসরাজকে পুরস্কার না দিয়ে তাকে সারাজীবন কারাগারে বন্দি করে রেখে দিল। রাজার এই ধরনের আচরণের কারণ কী— তা জানা সত্ত্বেও যদি না জানাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে বিক্রমাদিত্য বললেন, 'ওই রাজা সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন রাজা ছিলেন। যে লোকটা দিনে সাধু সেজে ধর্মশালায় বসে থাকে সেই যে রাত্রে চুরি করে এটাও রাজা হয়তো জেনেছিলেন। তবু ধর্মনাথের মধ্যে দানধর্ম করার প্রবল ইচ্ছা যে ছিল সেটা রাজা লক্ষ করেছিলেন। ধর্মনাথকে বন্দি করার পর ধর্মশালায় কোনো সাধু এল না তখন রাজার কাছে সব কিছু নিশ্চয় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। অপরপক্ষে ধর্মনাথকে ধরিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজার চোখ ছিল রসরাজের উপর। রসরাজ চুরি করা টাকায় অগাধ বিষয়সম্পত্তি করেছিল। ধর্মনাথের বন্দি হওয়ার পরেও দেশে যখন চুরি হতে লাগল তখন রাজা রসরাজকে বন্দি করলেন। তাকে বন্দি করার পর আর চুরি হল না। এইসব ঘটনা বিচার করে রাজা ধর্মনাথকে ওই পদে বসালেন এবং রসরাজকে বন্দি করলেন।'

রাজা এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

২৩. অরণ্যকুমার

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য সেই গাছের কাছে ফিরে গিয়ে, গাছ থেকে শব নামিয়ে যথারীতি শ্মশানের দিকে নীরবে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, দেশ শাসনের কাজ ছেড়ে দিয়ে শিকারের কাজে নামলে অরণ্যকুমারের মতো তোমারও অভিজ্ঞতা হত। রাজা, সেই অরণ্যকুমারের কাহিনি বলছি। এই কাহিনি শুনলে তোমার পথচলার শ্রম লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল:

চন্দ্রগিরির রাজা অমরপালের সঙ্গে কোনো রাজাই যুদ্ধে কখনো এঁটে উঠতে পারত না। অমরপালের প্রত্যেকটি যুদ্ধে জয়ী হওয়ার মূল কারণ হল তার সেনাবাহিনীতে ছিল অসংখ্য শিকারি। ওই শিকারিদের একজন নেতা ছিল। চন্দ্রগিরির রাজা যা করতে বলত ওরা তাই করত।

এইভাবে বছরের পর বছর চলছিল। নেতার ছেলে, অরণ্যকুমার বড়ো হয়ে লক্ষ করল তাদের দলের লোকজনকে রাজা ইচ্ছামতো সেনাবাহিনীতে ঢুকিয়ে নিচ্ছে।

এই ধরনের প্রশ্ন মনে জাগার পর একদিন অরণ্যকুমার তার বাবাকে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা বাবা, আমরা রাজাকে কর দিই কেন? আমাদের সম্পদ রাজা নিয়ে যায়। আমাদের ছেলেদের রাজা নিজের সেনাবাহিনীতে ঢুকিয়ে নিচ্ছে। রাজাকে এসব করার অধিকার কে দিল?'

অরণ্যকুমারের বাবা হেসে বলল, 'রাজার সেনাবাহিনীতে আমাদের লোক আছে এ তো আমাদের গর্বের কথা। রাজার বলে আমরা বলীয়ান।'

'তুমি ভুল করছ বাবা। রাজার বলে আমরা বলীয়ান নই। বরং আমাদের বলেই রাজা বলীয়ান। আমাদের লোক না থাকলে রাজা এতগুলো যুদ্ধে জিততে পারত।'

তারপর অরণ্যকুমারের বাবা সবাইকে ডেকে ঘোষণা করল, 'এরপর থেকে তোমাদের নেতা হবে অরণ্যকুমার। তোমাদের কী মত?' সঙ্গেসঙ্গে সবাই নেতার কথা মেনে নিল।
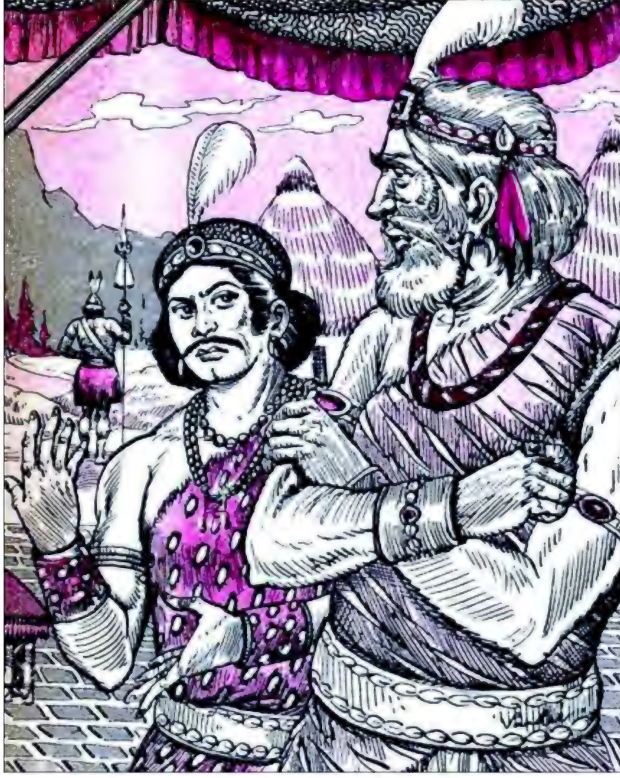
অরণ্যকুমারের নেতা হওয়ার পর রাজার লোক এসে চাল, চন্দনকাঠ, বাঘের চামড়া, কয়েকটি হাতি এবং পঁচিশ জন যুবককে নিয়ে যেতে চাইল।

অরণ্যকুমার রাজার লোককে পরিষ্কার বলে দিল, 'আমরা তোমাদের কোনো কর দেব না। আমরা কোনো রাজার অধীন নই। আমাদের এই অঞ্চলের উপর তোমাদের রাজার কোনো অধিকার নেই। আমরা কারও অধীন নই। আমরা এখন থেকে স্বাধীন। রাজা যদি তেমন খাদ্যের অভাবে পড়ে তাহলে আমরা তাকে সাহায্য করতে পারি। রাজার যদি কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা লোক দিতে পারি।'

অরণ্যকুমার যেন রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এর পেছনে একটা কারণ ছিল। অরণ্যকুমার ভেবেছিল, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যথারীতি তাদের স্বজাতির ব্যাধরাও আসবে। তখন কায়দা করে তাদের আটকে রাখা যাবে। কিন্তু কার্যত তা হল না। ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যারা এল তাদের মধ্যে একজনও ব্যাধ ছিল না। রাজার সেনাদের কৌশলে বন্দি করতে পারল অরণ্যকুমারের দল। বন্দিদের প্রশ্ন করায় ওরা বলল, 'আমাদের সেনাবাহিনীতে যত ব্যাধ ছিল প্রত্যেককে রাজা কারাগারে ফেলে রেখেছেন।'

এই অবস্থায় কী যে করা যায় তা ভাবতে লাগল অরণ্যকুমার। ঠিক সেইসময় এমন একটি ঘটনা ঘটল যা তার আগে কোনোদিন ঘটেনি।

একদল ডাকাত ওই পথে যাচ্ছিল। অরণ্যকুমারের লোক ওদের ঘিরে ফেলে ওদের বন্দি করল। ওরা একটি রাজকুমারীকে নিয়ে যাচ্ছিল। সত্য ঘটনা যে কী তা উদ্ঘাটন করার জন্য বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে জানতে পারল যে ওরা ডাকাত নয়। ওরাও রাজার লোক। তবে মন্ত্রীর নির্দেশে ওরা রাজার ওই একমাত্র সন্তান রাজকুমারীকে গভীর অরণ্যে এনেছে। উদ্দেশ্য তাকে বধ করা।

অরণ্যকুমারের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সে মন্ত্রীর পাঠানো লোকদের বলল, 'দেখ, তোমরা রাজকুমারীকে মেরে ফেলতে পারবে না। এখন থেকে তোমাদের রাজকুমারী আমাদের শিবিরের লোক। রাজকুমারীকে এনে তোমরা আমাদের উপকার করেছ। তাই তোমাদের ছেড়ে দিচ্ছি। মন্ত্রী যা হতে চান আমিও তাই চাই। তোমাদের মন্ত্রীকে সিংহাসনে বসানোর ব্যাপারে আমিও সাহায্য করতে পারি। তোমরা তোমাদের মন্ত্রীকে একবার আমাদের কাছে পাঠিয়ে দাও। আমাদের দু-জনের মধ্যে কথা হলে উভয়পক্ষেরই লাভ হবে।'

এই খবর পাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে মন্ত্রী গোপনে অরণ্যকুমারের সঙ্গে দেখা করতে এল। আসার সঙ্গেসঙ্গে অরণ্যকুমার মন্ত্রীকে মেরে ফেলল। রাজকুমারীকে সঙ্গে নিয়ে অরণ্যকুমার রাজার কাছে চলে গেল।

সমস্ত ঘটনা জেনে রাজা অরণ্যকুমারকে বলল, 'তোমার জাতের লোকজন আমার সেনাবাহিনীতে থাকার ফলে আমি অনেক যুদ্ধে জয়ী হতে পেরেছি। তবে এতদিন আমি তোমাদের কাছ থেকে যত উপকার পেয়েছি তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো উপকার করেছ তুমি। তুমি আমার একমাত্র মেয়েকে বাঁচিয়েছ, বিরাট চক্রান্ত থেকে আমাকে উদ্ধার করেছ। তুমি যে প্রশ্ন তুলেছ তোমার বাবা যতদিন নেতা ছিলেন ততদিন সেই প্রশ্ন ছিল না। আসলে তোমার বাবা আমাকে খুব ভালোবাসতেন। আমার যখন যা দরকার পড়ত আমি চেয়ে নিতাম। তবে তোমার আমলে যে প্রশ্ন তুলেছ সেটা আমি অমূলক মনে করি না। আর একটি কথা তোমার স্বজাতিদের কারাগারে নিক্ষেপ করার পেছনে মন্ত্রীরই হাত ছিল। মন্ত্রী ওদের বন্দি করার পর আমাকে জানিয়েছিল। এখন আমি চাই আমাদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকুক। তোমার লোকজন রাজধানীতে থাকতে যদি অনিচ্ছুক হয়, অরণ্যে থাকতে পারে। তুমি ইচ্ছে করলে আজকেই ওদের নিয়ে যেতে পার।'

'না মহারাজ, ওরা আপনার কাছেই থাকুক। আপনার কাছে থাকলে ওরা সুশিক্ষা পাবে।' বলে অরণ্যকুমার রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, অমরপাল যে দূত পাঠিয়েছিল সেই দূতের সঙ্গে অরণ্যকুমার ওই ধরনের ব্যবহার করল কেন? অত শক্তিশালী রাজার সেনাবাহিনী অরণ্যকুমারকে পরাজিত করতে পারল না কেন? রাজকুমারীকে অরণ্যকুমার উদ্ধার করল কেন? মন্ত্রী যে রাজার পতন চায়, রাজসিংহাসনে বসতে চায় এটা অরণ্যকুমার জানতে পারল কী করে? রাজার শত্রু অরণ্যকুমার মন্ত্রীকে মেরে ফেলল কেন? সবশেষে অরণ্যকুমার রাজার সঙ্গে মিটমাট করে ফেলল কেন? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা এক্ষুনি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'অরণ্যকুমারের বাবার সঙ্গে রাজার যে সুসম্পর্ক ছিল তার ভিত্তিতেই যে আদান-প্রদান ঘটত সেটা অরণ্যকুমারের জানা ছিল না। জানার সুযোগও অরণ্যকুমার পায়নি। কারণ প্রত্যেক বছর যা নিয়ে যেত তা রাজার লোক যথারীতি নিয়ে যেত এবং সেটা তারা কর আদায়ের মতোই নিয়ে যেত। ফলে অরণ্যকুমারের রাজার বিরুদ্ধ মনোভাব গড়ে উঠেছিল। তারপর রাজার লোক যখন জানাল যে কর না দিলে তাদের জাতের যেসব লোকজন সেনাবাহিনীতে আছে তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে, তখন অরণ্যকুমারের মনে রাজার বিরুদ্ধে ভীষণ রাগ জাগল। ডাকাত ধরার পর তার স্বজাতির লোককে রাজা যে বন্দি করেনি এ-রকম একটা সন্দেহ তার মনে জাগল। তার কাছ থেকে আহ্বান পেয়ে মন্ত্রী চলে আসার সঙ্গেসঙ্গে অরণ্যকুমার বুঝতে পারল মন্ত্রী কত বড়ো রাজদ্রোহী। তাই সে মন্ত্রীকে মেরে ফেলে রাজকুমারীকে রাজার কাছে ফেরত দিল। তাদের সঙ্গে রাজার সম্পর্ক যে কীসের ভিত্তিতে ছিল তা জানার পর অরণ্যকুমার নিজের জাতের লোককে ফিরিয়ে আনতে চাইল না।'

রাজা বিক্রমাদিত্য এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

২৪. গানের পরীক্ষা

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে গিয়ে, গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে নীরবে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, এই পৃথিবীতে কোনো কিছুর মূল্য নির্ধারণ অসম্ভব ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছে। এই যে এত পরিশ্রম করছ, হয়তো এসবের মূল্য নির্ধারণ হত কিন্তু শেষপর্যন্ত কোনো কিছুরই কোনো মূল্য থাকে না। আমার কথার অর্থ আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে সংগীতপ্রেমিক রাজা কান্তিবর্মার কাহিনি শুনলে। শুনতে শুনতে হাঁটলে পথচলার পরিশ্রমও লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল:

বসন্তদেশের রাজা কান্তিবর্মা অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সংগীতপ্রেমী হিসাবে বিখ্যাত ছিল। প্রত্যেক দিন গান শোনার অভ্যাস তার ছিল। তবে যার গান এক বার শুনত তার গান দ্বিতীয় বার শুনত না। কারণ প্রত্যেকেরই গানে কোনো-না-কোনো ত্রুটি তার কাছে ধরা পড়ত। শুধু যে গানের সুর ভালো হলেই চলে তা নয়, যে গাইবে তার চেহারাও ভালো হওয়া চাই। ফলে রাজার চোখে কোনো গাইয়ে নিখুঁত ছিল না।

অনেককাল পরে একদিন রাত্রে সরস্বতীদেবী কান্তিবর্মাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলল, 'দক্ষিণের অরণ্যে গেলে একটি বটগাছ পড়বে। ওই বটগাছের নীচে একটি বীণা পড়ে আছে। সেই বীণা নিয়ে এসে গাইয়ের সামনে রাখলে কার গান যে কেমন তা বীণাই বলে দেবে। ফলে শুধু যে তুমি গাইয়ের গুণাগুণ বুঝতে পারবে তাই নয়, গাইয়েও নিজের ত্রুটি ধরতে পারবে।' বলে সরস্বতীদেবী অদৃশ্য হল।

ওটা যে স্বপ্ন ছিল তা বুঝতে কান্তিবর্মার অনেকক্ষণ লেগেছিল। স্বপ্ন হলেও রাজা কান্তিবর্মার কাছে এত সত্যের মতো লাগল যে— রাজা দক্ষিণ দিকের অরণ্যে গিয়ে সোজা হাঁটতে হাঁটতে সেই বটগাছ খুঁজতে লাগল।

শেষে সত্যি সত্যি একটি বটগাছের সন্ধান পাওয়া গেল এবং তার নীচে একটি বীণাও পড়েছিল।

কান্তিবর্মা ওই বীণা নিয়ে এসে পুজো করে সংগীতসভার মাঝখানে সেটা রাখল। সেদিন থেকে যে গাইতে আসত তাকে বলে দেওয়া হত ওই বীণার বিষয়ে। গানের শেষে বীণাও গান কেমন হল তা জানিয়ে দিত। বীণার কাছে গানটাই ছিল মুখ্য। গাইয়ের রূপ বা তার গায়ের রং তার কাছে গুরুত্ব লাভ করেনি। তার চেয়ে মারাত্মক ঘটনা ঘটেছিল এই বীণা যার গান শুনে গর্দভ স্বর বলেছিল বীণা সেই গাইয়ের স্বরকে গর্দভ স্বর বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই গাইয়ে তৎক্ষণাৎ গর্দভ হয়ে ডাকতে ডাকতে সভা ছেড়ে পালিয়ে গেল।

এই ঘটনার পর আর কোনো গাইয়ে সাহস করে গাইতে রাজি হল না। তবে টানা চার দিন পর সংগীতকলাবিদ বিরুদাক্ষ এসে বীণার সামনে বসে গাইতে লাগল। গান শুনে বীণা বলে উঠল, 'ষাঁড়ের স্বর।' তৎক্ষণাৎ সংগীতজ্ঞ ষাঁড় হয়ে সংগীতসভা ছেড়ে পালিয়ে গেল।

পরের দিন আত্মবিশ্বাস নিয়ে একজন গাইয়ে সভায় গান গাইতে বসল। গান শুনে বীণা বলল, 'কুকুরের স্বর।' তৎক্ষণাৎ লোকটা কুকুর হয়ে সভা ছেড়ে পালিয়ে গেল। এসব দেখে রাজকুমারী কলকণ্ঠী নিজেই একদিন বীণার সামনে গাইতে বসল। রাজকুমারীর গান শেষ হতেই বীণা বলে উঠল কোকিলকণ্ঠী। তৎক্ষণাৎ রাজকুমারী কোকিলের রূপ ধরে কু-উ কু-উ ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল।

যেই রাজকুমারী কোকিল হয়ে উড়ে গেল অমনি সবাই ভীষণ রেগে গেল। সবাই বীণার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলল।
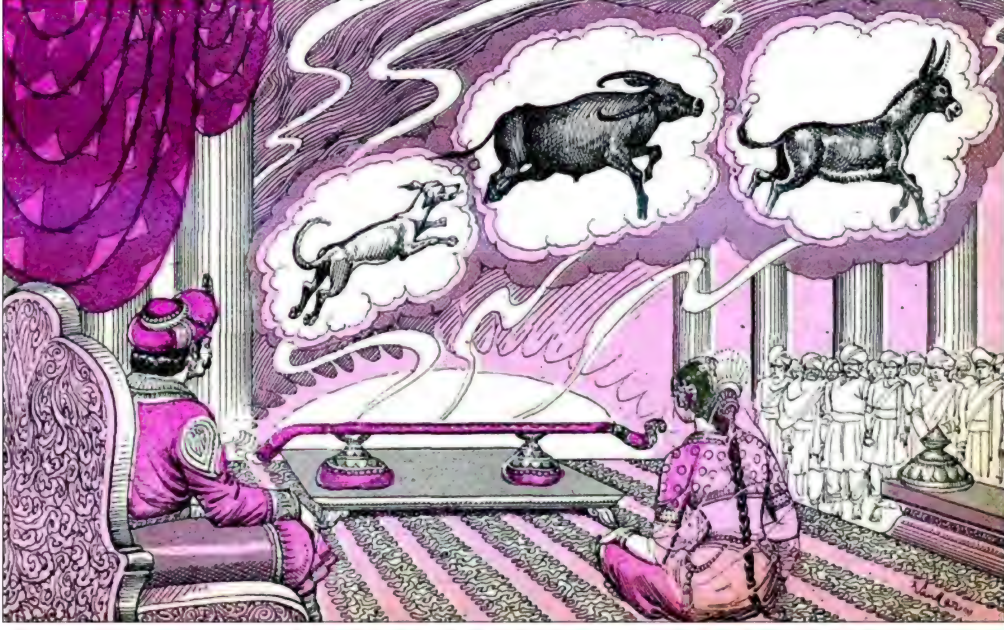
তাতেও রাজার রাগ কমল না। ওই টুকরোগুলো জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দিল। বীণা পুড়ে ছাই হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাধা, ষাঁড়, কুকুর, কোকিল প্রত্যেকে আগের রূপ পেল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, স্বয়ং সরস্বতী যে বীণার সন্ধান দিল সেই বীণার মাধ্যমে রাজার তো কোনো উপকার হলই না উপরন্তু ওই বীণার ফলে অনেকের অপকার হল। উপকার করার ইচ্ছাই যখন ছিল না তখন সরস্বতী স্বপ্নে এসে সেই বীণার সন্ধান কেন দিল? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'কান্তিবর্মাকে সংগীতপ্রেমী বলার মতো কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। নিত্যনতুন গাইয়েকে আনিয়ে সভায় গাওয়ানোর কোনো অর্থ ছিল না। বীণার প্রাপ্তির ফলে রসজ্ঞের কান যে গান শোনে এই বোধ রাজার হল। রাজার মধ্যে এই বোধ হওয়াতেই বীণার সার্থকতা।'

এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে আবার ফিরে গেল সেই গাছে।

২৫. অরণ্যবাসী

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ওই গাছের কাছে ফিরে গিয়ে, গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি যে কার উপকার করার জন্য এত পরিশ্রম করছ আমি তা জানি না। তবে এমন কিছু লোক আছে যারা উপকারীকে চিনতে পারে না। এমনকী উপকারীকে শত্রু হিসাবে সন্দেহ করে থাকে। আমার কথা যে সত্য তার প্রমাণ স্বরূপ আমি বামন নামক একধরনের শিকারিদের কাহিনি বলছি। কাহিনিটি শুনতে ভালো লাগবে এবং তোমার পথচলার পরিশ্রমও লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল:

হিমগিরির অরণ্যে বামন নামে একজাতের লোক বাস করত। ওরা পেট ভরানোর জন্য যা প্রয়োজন তা ওই অঞ্চলেই পেত। ফলে ওদের অরণ্যের বিশেষ গণ্ডির বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হত না। এইভাবে হাজার হাজার বছর ওই জাতির জীবন সেখানে কেটে যেতে লাগল। ফলে ওদের জীবনে কোনো পরিবর্তন আসেনি। নগর সভ্যতার কোনো স্বাদ তারা পায়নি।

তবে ওদের নেতা বাঘার ছেলে পাহাড়ি মাঝে মাঝে দূরের একটি নগর, বিজয়পুরে যেত। সেখানে নগর সভ্যতার নানা জিনিস দেখত। যেগুলো তার ভালো লাগত সেগুলো সে নিজেদের মধ্যে শুরু করতে চাইত। শুধু নিজে নয়, গোটা জাতিকে নগরসভ্যতার আলোকে আনার কথা ভেবে সে বিজয়পুরের রাজা চন্দ্রসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করল।

চন্দ্রসেন পাহাড়িকে সযত্নে রেখে তার প্রয়োজনীয় বস্তু জোগাতে লাগল এবং তার জাতিকে সভ্য করে তোলার ক্ষেত্রে যা করার দরকার হবে তা করতে রাজি হল।

কিছুদিন থাকার পর পাহাড়ির মনে হল বাবাকে একবার দেখে আসা

দরকার। এবারে অরণ্যে তার মন টিকছিল না। স্বজাতির চালচলন পরিবর্তনের জন্য কী কী করা যায় তা নিয়ে সে ভাবতে লাগল।

পাহাড়ি তার বাবাকে না জানিয়ে বিজয়পুরে চলে যাওয়ায় তার বাবা বাঘা মনে মনে খুব দুঃখ পেয়েছিল। ছেলের ওপরে তার অনাস্থার ভাব জাগল। ছেলে যে বাপ-ঠাকুরদার নাম রাখবে এই বিশ্বাস তার মন থেকে মুছে গেল। এই ধরনের কথা ভাবতে ভাবতে অনাগত দিনের আশঙ্কায় সে অসুখে পড়ে গেল। সেই যে পড়ল আর উঠল না। মৃত্যুর আগে বাঘা ছেলেকে বলে গেল, 'বাবা, বাপ-ঠাকুরদা যেভাবে এদের পরিচালনা করেছে ঠিক সেইভাবে আমার মারা যাওয়ার পর তুমি এদের পরিচালনা করবে।'

বামনরা বাঘার মৃত্যুর পর তার ছেলে পাহাড়িকেই নেতা করল।

নেতা হয়েই পাহাড়ি অরণ্যের গাছপালাগুলো একধার থেকে কাটার নির্দেশ দিল। পাহাড়ির মুখে এই ধরনের কথা শুনে বামনরা ভাবল, পাহাড়ি উন্মত্ত হয়ে অথবা পাগল হয়ে এই ধরনের কথা বলছে। ওরা নিজেদের কথাগুলো বলাবলি করলেও নেতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কেউ কোনো কথা বলতে পারেনি।

অরণ্য কাটিয়ে গাছ এবং অন্যান্য জিনিস বিজয়পুরে বিক্রি করিয়ে সেই টাকায় আধুনিক কায়দায় ওই অঞ্চলে বামনদের জন্য ঘরবাড়ি তৈরি করাল পাহাড়ি। শুধু যে সে বাড়ি করাল তাই নয়, শহর থেকে বহু জিনিস কিনে এনে বামনদের মধ্যে বণ্টন করে দিল। বাঘার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল

বামনদের সভ্য করে তোলা। এই সব কিছু করার ফলে হিমগিরি অরণ্যের চেহারা বদলে গিয়ে যেন হিমপুর নগর হয়ে গেল। এ ছাড়া পাহাড়ি নিজের জাতের লোককে বিজয়পুর নগরে গিয়ে খেটে টাকা রোজকার করতে বলল।

এত কিছু করার পরেও বামনরা কিন্তু মনে-প্রাণে এসব গ্রহণ করতে পারল না। তারা নগরের জিনিস ব্যবহার করতে অস্বস্তি বোধ করল। আবার নিজেদের অতীত কথা ভেবে দুঃখ পেতে লাগল। তাদের জীবন এমন হয়ে গেল যেন তারা না ঘরকা, না ঘাটকা। নগর সভ্যতা গ্রহণের ফলে তাদের প্রতিটি ব্যাপারে টাকার দরকার হতে লাগল। গাছপালা কেটে ফেলার ফলে আগের মতো মুক্ত জীবনও যাপন করতে পারল না। পোশাক থেকে শুরু করে সব কিছু দরকার পড়ে গেল। যত জিনিসের দরকার পড়ল তত টাকার অভাব দিনকে দিন তীব্র রূপ ধারণ করল।

এইভাবে কিছুকাল চলার পর বামনদের মধ্যে একজন যুবক মল্লনাথ এগিয়ে এসে নানা অভাব অভিযোগের কথা পাহাড়িকে বলল। দেখে-শুনে পাহাড়ি, অবস্থা সুবিধার নয় ভেবে বিজয়পুর থেকে বিভিন্ন জিনিস এনে বামনদের অভাব পূরণ করল। শুধু তাই নয়, বিজয়পুরের জিনিস হিমপুরে যাতে বিক্রি করা যায় তারজন্য কিছু দোকানও পাহাড়ি বসাল। এত করার পরেও বামনরা খুশি নয়। ওদের অভাব রয়ে গেল। অভাবের কথা মল্লনাথ পাহাড়িকে বলল।

শেষে সবাইকে যাতে সমানভাবে জিনিস বন্টন করা যায় তারও ব্যবস্থা

করল। তখন দেখা গেল প্রয়োজনের তুলনায় প্রত্যেকেই কম পাওয়ায় প্রত্যেকের মনে প্রচণ্ড ক্ষোভ থেকে গেল।

এসব লক্ষ করে মল্লনাথের মনে একটা প্রশ্ন জাগল, 'অরণ্যের সম্পদ গাছপালা ইত্যাদি অনেকদিন আগে বিক্রি হয়ে গেছে। আমাদের সম্পদ বলতে আর কিছুই রইল না। আমাদের নেতা পাহাড়ি কী করে নগর থেকে এতগুলো জিনিস আনতে পারছে।

বিজয়পুরের কাছেই ছিল মন্দগিরি নামে একটি অরণ্য। মল্লনাথের আহ্বানে বামনরা সেই অরণ্যের দিকে পা বাড়াল। নিজের অধীন থেকে এতগুলো বামনকে মল্লনাথের নেতৃত্বে চলে যেতে দেখে পাহাড়ি ওদের সকলের উদ্দেশ্যে বলল, 'একী আমাকে ফেলে চললে কোথায়? আমিও সঙ্গে যাব।'

তখন ওরা একবাক্যে চিৎকার করে পাহাড়িকে বলল, 'আমরা যাচ্ছি অরণ্যে। তুমি কোনোদিন অরণ্যে থাকতে পারবে না।' বলে ওরা মল্লনাথের নেতৃত্বে চলে গেল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, পাহাড়ি বামনদের অত অভাবে ফেলে দিল কেন? সে কি স্বজাতির জীবনধারা পছন্দ করত না? বামনরাই বা নগর সভ্যতাকে গ্রহণ করতে চাইল না কেন? যতই হোক নগর সভ্যতা তো তুলনামূলকভাবে ভালো। পাহাড়ির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার পরিবর্তে ওরা কেন চলে গেল মল্লনাথের অধীনে? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা স্বত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'পাহাড়ি লক্ষ করেছিল যে নগর সভ্যতা অনেক ভালো। ভালো জিনিস স্বজাতির মানুষের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা সে করেছিল। স্বজাতিকে সে গভীরভাবে ভালোবাসত বলেই তাদের উন্নত করার প্রয়াস পেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বজাতের লোক তাকে ত্যাগ করে চলে গেল। ওরা ভাবতে পারে যে ওরা পাহাড়িকে উচিত শিক্ষা দিল। ওরা তা ভাবতে পারে কিন্তু পাহাড়ি জলে পড়ে গেল না। সে প্রয়োজন হলে নগরে গিয়ে থাকতে পারে। পাহাড়ি যে ভুল করেনি তা নয়, একটি জাতিকে তার নিজস্ব সংস্কৃতিকে, বহু বছরের অভ্যাসগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যতই হোক মানুষ অভ্যাসের দাস। এই কথাটা বুঝতে না পেরে সবাইকে নগরের সভ্যতার দিকে ঠেলে দেওয়ায় পাহাড়ি যা করতে চাইল তা করতে পারল না।'

রাজার মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

২৬. সৈনিকের স্বার্থ

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি এইভাবে যে পরিশ্রম করছো, এই পরিশ্রম যদি তুমি তোমার বন্ধুর জন্যে করে থাক তাহলে আমি বলব সব বন্ধু যে তোমার শ্রমের মর্যাদা দেবে এমন নাও হতে পারে। আমার কথার উদাহরণস্বরূপ আমি তোমাকে কুমারবর্মার কাহিনি বলব। সেই কাহিনি শুনলে তোমার পথচলার পরিশ্রম লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল—

কৌশাম্বি নগরে কুমারবর্মা ছিল এক ক্ষত্রিয় যুবক। যোদ্ধা হিসেবে তার নাম ছিল। সে টাকার পরিবর্তে বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ করে অনেক টাকা করেছিল। অনেক দূর দূর দেশে সে চলে গিয়েছিল। টাকা হওয়ার পর হঠাৎ একদিন তার ইচ্ছা জাগল দেশে ফেরার। সে দেশে ফিরে মনের মতো মেয়ে দেখে বিয়ে করবে— এই ধরনের পরিকল্পনা করে বাড়িমুখো হল। পথে কুমারবর্মার সঙ্গে ধনগুপ্ত নামক এক ব্যবসায়ীর দেখা হল। তারও দেশ ছিল কৌশাম্বি। সে ছিল কোটিপতি। তার সঙ্গে ছিল ছেলে নন্দগুপ্ত। নন্দগুপ্ত সেই প্রথম বাপের সঙ্গে বেরিয়েছিল বিভিন্ন দেশের ব্যাবসা বুঝতে।

নন্দগুপ্ত এই প্রথম বেরিয়েছে, বেশি দেশ ঘুরলে তার শরীর খারাপ হতে পারে এই ভয়ে কয়েকটি দেশ ঘুরিয়ে ছেলেকে নিয়ে ফিরছিল ধনগুপ্ত।

কুমারবর্মাকে পেয়ে ধনগুপ্ত ভাবল, এর সঙ্গে ছেলেকে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়। কিছুক্ষণ ভেবে সে কুমারবর্মার উপর তার ছেলেকে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দিয়ে দিল। নন্দগুপ্তের হাতে কিছু টাকাও দিল ধনগুপ্ত। সে ব্যাবসা করতে অন্য দেশে চলে গেল।

কুমারবর্মা ও নন্দগুপ্ত কৌশাম্বির দিকে এগিয়ে চলেছে। পথে পড়ল একটি নগর। ওই নগরে মুক্তো ছিল খুব সস্তা। নন্দর মাথায় একটা বুদ্ধি জাগল, এখানে

মুক্তো কিনে কৌশাম্বিতে বিক্রি করলে ভালো পয়সা পাওয়া যাবে। কিছুক্ষণ পরে কুমারবর্মাকে নিয়ে নন্দ গেল মুক্তোর দোকানে। কাছে যে টাকাপয়সা ছিল তা দিয়ে নন্দ চারটে মুক্তো কিনল।

মাত্র চারটে কিনতে পারায় দুঃখ পেয়ে বলল, 'বাবার কাছে আরও টাকা নিলে ভালো হত। এখান থেকে যত বেশি মুক্তো নিয়ে যেতে পারতাম তত বেশি লাভ করতাম। কী যে ভুল করেছি!'

অনেকক্ষণ ধরে এই কথা বলাতে কুমারবর্মা নন্দকে বলল, 'তোমার যদি অত টাকার দরকার হয় আমার কাছ থেকে নিতে পারো। আর যাই হোক, পথে তো আমার এত টাকা লাগছে না। এখন নিয়ে, কৌশাম্বি গিয়ে মুক্তো বিক্রি করে, আমার টাকা আমাকে দিলেই হবে।'

কুমারবর্মার কাছে টাকাপয়সা নিয়ে নন্দগুপ্ত আরও চারটে মুক্তো কিনল। তারপর ওরা রওনা দিল।

আর মাত্র একদিন বাকি। আর একটি দিন হাঁটার পর ওরা পৌঁছে যাবে কৌশাম্বি। শুধু মাঝে একটি অরণ্য। যা ভেবেছিল তা হল না। ওই রাত ওদের অরণ্যে কাটাতে হল।

ওই অরণ্যে যে চোরডাকাত আছে তা নন্দগুপ্তের জানা ছিল। জানা থাকার ফলেই নন্দ রাত কাটানোর কথা ভাবতেই ভয়ে কেঁপে উঠল। সে ভাবল, 'যদি ডাকাত এসে তার মুক্তোগুলো কেড়ে নেয় তাহলে নিজের টাকা তো জলে যাবেই; উপরন্তু কুমারবর্মার কাছে ঋণী থাকতে হবে। একটা ভরসা অবশ্য আছে, কুমারবর্মার কাছে তরবারি আছে। কিন্তু যদি ডাকাত পড়ে তখন সে একা কী করতে পারে!

ওর টাকায় যে মুক্তোগুলো কিনেছি সেগুলো ওকে দিয়ে দিই। কৌশাম্বিতে এসে ও যদি লাভ করে করুক। এর ফলে আর যাই হোক দুটো উপকার হবে। আমি ওর কাছে ঋণী থাকব না আর ও ডাকাতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না-করে পারবে না।'

এইসব কথা ভেবে সে কুমারবর্মাকে বলল, 'বর্মা, তোমার টাকায় আমি লাভ করব এটা আমার ভালো লাগছে না। তাই বলছি, তোমার টাকায় যে মুক্তোগুলো কেনা হয়েছে সেই মুক্তোগুলো তুমি নিয়ে নাও। ওগুলো তুমি কৌশাম্বিতে বিক্রি করে অনেক টাকা লাভ করতে পারবে। সত্যি কথা বলতে কি ঝোঁকের মাথায় তখন টাকা নিয়েছি বটে কিন্তু মনে বড়ো অশান্তি হচ্ছে।' বলে ওই চারটে মুক্তো দিয়ে দিল।

কুমারবর্মা অনেক দেশ ঘুরে বহু লোককে দেখেছে। নন্দগুপ্ত কেন যে এই ধরনের কথা বলছে, উদ্দেশ্য যে কী তা বুঝতে তার একটুও সময় লাগেনি। সে সোজা নন্দকে বলল, 'দেখো নন্দ, এই মুক্তোগুলো আমার কাছে থাকায় আমার মনে ডাকাতদের ভয় ঢুকেছে। এখন থেকে তুমি নিজেকে বাঁচাও, আমি নিজেকে বাঁচাব। তোমাকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আর আমি নিতে পারছি না।' বলে সে ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে যেতে গেল।

নন্দগুপ্ত ভীষণ ভয় পেয়ে কাতরভাবে বলল, 'আমাকে ছেড়ে চলে যেও না।'

সঙ্গেসঙ্গে কুমারবর্মা বলল, 'একটা শর্তে আমি তোমাকে কৌশাম্বি নিয়ে যেতে পারি। শর্তটা হল তোমার কাছে এখন যে চারটে মুক্তো আছে তার থেকে দুটো দিতে হবে।'

নন্দ সঙ্গেসঙ্গে রাজি হয়ে গেল। সেই রাত্রে কোনো বিপদ ঘটেনি। পরদিন ভোরে রওনা দিয়ে দিনের শেষে, সন্ধের আগে ওরা কৌশাম্বি নগরে পৌঁছাল। নন্দ নিজের কথানুযায়ী তার কাছে যে চারটি মুক্তো ছিল তার থেকে দুটো কুমারবর্মাকে দিল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, কুমারবর্মার এই ধরনের আচরণ সমর্থন করা যায়? নন্দগুপ্ত যতই হোক ধনগুপ্তের ছেলে। তার মধ্যে লোভ প্রকটভাবে থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে উচিত হয়েছে এতটা স্বার্থপর হওয়া? নন্দ এমন কোনো অপরাধ করেনি, তার টাকায় যে মুক্তোগুলো কিনেছিল ডাকাতের ভয়ে সেগুলো তাকে ফেরত দিল। এই ঘটনায় কুমারবর্মা হঠাৎ ঘোড়ার পিঠে চেপে দ্রুত চলে যাওয়ার তাল করল কেন? আবার নন্দর চারটে মুক্তো থেকে দুটো নিলোই-বা কেন? এটা কি তার পক্ষে উচিত কাজ হয়েছে? তাহলে কি বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে কুমারবর্মা নন্দকে টাকা ধার দিয়েছিল? তার সেই উদারতার মর্যাদা সে কি, শেষপর্যন্ত, নিজেও দিতে পেরেছে? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না-দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'যা শুনলাম তাতে নন্দ বা কুমারবর্মা কাউকেই যেমন প্রশংসা করতে পারছি না, তেমনি নিন্দাও করতে পারছি না। যে যার চরিত্র অনুযায়ী কাজ করে গেছে। কুমারবর্মা ওই অবস্থায় ধার দেওয়াতে তাকে প্রশংসা করতে পারছি না, কারণ সে তো বলেই দিয়েছে যে পথে তার টাকা লাগছে না, ফিরে গিয়ে লাগছে। কুমারবর্মার মনে লাভ করার কোনো ইচ্ছাই ছিল না, তা যদি থাকত তাহলে সে নিজেই নন্দর দেখাদেখি কিছু মুক্তো কিনে ফেলত। আসলে ওই অরণ্যপথে নন্দ যেভাবে কপটতার আশ্রয় নিল তাতে কুমারবর্মার বিরক্তি জাগল। এই অবস্থায় একজন পেশাদার যোদ্ধা যা করতে পারে কুমারবর্মা তাই করল। নন্দর মনে যে সংশয় জেগেছিল, ডাকাত পড়লে কুমারবর্মা তাকে বাঁচাবে কিনা, এই সংশয় তার মনে বিরক্তি জাগাল। নন্দ যা ভেবেছে তা তার পক্ষে স্বাভাবিক। তার ধারণা ছিল ডাকাতরা আক্রমণ করলে কুমারবর্মা নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। ডাকাতরা তার কাছে টাকাপয়সা না-পেয়ে তাকে ধরেই ছেড়ে দেবে। তার কাছে যা ছিল সব তো ধার নেওয়া হয়ে গেছে। এই অবস্থায় কুমারবর্মা ডাকাতদের বিরুদ্ধে কিছুই করবে না। অগত্যা তাকেই মার খেতে হবে। সে ব্যাবসাদারের ছেলে, সে শিখেছে বিনা স্বার্থে কেউ কারও প্রাণ বাঁচাতে এগিয়ে আসে না। কুমারবর্মা বিভিন্ন দেশ ঘুরে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। তার বাস্তবজ্ঞান নন্দর তুলনায় অনেক বেশি। সে নন্দর মতো বেশি কথা বলে না। যা করার ভেবে নিয়ে করে ফেলে। অপরপক্ষে নন্দ যা বুঝেছে তাই করেছে।'

রাজা বিক্রমাদিত্য এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

২৭. মানবতা

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে হাঁটতে লাগলেন শ্মশানের দিকে। তখন শবে স্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, দোষ করলেই যে শাস্তি পেতে হয় এটা কিন্তু ভুল ধারণা। আমি এমন একজন অপরাধীর কাহিনি বলব, যে দিনেদুপুরে চুরি করেও শাস্তি পায়নি। আমার এ কাহিনি শুনলে পথ চলার পরিশ্রমও লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল—

কোনো এককালে গঙ্গাপ্রসাদ নামে এক ঠগ দিনেদুপুরে ঠকিয়ে চলে যেত। কেউ তাকে ধরতে পারত না। তার চেহারা এবং পোশাক দেখে কেউ বুঝতেই পারত না যে সে একজন ঠগ। ফলে কেউ তাকে চিনতেও পারেনি। এই অচেনা ঠগকে ধরার জন্য অনেক চেষ্টা করেও নগরপাল ব্যর্থ হল।

সোজা পথে ঠগ ধরার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে নগরপাল গুপ্তচরদের মাধ্যমে তাকে ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হল না। শেষে নগরপাল নিজে ছদ্মবেশে গঙ্গাপ্রসাদকে ধরার ফাঁদ পাতল।

একদিন গঙ্গাপ্রসাদ একজনের টাকার থলি কৌশলে চুরি করে নিল। পরে দেখা গেল ওই টাকার থলির ভেতর একটা চিঠি আছে। সেই চিঠি লিখেছিল এক মহিলা তার দাদাকে। চিঠির বয়ান: দাদা, আজ কয়েক মাস হল উনি মৃত্যুশয্যায়। টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছি না। পত্রপাঠ টাকা পাঠিয়ে আমার সিঁথির সিঁদুর যাতে থাকে তার চেষ্টা করো।

এই চিঠি পড়ে গঙ্গাপ্রসাদের মনে দয়া হল ওই মহিলার প্রতি। সে টাকার থলি নিয়ে ওই মহিলার বাড়িতে গেল। ওই বাড়িতে পা রাখার সঙ্গেসঙ্গে নগরপাল গঙ্গাপ্রসাদকে ধরে ফেলল। এইভাবে থলির মধ্যে চিঠি রেখে নগরপালের পক্ষে সম্ভব হল গঙ্গাপ্রসাদকে ধরা।

তারপর গঙ্গাপ্রসাদের বিচার হল। এই ভদ্ররূপী ঠগকে দেখার জন্য বিচারালয়ে

বহু লোকের ভিড় হয়েছিল। বিচারের শেষে নগরপাল কোনোরকম শাস্তি না-দিয়ে গঙ্গাপ্রসাদকে মুক্তি দিল। মুক্তির আগে শুধু তাকে দিয়ে নগরপাল শপথ করিয়ে নিল ভবিষ্যতে আর সে চুরি করবে না বা ঠকাবে না।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, যে নগরপাল গুপ্তচরের মাধ্যমে ধরার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে নিজেই ছদ্মবেশে গঙ্গাপ্রসাদকে ধরল সেই আবার কোনোরকম শাস্তি না-দিয়ে তাকে ছেড়ে দিল কেন? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না-দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'নগরপাল অনেক চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু তার তেমন কৃতিত্ব নেই। মানুষ জন্মগ্রহণ করার পর, বড়ো হতে হতে, জ্ঞান অর্জন করে। তার জ্ঞানের উৎস সে যে অঞ্চলে থাকে সেই অঞ্চলের প্রকৃতি এবং মানুষ। প্রকৃতি সুন্দর হলে, প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে দেখতে বড়ো হওয়ার ফলে মানুষের মনও সুন্দর হয়ে ওঠে। প্রকৃতি যদি রুক্ষ হয়, যদি মরুভূমিতে পূর্ণ হয় সেই অঞ্চল, তাহলে সেখানকার মানুষের মনও কিছুটা রুক্ষ না-হয়ে পারে না। অভাবের মধ্য দিয়ে যাকে বড়ো হতে হয় সে দেখে অভাবের নগ্ন রূপ। আর এই অভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য উপায় খোঁজে। এই ধরনের একটি উপায় গঙ্গাপ্রসাদ পেয়েছিল। সে লোক ঠকিয়ে রোজগার করে জীবনযাপন করছিল। মানুষের মনের গভীরের মণিকোঠায় থাকে মানবতা। এই মানবতা আছে বলেই মানুষ, মানুষ নামে পরিচিত। সঠিকভাবে যদি এই মানবতাকে জাগ্রত করা যায় তাহলে বহু সমস্যার সমাধান হয়।

আসলে গঙ্গাপ্রসাদের মধ্যে যে মানবতা ছিল সেই মানবতার জন্যই সে ধরা পড়েছিল। গঙ্গাপ্রসাদকে কেউ চিনত না। তাকে বিচারালয়ে সবাই
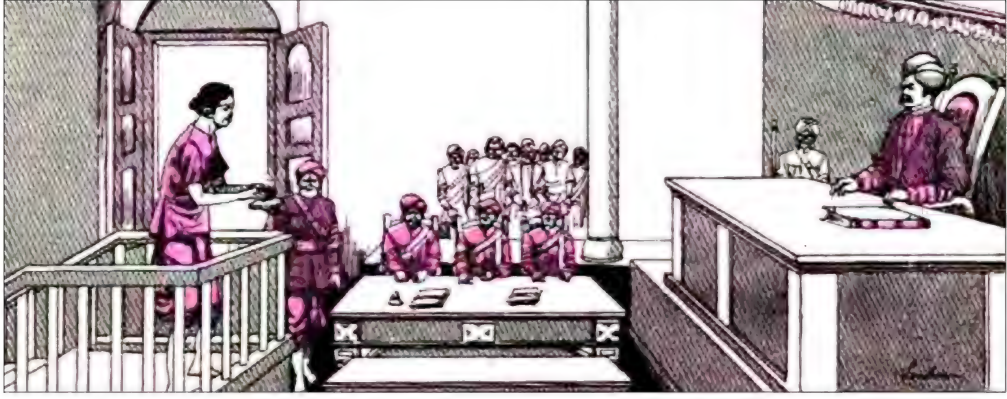
চিনে ফেলল। এরপর আর সে আগের মতো ঠকাতে পারবে না। গঙ্গাপ্রসাদ দিনেদুপুরে লোক ঠকিয়ে টাকা জোগাড় করত। বিভিন্ন গ্রামের বহুলোকের সামনে তাকে ঘোষণা করে হাজির করানোর ফলে সকলের কাছে সে পরিচিত হয়ে গেল। গঙ্গাপ্রসাদের মানবতার কথা ভেবে এবং তাকে চিহ্নিত করার কাজ হয়ে যাওয়ায় নগরপাল এই অবস্থায় তাকে আর শাস্তি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করল।'

রাজা বিক্রমাদিত্য এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গেসঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

২৮. শান্তির জন্য যুদ্ধ

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন আবার সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তোমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রূপ এবং কাজ নিজের চোখে দেখেও আমি ঠিক বুঝতে পারছি না এই প্রতিজ্ঞা তোমার অন্তরের কিনা? মানুষের স্বভাবই এমন যে, কোনো একটি প্রতিজ্ঞায় অটল থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার বক্তব্যের স্বপক্ষে আমি শ্রীকেতুর কাহিনি বলছি। আমার এই কাহিনি শুনলে পথ চলার পরিশ্রম কমে যাবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল—

শ্রীকেতু বিক্রমপুর নামে এক ছোট্ট দেশের রাজা ছিল। বিক্রমপুরের রাজা বহুপুরুষ ধরে বিদর্ভ দেশের সামন্ত হিসেবে ছিল। ওরা বিদর্ভ দেশের রাজার কাছে কর দিত। বহুপুরুষের পরে শ্রীকেতু রাজা হল। রাজা হয়েই নতুন করে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভাবতে লাগল। শ্রীকেতু পূর্বপুরুষদের চেয়ে বড়ো যোদ্ধা ছিল। তাকে বিদর্ভ দেশের রাজা কিছুতেই পদানত করতে পারছিল না। এদিকে শ্রীকেতুর উপদেষ্টা ও বন্ধুরা তাকে বিদর্ভ দেশ আক্রমণ করতে উপদেশ দিচ্ছিল। যোদ্ধা হিসেবে শ্রীকেতু পূর্বপুরুষদের চেয়ে যোগ্যতর হলেও সে ছিল মনেপ্রাণে শান্তিকামী। যুদ্ধের প্রতি তার ছিল ঘৃণা। সে তার উপদেষ্টাদের বুঝিয়ে বলল, 'এখন আমাদের দেশে কিছুরই অভাব নেই। আমরা হয়তো যুদ্ধ করে বিদর্ভের অধীনতা থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিতে পারি। কিন্তু তারপর? তারপর তো আমাদের শত্রু বেড়ে যাবে। শুধু যে বিদর্ভ দেশ আমাদের আক্রমণ করতে পারে তাই নয়, আশেপাশের যেকোনো দেশ আমাদের উপর আক্রমণ করতে পারে। আমাদের কোনোকিছুর অভাব নেই। আমাদের যা আছে তার থেকে কিছুটা বিদর্ভ দেশকে দেওয়ার ফলে আমাদের উপর কোনো শত্রু আক্রমণ করলেও তাকে প্রতিহত করার দায়িত্ব বিদর্ভ দেশের রাজার।'

তার কথার জবাবে উপদেষ্টা ও বন্ধুরা বলল, 'কিন্তু আমরা তো স্বাধীনতা পাব। স্বাধীনতার চেয়ে বড়ো জিনিস কী আছে!'

'বর্তমান অবস্থায় শুধু আমিই তো পরাধীন। আর তো কেউ পরাধীন নয়। আমার স্বাধীনতার জন্য বিরাট আকারে যুদ্ধ করতে হবে। সেই যুদ্ধের জন্য অফুরন্ত অর্থ খরচ করতে হবে এবং তার চেয়ে বড়ো কথা, যুদ্ধে অসংখ্য মানুষকে বলি হতে হবে। এসব আমি চাই না। আমাদের দেশ স্বাধীন হলে আমাদের প্রজারা যে আরও ভালো খেয়ে পরে থাকবে তার তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। অন্যদিকে প্রচুর অর্থ অপচয় যে হবে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আর যুদ্ধ একবার শুরু হলে সেটা যে কতদিনে শেষ হবে তাও কেউ বলতে পারে না। আমি সব সহ্য করতে পারি, কিন্তু যুদ্ধে মানুষের মৃত্যু আমার অসহ্য।' শ্রীকেতু বলল।

এই কথা শোনার পর সবাই বুঝল তাদের সামন্ত রাজা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় মানুষ। তার এই বক্তব্য শুনে অনেকেই তাকে প্রশংসা করল।

এরপর অনেকদিন হয়ে গেল। বিদর্ভ দেশে অভাব অনটন দেখা দিল। প্রজারা না-খেতে পেয়ে পথে-ঘাটে মরে যেতে লাগল। এইরকম এক অভাব অনটনের সময় শ্রীকেতুর কাছে খবর এল তার দেশ আক্রান্ত হতে পারে।

খবর পেয়েই শ্রীকেতু কালমাত্র বিলম্ব না-করে সেনাপতি, মন্ত্রী, উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা প্রমুখদের জরুরি সভায় ডেকে বলল, 'দু-দিনের মধ্যে সৈনিকদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। বিদর্ভ আক্রমণ করতে যাব।'

প্রথমে শ্রীকেতুর কথা কেউ বিশ্বাস করতে পারল না। অতবড়ো একজন শান্তিকামী হঠাৎ কেন যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় তা কেউ বুঝতে পারল না।

বিদর্ভ দেশের সেনাবাহিনী যুদ্ধের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। ফলে অত্যন্ত সহজেই শ্রীকেতুর জয় হল। বিদর্ভ দেশের রাজসিংহাসনে বসে শ্রীকেতু জানতে পারল, ক্ষেতের ধান যাতে ভালো হয়, ক্ষেতে যাতে জল ঠিকমতো যায় তারও কোনো ব্যবস্থা করেনি। শ্রীকেতু প্রথমেই এমন ব্যবস্থা করল যাতে প্রত্যেকটি ক্ষেতে জল যায়। ফলে কিছু কালের মধ্যেই শ্রীকেতু সুনাম অর্জন করল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, শ্রীকেতু নিজেকে শান্তিপ্রিয়, যুদ্ধবিরোধী বলে যে ঘোষণা করেছিল সেটা কি বিশ্বাস করা যায়? অতবড়ো বীর হয়ে বিদর্ভ দেশের পরিস্থিতি যখন খারাপ ছিল তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেল কেন? তাকে শান্তিকামী বলা হবে? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না-দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে বিক্রমাদিত্য বললেন, 'শ্রীকেতুকে শান্তিকামী এবং যুদ্ধবিরোধী বীর বলে বলতেই হবে। প্রজাদের যাতে মঙ্গল হয় তারজন্যই শ্রীকেতু নিজের স্বাধীনতা বিপন্ন করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে সবচেয়ে কম ক্ষয়ক্ষতি করে শ্রীকেতু বিদর্ভ দেশ জয় করে নিলেন। জয় করার কিছুদিনের মধ্যেই সেই দেশের কৃষিব্যবস্থা উন্নতি করার ফলে প্রজাদের মঙ্গল হল। এতেই প্রমাণ হয় শ্রীকেতু মনে মনে শুধু যে শান্তিকামী ছিলেন তাই নয়, শান্তির জন্য যুদ্ধ করেও তিনি প্রজাদের যাতে মঙ্গল হয় তাই করলেন।'

রাজা মুখ খোলার সঙ্গেসঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

২৯. ক্ষমা করা যায় না

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন আবার সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। সেইসময় শবেস্থিত বেতাল রাজা বিক্রমাদিত্যকে বলল, 'রাজা, এই দুনিয়ায় বিনয়ী এবং বিশ্বাসী মানুষের স্থান নেই। বিনয়ী এবং বিশ্বাসীরাও কীভাবে যে অবিশ্বাসী হয়ে ওঠে তার প্রমাণস্বরূপ একটি কাহিনি আপনার কাছে নিবেদন করছি। আমার কাহিনি রবীন্দ্রকে নিয়ে। কাহিনি শুনতে শুনতে পথ চললে হাঁটার পরিশ্রম কমে যাবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল—

কোনো এক গ্রামে পদ্মনাভ এবং বাসুদেব নামে দুই বন্ধু ছিল। তাদের বয়সও ছিল প্রায় সমান। দু-চারদিন আগে-পিছে ওরা বিয়ে করেছিল। ওদের মধ্যে বাসুদেবের ভাগ্যটা ছিল মন্দ। তাদের একটা ছেলে হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই মারা গেল বাসুদেবের বউ। ছেলের নাম রাখা হল রবীন্দ্র। ঋণে জর্জরিত অবস্থা হল বাসুদেবের। ধারদেনায় ডুবে, অসুখে পড়ে ধুঁকতে ধুঁকতে বাসুদেব মারা গেল। মারা যাওয়ার আগে সে রবীন্দ্রকে দেখাশোনার ভার দিয়ে গেল পদ্মনাভের হাতে।

পদ্মনাভের একটি ছেলে ছিল। নাম শেখর। পদ্মনাভ রবীন্দ্র এবং শেখরকে সমানভাবে দেখত। ওদের বিদ্যালয়ে পড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। রবীন্দ্র এবং শেখর একই মায়ের সন্তানের মতো বাড়তে লাগল। এভাবে ওরা গ্রামের লেখাপড়া শেষ করল।

পদ্মনাভ ওদের দুজনকেই উচ্চশিক্ষার জন্য রাজধানীতে পাঠিয়ে শেখরের নামে নিয়মিত টাকা পাঠাতে লাগল।

গ্রামের জীবন থেকে শহরে পা রেখে, শেখর শহরে নতুন স্বাদ পেয়ে পরিবর্তিত হল। লেখাপড়া থেকে ওর মন উঠে গেল। ঘোরাফেরা আনন্দ ফুর্তির দিকে ওর মন চলে গেল। এমনকী মদ্যপানও সে শুরু করে দিল।

বাপের কাছ থেকে যে টাকা আসত তা সে জুয়ো খেলে আনন্দ ফূর্তি করে উড়িয়ে দিত। অপরপক্ষে রবীন্দ্র পড়াশুনায় মন দিয়ে শেখরকে ঠিক পথে রাখার চেষ্টা করত, কিন্তু পারত না। একবার ভেবেছিল শেখরের সম্পর্কে পদ্মনাভকে সব কিছু জানাবে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল ওইভাবে জানালে শেখর এখনও যে দু-চার টাকা দেয় তাও দেবে না, ফলে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবে। শেখর ও রবীন্দ্র ঘুরে আসতে দেশে গেল। পদ্মনাভ ওদের লেখাপড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। সঙ্গেসঙ্গে শেখর জানিয়ে দিল লেখাপড়া তার ভালোই হচ্ছে। সেই সুযোগেও রবীন্দ্র শেখর সম্পর্কে কিছু জানাল না পদ্মনাভকে।

শেখর ও রবীন্দ্র আবার শহরে ফিরে যাওয়ার দু-দিন আগে হঠাৎ পদ্মনাভের কিছু টাকা খুঁজে পাওয়া গেল না। সে সবাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করল টাকার কথা। সেই সুযোগে শেখর বলল, 'টাকাগুলো রবীন্দ্র নেয়নি তো, ওকে জিজ্ঞেস করেছ?'

পদ্মনাভ রবীন্দ্রকে সন্দেহ করতে পারল না। তার স্বভাব চরিত্র নিজের ছেলের চেয়ে ভালো। তবু পদ্মনাভ রবীন্দ্রকে ডেকে একবার জিজ্ঞেস করল। এই ধরনের প্রশ্ন শুনে রবীন্দ্র হতবাক হয়ে গেল। তার কারণ সে ভালোভাবেই জানত যে টাকাটা শেখর নিয়েছে। তা সত্ত্বেও সে মুখ খুলে বলেনি। পদ্মনাভ যখন রবীন্দ্রকে জিজ্ঞেস করছিল ঠিক সেইসময় শেখর বলল, 'দেখো রবীন্দ্র, এটা আমি সমর্থন করতে পারলাম না। টাকাপয়সার দরকার থাকলে বাবার কাছে চাইলেই দিত। এভাবে চুরি করা তোমার মস্তবড়ো অপরাধ হয়েছে।'

রবীন্দ্র কিছুক্ষণ ভাবল, 'কী করি? যে চুরি করেছে সেই বড়ো গলা করে কথা বলছে। শেখরকে যদি তার বাবা সন্দেহ করে ফলে তাকে সারাজীবন ফলভোগ করতে হবে।' এই কথা ভেবে সে মাথা নীচু করে পদ্মনাভকে বলল, 'টাকাটা আমিই চুরি করেছি।'

শুনেই পদ্মনাভ অবাক হয়ে গেল। এই প্রথম রবীন্দ্রর উপর তার ঘৃণা জাগল। ভীষণ রেগে গিয়ে সে বলল, 'তোমাকে মানুষ করার জন্য আমি দিনের পর দিন এত ঢালছি, তোমার উন্নতির জন্য আমি এত টাকা খরচ করছি আর তুমি আমারই টাকা চুরি করেছ? এতদিনে আমার সব কিছু দেখছি, ফুটো পাত্রে ঢেলেছি।'

রবীন্দ্র মাথা নীচু করে সেখান থেকে নীরবে চলে গেল।

এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই শেখর শহরের একটি জুয়োখেলার ঘরে একজনের সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে মারল। মার খেয়ে লোকটা তৎক্ষণাৎ মারা গেল। শেখর ভয় পেয়ে পালাল। কিন্তু বেশিদূর পালানোর আগেই শেখর রাজার প্রহরীদের হাতে ধরা পড়ল। খবর পেয়ে পদ্মনাভ অবিলম্বে রাজধানীতে ছুটে এল।

শেখরের বিচার শুরু হল। শেখরকে বাঁচানোর জন্য রবীন্দ্র চেষ্টা করল। সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে সে জানাল যে, যে সময় ঘটনাটা ঘটেছিল সেই সময়ে শেখর রবীন্দ্রর ঘরে ছিল। রবীন্দ্র এই কথা বললেও যেহেতু জুয়োর ঘরে, ঘটনার সময়ে, অনেকে ছিল সেইহেতু অনেকের সাক্ষ্যপ্রমাণাদির ফলে শেখরের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল।

রাজধানীতে এসে পদ্মনাভ জানতে পারল যে শেখর অনেকদিন ধরে নানা কুকাজ করে বেড়াচ্ছে। লোকের মুখে ছেলের বিরুদ্ধে খারাপ কথা শুনে পদ্মনাভ রবীন্দ্রর উপরে ভীষণ রেগে গিয়ে বলল, 'তোমাকে আমি ছেলের মতো দেখতাম, কিন্তু আজ দেখছি তোমার মতো বিশ্বাসঘাতক আর কেউ নেই। আমি আর কোনোদিন তোমার মুখ দেখতে চাই না।' বলে পদ্মনাভ নিজের গ্রামে ফিরে গেল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, পদ্মনাভ নিজের ছেলের অপরাধের জন্য রবীন্দ্রর উপরে দোষ চাপাল কেন? ছেলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হওয়ার পর রবীন্দ্রকে আরও কাছে টেনে নিয়ে ছেলের অভাবের দুঃখ ভোলাই তো স্বাভাবিক ছিল। তা না-করে রবীন্দ্রকে মুখ দেখাতে বারণ করল কেন? তাহলে সে কি নিজের ছেলে ও রবীন্দ্রকে এক চোখে দেখেনি? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি তাড়াতাড়ি না-দাও তাহলে এক্ষুনি তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে বিক্রমাদিত্য বললেন, 'পদ্মনাভ রবীন্দ্র ও শেখরকে সমান চোখেই দেখতেন। রবীন্দ্র শেখরের অধঃপতন যখন লক্ষ করল তখন পদ্মনাভকে তা জানানো উচিত ছিল। শহরে যাওয়ার পর একমাত্র রবীন্দ্রই পারত শেখরকে ঠিক পথে রাখতে। কিন্তু পদ্মনাভকে জানালে পাছে টাকাপয়সা বন্ধ হয়ে যায়, লেখাপড়া সেখানেই থেমে যায়— এই ভয়ে রবীন্দ্র জানায়নি। এখানেই তার স্বার্থবুদ্ধি কাজ করেছে। এমনও হতে পারত রবীন্দ্রের কাছ থেকে জানতে পেরে শেখরের বাবা হয়তো শেখরকে গ্রামে ফিরিয়ে আনত আর রবীন্দ্রর লেখাপড়া চালিয়ে যেত। সঙ্গে থেকে শেখরকে সঠিক পথে চালিত করার চেষ্টা করে অধঃপতন লক্ষ করেও তাকে থামানোর চেষ্টা না-করে শেষমুহূর্তে শেখরকে বাঁচানোর জন্য সাক্ষী দিয়ে কোনো উপকার সে করল না।'

রাজা এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৩০. মর্যাদা

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। সেইসময় শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, মানুষ শুধু যে অনেক বিষয়ে অজ্ঞ তাই নয়, অনেক সময় জ্ঞানের মর্যাদাও দিতে জানে না। উদাহরণস্বরূপ একজন সত্যিকারের জ্ঞানী পুরুষের প্রতি কত বড়ো অন্যায় অবিচার যে হয়ে গেল সে সম্পর্কে আমি একটি কাহিনি বলব। আমার এই কাহিনি শুনতে শুনতে হাঁটলে হাঁটার পরিশ্রম লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল—

দিবাকর নামে এক রাজা কাঞ্চনপুর শাসন করতেন। কাঞ্চনপুরে এল এক সাধু। সাধু এসে নগরের শেষপ্রান্তে নির্জন অঞ্চলে একটি ঘর বানিয়ে নিল। সাধুর আসার খবর পেয়ে, নগরপাল সাধুর কাছে ছুটে গিয়ে তাকে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা বিস্তারিতভাবে বলল। তার কাছে কী করলে তার উন্নতি হবে এবং কী না করলে তার উন্নতির পথে বাধা আসবে না তা বিস্তারিতভাবে জানতে চাইল। নগরপালের পর একে একে অনেকেই ওই সাধুর কাছে গিয়ে নিজেদের সমস্যা বলে সমাধান জানতে চাইল। সাধু ওদের বিভিন্ন জনকে নিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে বসে কার ভাগ্যে কী আছে, কার কীভাবে চলা উচিত, কী করা উচিত তা বুঝিয়ে বলতে লাগল। প্রত্যেকে যে যার অতীতের কথা সাধুর মুখে শুনে অবাক হয়ে যেতে লাগল এবং সাধু যে প্রকৃত জ্ঞানী সেকথা প্রত্যেকে একবাক্যে স্বীকার করল। কেউ কেউ তাকে দিব্যজ্ঞানী বলল।

একজন দিব্যজ্ঞানী নগরে একপ্রান্তে আছে— এই কথা মুখে মুখে ছড়াতে ছড়াতে অবশেষে রাজার কানেও গেল। রাজা দিবাকর ভেবে পেল না ওই দিব্যজ্ঞানীকে দিয়ে কোন প্রয়োজনীয় কাজ করানো যায়। রাজার কানে আরও অনেক খবর গেল। যেমন সাধু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যাকে যা লিখে দিয়েছে

তার জীবনে তাই ঘটছে। কেউ তার বাইরে কিছু ঘটাতে পারছে না। সাধু যেন নিজের হাতে প্রত্যেকের ভবিষ্যৎ জীবন ছকে দিয়েছে। দিবাকর ভাবল, সাধু একবার যা লিখে দিচ্ছে তা যখন ফলে যাচ্ছে তখন সেটা পরিবর্তন করা বা নিজের ভাগ্যকে বদলাবার চেষ্টা করেও তো কোনো কাজ হবে না।

রাজা দিবাকরের মন্ত্রীর নাম ছিল সুদর্শন। সুদর্শনের ইচ্ছা ছিল রাজার এবং দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানার। এ ছাড়া সুদর্শনের ছেলে জন্মাবার পরই নানা ধরনের অসুখে ভুগছে। এই ছেলেটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সাধুর কাছে জেনে নেওয়ার ইচ্ছা মন্ত্রীর মনে মনে ছিল। বিশেষ করে বৈদ্যেরা ওই ছেলেটির রোগ আর সারাতে পারছিল না। কিন্তু ইচ্ছা করলেই মন্ত্রী তো আর সাধুর কাছে যেতে পারে না। রাজা যেমন সবসময় নিজের ইচ্ছামতো কাজ করে না, ঠিক তেমনি মন্ত্রীও রাজার সঙ্গে পরামর্শ না-করে কোনো কাজে হাত দেয় না। আলাপ আলোচনার পরে মন্ত্রী দিব্যজ্ঞানীর কাছে গেল। দিব্যজ্ঞানী সাধু বলল, 'তোমার ছেলে গ্রহের দোষ পেয়েছে। আমি যেভাবে যা করতে বলব তা করলে ছেলের গ্রহদোষ কেটে যাবে এবং তার অসুখবিসুখ হবে না।'

সাধু যা বলেছিল সুদর্শন তাই করল। একমাসের মধ্যেই সুদর্শনের ছেলে সম্পূর্ণ সেরে উঠল। এই ঘটনায় মন্ত্রী সুদর্শন খুব খুশি হয়ে সাধুকে দু-হাতে উপহার দিতে গেল।

বিভিন্ন উপহার মন্ত্রীর হাতে দেখে সাধু মুখ টিপে হেসে বলল, 'আমি সাধু। আমার এসব জিনিসে কী হবে? আমি এসব কিছু চাই না।' বলে সাধু মন্ত্রীকে একটি ওষুধ দিয়ে বলল, 'কোনো জাত সাপ যদি কাউকে ছোবল মারে এই ওষুধে সেরে যাবে। একটুও বিষ থাকবে না। বিষ তার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। মানুষ প্রাণে বাঁচবে।'

মন্ত্রীর ক্ষেত্রে যা ঘটল সমস্ত বিষয় জেনে সাধুর প্রতি রাজা দিবাকরের কৌতূহল বাড়ল। ইচ্ছা জাগল নিজের ভবিষ্যৎ জানার। মন্ত্রীর ছেলে যখন সেরে উঠেছে তখন ওই সাধু নিশ্চয় অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারে। এই কথা ভেবে দিবাকর একদিন শিকারে যাওয়ার সময় পথে ওই দিব্যজ্ঞানী সাধুর আস্তানা পড়ায় সেখানে থেকে সাধুর কাছে গিয়ে বলল, 'সাধুজি, আমি শিকারে যাচ্ছি। ভালো শিকার পাব?'

সাধু বলল, 'আজ তুমি একটি জন্তুও মারতে পারবে না।'

রাজার মনে সাধুর কথা শুনে শিকারে যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। রাজা তার আগে শিকার করতে গিয়ে কোনোদিন খালি হাতে ফেরেনি। রাজা

মনে মনে ভাবল লোকে এই সাধুকে যতই দিব্যজ্ঞানী ভাবুক না কেন আসলে এর কথা যে ফলে যায় তা নাও হতে পারে। এই কথা ভেবে রাজা অরণ্যের গভীরে ঢুকল। অন্য দিনের মতো সেদিনও রাজা শিকারের সমস্ত রকম কৌশল অবলম্বন করেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত সাধুর কথাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য হল। সেদিন রাজা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জন্তুও শিকার করতে পারেনি।

এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই পাশের দেশের রাজার সঙ্গে দিবাকরকে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হল। পাশের দেশের রাজা ছিল অত্যন্ত ক্ষমতাবান এবং তার সৈন্যসংখ্যাও ছিল অনেক বেশি। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পরাজয় যে বরণ করতেই হবে এ ব্যাপারে দিবাকরের কোনো সন্দেহই ছিল না। তবু কৌতূহলবশত রাজা দিবাকর সাধুর কাছে গিয়ে যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। সাধু বলল, 'শোনো বাবা, পাশের দেশের রাজা যতই বড়ো হোক তোমার জয় নিশ্চিত। তুমি এগিয়ে যাও।'

এবারেও দিব্যজ্ঞানী সাধুর কথা বর্ণে বর্ণে সত্য হল। অত যে বলশালী, অহংকারী, ক্ষমতাবান রাজা, সেও তার ওই অহংকারের জন্যই পরাজিত হল। সে যেভাবে ব্যূহ রচনা করেছিল, যেভাবে সৈন্য সাজিয়েছিল, দিবাকর অত্যন্ত অল্প পরিশ্রমে শত্রুসৈন্যকে তছনছ করে দিতে পারল। পাশের দেশের রাজা অগত্যা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেল।

এ সমস্ত ঘটনার পর রাজা একদিন মন্ত্রী সুদর্শনকে বলল, 'মহামন্ত্রী, আমি পরীক্ষা করে দেখেছি সাধু শুধু ভবিষ্যৎ বলতে পারে। ভবিষ্যতকে বদলাবার ক্ষমতা এই সাধুর নেই। আপনার ছেলে যে সেরে উঠেছে তার পেছনে অন্য কোনো কারণ নেই। একটিমাত্র কারণ ছিল, সেটা হচ্ছে সাধু ভালোভাবেই জানত যে ছেলে সেরে যাবে। আপনার সাপের ছোবল খেয়ে মৃত্যুর ফাঁড়া

আছে সেটা জেনে সাধু আপনাকে ওষুধ দিল। কিন্তু আমার ধারণা ছোবলে মৃত্যু আপনার কপালে নেই। বহু রোগীকে সাধু সারাতে পারেনি।'

মন্ত্রী রাজার কথা শুনে প্রজাদের প্রশ্ন করে যা বুঝল তাতে রাজার কথাই সত্য মনে হল।

এর কিছুদিন পরে একদিন গভীর রাত্রে মন্ত্রী দু-জন দেহরক্ষীকে নিয়ে গোপনে ওই সাধুর কাছে গেল। সাধুকে একটি রথে বসিয়ে অনেকদূরে পাঠিয়ে দিল। সাধুর সঙ্গে ওই দু-জনের মধ্যে একজন দেহরক্ষী গেল। অন্য দেহরক্ষীকে জটা ইত্যাদি পরিয়ে দিয়ে সাধু যে আসনে বসত সেই আসনে বসিয়ে দিল। তার পরের দিন সকাল থেকে সাধুর পোশাকধারী দেহরক্ষীর কাছে প্রজারা যথারীতি আসতে লাগল। সাধুর কথামতো কিছুই হত না। ফলে লোকের আসা বন্ধ হয়ে গেল। দেহরক্ষী ফিরে গেল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, যে সাধু মন্ত্রীর ছেলেকে সারিয়ে তুলল, যে সাধু বহু প্রজার উপকার করল সেই সাধুর প্রতি মন্ত্রীর ব্যবহার এ-রকম হল কেন? উপকৃত হয়েও মন্ত্রী তাকে সরিয়ে দিল কেন? এই প্রশ্নের জবাব জেনেও যদি না-দাও, তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'দিব্যজ্ঞানী সাধুর কারও ভবিষ্যৎ বদলাবার ক্ষমতা ছিল না। রাজা দিবাকর ভেবেছিলেন সারা দেশের লোক যদি সাধুর কথার উপর নির্ভর করে চলতে থাকে তাহলে প্রজাদের কর্মক্ষমতা কমে যাবে। সারা দেশের প্রজারা যদি বুঝতে পারে, এবছর ফসল ভালো হবে না, তখন তারা ফসল ভালো করার চেষ্টাও করবে না। রাজার এই ধরনের কথা ভেবেই মন্ত্রী দিব্যজ্ঞানী সাধুকে সরিয়ে দিয়েছিল।'

রাজার মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৩১. মিথ্যার আশ্রয়

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে গিয়ে, গাছ থেকে শব নামিয়ে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে এগোতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, কীসের জন্য যে তুমি এই কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছ, জানি না। অনেক সময় অনেকে সহজভাবে প্রাপ্য বস্তুকে অবহেলা করে অথবা বুঝতে না-পেরে সেই বস্তুটি পেয়েও পায় না। উদাহরণস্বরূপ, আমি বীরবর্মার কাহিনি বলছি। এই কাহিনি শুনতে শুনতে হাঁটলে তোমার পথচলার পরিশ্রমও লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল—

মালবদেশের যুবরাজ কল্যাণবর্মার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল বীরবর্মা। বীরবর্মা ছিল মালবদেশের এক রাজকর্মচারীর ছেলে। তা সত্ত্বেও কল্যাণবর্মা বীরবর্মাকে যথেষ্ট গভীরভাবেই ভালোবাসত এবং বীরবর্মা যে একজন সাধারণ রাজকর্মচারীর ছেলে তা সে কখনোই ভাবত না। ওই দু-জনের বন্ধুত্ব দেখে সবাই ভাবত, ওরা পূর্বজন্মে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিল।

একবার বীরবর্মা শিকার করতে যাবে ঠিক করল। শিকারের সব ব্যবস্থা করে সে শিকার করতে গেল। অরণ্যে সে এক নারীর আর্তনাদ শুনতে পেল। যেদিক থেকে আর্তনাদ ভেসে আসছিল ঘোড়াটাকে সেদিকে চালিত করে লক্ষ করল, অসহায় অবস্থায় এক মহিলা সেখানে একটি ঘোড়ার ওপরে বসে ছিল। ঘোড়াটা পেছনের দুটো পায়ের ওপরে দাঁড়িয়ে মহিলাটিকে আছাড় মেরে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে। ঘোড়ার চোখ দেখে মনে হল, বিশেষ কোনো ভয়ংকর জিনিস দেখে সে ভীষণ ঘাবড়ে গেছে।

বীরবর্মা তৎক্ষণাৎ নিজের ঘোড়াটাকে ওই ঘোড়ার কাছে নিয়ে গিয়ে, তার লাগাম ধরে, তার সামনের পা দুটো আস্তে আস্তে নামিয়ে, তার পিঠ চাপড়ে তাকে ঠান্ডা করল। ঘোড়ার ওপরের মহিলাটিকে দেখে মনে হল সে ঘোড়ার চেয়ে বেশি ঘাবড়ে গেছে। মহিলার কাছে জানা গেল যে

সে অরণ্যের ওপারের উদয়গিরির রাজকুমারী। তার নাম স্বর্ণকেশী। ওরা সবাই মিলে অরণ্যে শিকার করতে এসেছিল। কিন্তু বাঘের গর্জন খুব কাছ থেকে শুনতে পেয়ে তার ঘোড়াটা ঘাবড়ে গিয়ে, দলছুট হয়ে অন্যদিকে ছুটে গেছে। লাগাম ধরে জোরে টানলে ঘোড়াটা নাকি রেগে গিয়ে তাকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। বীরবর্মা যে তাকে এক

বিরাট বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে তারজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এবং তাঁর সম্পর্কে রাজকুমারী যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করে।

এই ঘটনার পর দু-জনের ঘোড়া পাশাপাশি যাচ্ছিল। কথায় কথায় রাজকুমারী স্বর্ণকেশী বলল, 'আমার বাবা আমার বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। গতকাল পর্যন্ত আমি অনেক পাত্র দেখেছি কিন্তু কোনো পাত্রকেই আমার পছন্দ হয়নি। এবার বাবা ঠিক করেছেন স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করবেন। শীঘ্র বাবা স্বয়ম্বর সভা ঘোষণা করবেন। আপনি কিন্তু ঘোষণার পর স্বয়ম্বর সভায় আসবেন। এই যা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। এতক্ষণ আমি নিজের কথাই বলে গেলাম। আপনার পরিচয় তো আমার কিছুই জানা হল না। আপনি কোত্থেকে এসেছেন? কে আপনি?'

'আমি মালবদেশের রাজকুমার। আমার নাম কল্যাণবর্মা।' বীরবর্মা এই মিথ্যা কথা রাজকুমারী স্বর্ণকেশীকে বলল।

'ও তাই বুঝি! আপনি আমার স্বয়ম্বর সভায় অবশ্যই আসবেন।' স্বর্ণকেশী বলল।

ওদের কথা শেষ হওয়ার পর স্বর্ণকেশীকে খুঁজতে খুঁজতে তার পরিবারের সবাই পৌঁছে গেল। ওদের সঙ্গে স্বর্ণকেশী উদয়পুর ফিরে গেল। যাওয়ার সময় স্বর্ণকেশীকে দেখে মনে হল বীরবর্মাকে ছেড়ে যেতে, তার কাছ থেকে বিদায় নিতে, তার কষ্ট হচ্ছে।

ফিরে এসে বীরবর্মা সমস্ত ঘটনা জানিয়ে শেষের দিকে বলল, 'কী জানি

কেন রাজকুমারী যেভাবে প্রশ্ন করল, তার জবাবে আমার মুখ থেকে মিথ্যা কথা বেরিয়ে গেল। আমি নিজেকে কল্যাণবর্মা বলে পরিচয় দিতে তখন একটুও কুণ্ঠাবোধ করিনি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কল্যাণবর্মা ঠিক করল, অবশ্য মনে মনে, যেকোনোভাবে তার বন্ধুর নামের স্বার্থকতা রক্ষা করতে হবে। বীরবর্মার ঘটনা শুনে কল্যাণবর্মার নীরব হয়ে যাওয়ার একটি কারণ ছিল। কিছুকাল থেকে কল্যাণবর্মা মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল স্বর্ণকেশীকে বিয়ে করবে। সে তার মনের এই ইচ্ছা, এমনকী তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বীরবর্মার কাছেও প্রকাশ করেনি। বীরবর্মার ঘটনা শুনে কল্যাণবর্মা বুঝল, স্বর্ণকেশী বীরবর্মাকে ভালোবাসে। ওদের এই ভালোবাসার মাঝখানে সে বাধা হয়ে দাঁড়াতে চায় না। কল্যাণবর্মা বলল, স্বর্ণকেশীকে তুমি যদি বিয়ে করতে চাও তাহলে এ ব্যাপারে তোমার যা প্রয়োজন হবে সবই তুমি পাবে। আমি চাই তোমাদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠুক। তোমাদের বিয়ে হোক।'

স্বর্ণকেশী ফিরে গিয়ে, সে যে কীভাবে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছে, কল্যাণবর্মা যে ঠিক সময় এসে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে ইত্যাদি বলে শেষের দিকে ওই ধরনের বীরকে বিয়ে করার ইচ্ছা সে বাবার কাছে প্রকাশ করল।

শুনে তার বাবা খুব খুশি হয়ে এককথায় রাজি হয়ে বলল, 'তোমার যদি কল্যাণবর্মাকে বিয়ে করার ইচ্ছা থাকে তাহলে সেই ইচ্ছা পূরণ করা যাবে।'

স্বর্ণকেশীর বাবা মেয়ের কথায় হঠাৎ রাজি হয়ে যাওয়ার পেছনে যে কারণ ছিল তা হল— রাজা ও রানি অনেকদিন আগে থেকেই কল্যাণবর্মার কথা শুনেছিল। রাজকুমার হিসেবে সে যেমন গুণী তেমনই দেখতেও সুন্দর ছিল। তবে এই বিষয়ে স্বর্ণকেশীর সঙ্গে ওদের কোনো কথা হয়নি। এখন স্বর্ণকেশী নিজেই যখন নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করল তখন এ ব্যাপারে রাজি না হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। বরং রাজার মনে হল মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে তার যে দুশ্চিন্তা ছিল সেই দুশ্চিন্তা দূর হল।

তিনি বললেন, 'মালবরাজার সঙ্গে আমার শেষ যে সাক্ষাৎ হয়েছে সেই সময়েই আমি তার ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিলাম। এতদিনে আকস্মিক যোগাযোগ হয়ে গেল। আমি কল্যাণবর্মার ছবিও জোগাড় করেছি। এখন থেকে তুমি ছবিটা রাখতে পারো।' বলে সে কল্যাণবর্মার ছবি স্বর্ণকেশীকে দিল।

ছবি দেখে স্বর্ণকেশী অবাক হয়ে গেল। যে লোকটাকে সে অরণ্যে দেখেছে এই ছবি তো তার নয়। কোথায় যে গোলমাল স্বর্ণকেশী তা বুঝতে পারল

না। সে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'আচ্ছা বাবা, মালবরাজার ক-টি ছেলে?'

'ক-টি নয়, একটিই ছেলে, নাম কল্যাণবর্মা। ওই ছেলেই যুবরাজ। কেন, কী হয়েছে?' রাজা জিজ্ঞেস করল।

'আর কিছু নয়, ছবির সঙ্গে রাজকুমারের ঠিক মিলছে না। ছবিটা একটু অন্যরকম লাগছে।' স্বর্ণকেশী বলল।

'ছবি কি অবিকল হয়? একটু উনিশ-বিশ হয়। ভাবছি একবার কল্যাণকে ডেকে পাঠাই। আমিও একটু দেখতে চাই।' রাজা বলল।

স্বর্ণকেশী ভাবল, 'কল্যাণবর্মা এলে ছবির সঙ্গে তা মুখের গরমিলের কারণ জানা যাবে।'

সেইদিনই উদয়পুরের রাজার কাছ থেকে কল্যাণবর্মা আমন্ত্রণ পেল। তৎক্ষণাৎ কল্যাণবর্মা বীরবর্মাকে ডেকে বলল, 'এখন তো তোমাকেই বেরোতে হবে। উদয়পুর থেকে আমন্ত্রণ এসেছে। একবার যখন কল্যাণবর্মা সেজেছ তখন আর একবারও সাজতে হবে। স্বর্ণকেশীর বাপের কাছে তুমি এমনভাবে অভিনয় করবে যাতে তোমাকে দেখে উনি বুঝতে না পারেন যে তুমি কল্যাণবর্মা নও। তবে স্বর্ণকেশীর কাছে সুযোগ বুঝে তুমি নিজের সঠিক পরিচয় দেবে। আমার নাম বলার আগে যেহেতু স্বর্ণকেশী তোমাকে ভালোবেসেছে সেইহেতু তুমি নিজের পরিচয় দিলেও স্বর্ণকেশী অবশ্যই তোমাকে ভালোবাসবে। বিয়ের পর্ব হয়ে গেলে আসল ঘটনা জানাজানি হলেও কিছু হবে না।'

রাজার সঙ্গে পরিচয়ের পর বীরবর্মা স্বর্ণকেশীর কাছে গেল। দু-জনের

মধ্যে অনেকক্ষণ কথা হওয়ার পর স্বর্ণকেশী হঠাৎ উঠে কল্যাণবর্মার ছবি এনে তাকে বলল, 'দেখুন তো এই ছবি চিনতে পারেন কি না?'

ছবি দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে বীরবর্মা বলল, 'এই ছবি এখানে কী করে এল?'

'কোনো এক রাজকুমার আমাকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করে বাবার কাছে পাঠিয়েছেন।' স্বর্ণকেশী বলল।

বীরবর্মা বলল, 'বিশ্বাসঘাতক?'

'বিশ্বাসঘাতকতা কল্যাণবর্মা করেননি। আপনি করেছেন। আসল ঘটনাটা আমার বাবার জেনে যাওয়ার আগে চলে যান।'

বীরাবর্মা ফিরে গেল। পরে কল্যাণবর্মার সঙ্গে স্বর্ণকেশীর বিয়ে হল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, স্বর্ণকেশী বীরবর্মাকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রথমে প্রকাশ করে, পরে কেন সরে গেল? সে রাজকুমার ছিল না— এটাই কি কারণ? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'কল্যাণবর্মার অনুমান অনুযায়ী স্বর্ণকেশী বীরবর্মাকে রাজকুমার হিসেবে ভালোবাসেনি। স্বর্ণকেশী কল্যাণবর্মার ছবি দেখেই বুঝেছিল কোথাও একটা মিথ্যা আশ্রয় পেয়েছে। বীরবর্মাকে নিজের ঘরে ডেকে স্বর্ণকেশী লক্ষ করল সে বিশ্বাসী বন্ধুকে বিশ্বাসঘাতক বলছে। তারই ফলে পরিণতিতে স্বর্ণকেশী কল্যাণবর্মাকেই বিয়ে করল।'

বিক্রমাদিত্য মুখ খুলতেই বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৩২. পরিবর্তন

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে গিয়ে, গাছ থেকে শব নামিয়ে, যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। সেইসময় শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, মানুষ বদলে যায়। মানুষের পরিবর্তন ঘটে তার ভাগ্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। এই পরিবর্তনের কারণ সবসময় বোঝা যায় না। বোঝানোও যায় না। আমার কথা যে সত্য তা প্রমাণ করার জন্য আমি সোমনাথের কাহিনি বলব। এই কাহিনি শুনলে পথ চলার পরিশ্রমও লাঘব হবে। বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল—

সোমনাথ ছিল বাপ-মায়ের এক ছেলে। কিন্তু সে বাপ-মায়ের কোনো কাজে এল না। ওদের কথা সে এককানে শুনত অন্য কানে বের করে দিত। সারাদিন টই টই করে ঘুরে বেড়াত, ঠিক খাবার সময় বাড়ি ফিরত। তার মা অনেক করে তাকে বোঝাত; কিন্তু মার কথা সে কানেই তুলত না। নানাভাবে তার মা চেষ্টা করেছিল তার এই ঘুরে বেড়ানোর অভ্যেস ছাড়াতে। কিন্তু কোনো ফল হল না। মাঝে মাঝে সোমনাথ মাকে দু-চার কথা শুনিয়ে দিত। তার বাবাও বেশি কথা বলত না। কিন্তু সহ্যের একটা সীমা আছে। তার বাবা একদিন, আর সহ্য করতে না পেরে, সোমনাথকে কড়া কথা শুনিয়ে দিল। বাপ যে তাকে অত কথা শোনাবে তা হয়তো সে ভাবতে পারেনি। কিন্তু যখন বাপের কড়া কথা শুনল তখন সে খুব দুঃখ পেল। তার কারণ, তার অপরাধ যে ঠিক কী, কেন যে বাবা তাকে অত বকছে, তা সে বুঝতে পারেনি। সে অত্যন্ত অপমানবোধ করল। মনে মনে গুমরে উঠে সে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

বাড়ি থেকে পালিয়ে সারাদিন সে হাঁটল। কোথায় যে যাচ্ছে তা সে জানে না। হাঁটতে হাঁটতে তার পা ফুলে ঢোল হয়ে গেল। খিদের জ্বালায় তার মাথা ঘুরতে লাগল। যেখানে সে জল দেখতে পেল সেখানেই সে জল খেতে লাগল। কিন্তু জলে তো আর খিদে মেটে না।

যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। সোমনাথের পথ চলার যেন বিরাম নেই। শেষে সে ঢুকে গেল এক অরণ্যে। ঢুকেই সে দেখতে পেল একটি ভাঙা মন্দির। তখন সে এত ক্ষুধার্ত যে হাঁটতে পারছিল না। তার মনে হল বাড়ি থেকে পালানো তার ভুল হয়েছে। বোকার মতো হঠাৎ পালানো উচিত হয়নি।

কোত্থেকে একটা গোরুর গাড়ি তার কাছে এসে থামল। গাড়ি থেকে এক বৃদ্ধ ক্ষীণকণ্ঠে অতি কষ্টে বলল, 'বাবা, আমি আর পারছি না। তুমি এই বলদগুলোকে খুলে একটু চরতে দাও।'

সোমনাথ নিজেই নড়তে পারছিল না। এমন সময় বৃদ্ধের অনুরোধ শুনে অনেক কষ্টে বলদগুলোকে খুলে চরতে ছেড়ে দিল। তারপর সোমনাথ এবং বৃদ্ধ নানা কথা বলতে লাগল। বৃদ্ধের নাম রামলাল। সে সোমনাথকে বলল, 'দেখো বাবা, তোমাকে দেখে আমার ছেলের কথা মনে পড়ছে। বাচ্চা বয়সেই ওর মা মারা গিয়েছিল। আমিই ছিলাম তার মা এবং বাবা। ছেলের উপর আমার অনেক আশা ছিল, কিন্তু আমার সব আশা ধুলোতে মিশে গেল। খারাপ সঙ্গীদের সঙ্গে মিশে সে এমন হয়ে গেল যে কখন যে কী করে বসবে সেই নিয়ে আমি ভয়ে ভয়ে কাটাতাম। শেষ পর্যন্ত হলও তাই। হঠাৎ একদিন সে এমন একটা অপরাধ করে বসল, যার ফলে সে রাজপ্রহরীদের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল। সেই যে গেল আর ফিরল না। কোথায় যে ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা জানি না। আমি তাকে খুঁজছি আর খুঁজছি।'

'দেখুন, ও হয়তো হঠাৎ কী ভেবে পালিয়ে গেছে। কিন্তু দেখবেন বেশিদিন আপনাকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না।' সোমনাথ বলল।

'আহা, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তোমার কথা শুনে মন জুড়িয়ে গেল। তোমার বাবা মা কত পুণ্যবান যে তোমার মতো একটা সুপুত্রকে পেয়েছে।' বলতে বলতে রামলাল কাশতে লাগল। একবার কাশি শুরু হলে আর থামে না।

কাশতে কাশতে রামলাল বলল, 'শোনো বাবা, আমার অপদার্থ ছেলের জন্য আমি ফতুর হয়ে গেলাম। এই গোরুর গাড়ি ছাড়া আমার আর কিছু নেই। আমি আর বাঁচব না। ভাগ্যিস এই অরণ্যে এলাম তাই তোমার মতো ভালো ছেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। শ্রীপুরে আমার এক বন্ধু আছে। নাম গঙ্গানাথ। তুমি তাকে একটু খবর দেবে।' বলতে বলতে রামলাল মারা গেল।

পরের দিন সকালে সোমনাথ একটা গর্ত খুঁড়ে সে গর্তে রামলালকে রেখে দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে দিল। তারপর সে গোরুর গাড়িতে চেপে অরণ্য থেকে বেরিয়ে গ্রামের সন্ধানে রওনা দিল।

অনেকদূর যাওয়ার পর একটি গাছ থেকে ফল পেড়ে গোগ্রাসে খেতে লাগল। ওই গাছটার মালিক ছিল গঙ্গানাথ। সে দূর থেকে দেখতে পেয়ে হাঁক পাড়তে পাড়তে এসে সোমনাথকে বলল, 'এটা কি তোমার ঠাকুরদার গাছ পেয়েছ যে ইচ্ছামতো পাড়ছ আর খাচ্ছ।'

'শুনুন বাবু, শুনুন। দু-দিন আমি খাইনি। কিচ্ছু খেতে পাইনি আমি। তাই দুটো ফল খাচ্ছি।' সোমনাথ বলল।

'ঘরবাড়ি নেই নাকি? যার তার গাছ থেকে পেড়ে খেলেই হল? কোন গ্রামের ছেলে তুমি, কোথায় যাচ্ছ?' গঙ্গানাথ প্রশ্ন করল।

'আমার গ্রাম জেনে আর কী হবে? আমি যাচ্ছি শ্রীপুরে। গঙ্গানাথবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। একটা খারাপ খবর আছে। গতকাল রামলাল মারা গেছেন। রামলালের একমাত্র বন্ধু হলেন গঙ্গানাথ। ওনার সাহায্যে এই গোরুর গাড়ি বিক্রি করে শ্রাদ্ধের কাজকর্ম করতে হবে।' সোমনাথ বলল।

'তুমি কী বলছ খোকা! আমার বন্ধু রামলাল মারা গেছে? আহা, ওর মনে কত আশা ছিল। আমাকে কত বার বলেছে, মরার আগে ছেলেকে একবার দেখতে চাই। সেইজন্যেই হয়তো তোমাকে একবার দেখেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।' গঙ্গানাথ এই কথাগুলো বলতে বলতে কাঁদতে লাগল। তার কান্না দেখে সোমনাথও কাঁদল। সোমনাথের কান্না দেখে গঙ্গানাথ তার পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিল। তারপর তাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বউকে বলল, 'শুনছো, এই হল রামলালের ছেলে। কাল রাত্রে রামলাল আমাদের মায়া ছেড়ে স্বর্গে গেছে।' স্বামীর মুখে এই কথা শুনে গঙ্গানাথের বউ সস্নেহে সোমনাথের মাথায় হাত বুলাল।

শ্রাদ্ধের কাজকর্ম হয়ে গেল। সোমনাথের কাজকর্ম, কথাবার্তা সব কিছুই গঙ্গানাথের ভালো লাগল। গঙ্গানাথ সোমনাথের বিষয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করল।

কিছুদিন পরে সোমনাথ চলে যেতে চাইল। চলে যাওয়ার কথা শুনে অবাক হয়ে গঙ্গানাথ বলল, 'তুমি কোথায় চলে যাবে বাবা? তোমার বাবা বেঁচে থাকতে আত্মীয়স্বজন বলো, বন্ধুবান্ধব বলো, সব কিছুই আমরা ছিলাম। এখন তোমার প্রতি আমাদের কর্তব্য আছে। তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমাদের মেয়েকে বিয়ে করে সংসারে মন দাও। সারাজীবন ঘুরে বেড়ালে তোমার বাবার আত্মা কষ্ট পাবে বাবা। আমার কথা শোনো।'

সোমনাথ কিছুক্ষণ ভেবে গঙ্গানাথের মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেল। বিয়ের পর সোমনাথ গঙ্গানাথের ঘরজামাই হয়ে রইল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, সোমনাথ নিজের বাপ-মায়ের কথা শুনল না। তার বাপ-মা তাকে কোনোদিন ভালো ছেলে বলেনি। কিন্তু রামলালের ওই ছেলেকেই পছন্দ হল। সোমনাথ গঙ্গানাথের মেয়েকে বিয়ে করে ঘরজামাই হিসেবে থাকতে রাজি হওয়ার পেছনে কোনো খারাপ মতলব ছিল না তো? নিজেকে রামলালের ছেলে বলে মেনে নিতে তার একটুও বাধল না কেন? ক্ষণিকের পরিচিত একটা বৃদ্ধকে বাপ হিসেবে মেনে নিতে তার সংস্কারে বা বিবেকে বাধল না। নিজের বাপ বেঁচে থাকতে অন্যকে বাপ বলতে সে পারল কী করে? আমার প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

বেতালের প্রশ্নের জবাবে বিক্রমাদিত্য বললেন, 'পিতাপুত্রের সম্পর্ক, সাধারণ সম্পর্ক নয়। রক্তের সম্পর্ক। তা সত্ত্বেও যদি বনিবনা না হয় তাহলে শুধু এক পক্ষকেই দোষ দেওয়া যায় না। বাপ নিজের কাজে থাকত। ছেলে কেন যে ঘুরে বেড়াত, কী করলে যে তাকে ঠিকপথে আনা যাবে তা নিয়ে বাপ কোনোদিন গভীরভাবে ভাবেনি। আর ভাবেনি বলেই তার প্রতিকারও সঠিকভাবে করতে পারেনি। ছেলে দৈনন্দিন জীবনে যা করে তার প্রতিকার করা অত সহজ নয়। তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে তাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করলে সোমনাথকে নিশ্চয় বদলানো যেত। রামলালের ছেলে রাজার প্রহরীদের ভয়ে পালিয়েছিল। বাপের উপর রাগ করে নয়। বাপেরও টান ছিল ছেলের উপর। আচার আচরণে সোমনাথকে ভালো লেগেছিল গঙ্গানাথের। তাহলে সোমনাথ নিশ্চয় ভালো ছেলে ছিল। ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট পেয়েও সে বৃদ্ধকে সাহায্য করেছিল। রামলালের কোনো সম্পত্তি ছিল না। অতএব তার ছেলে বলে ঘোষণা করে ওই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার ইচ্ছাও সোমনাথের মনে ছিল না। গঙ্গানাথ চাইল রামলালের আত্মা শান্তি পাক। তার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য সোমনাথ তার মেয়েকে বিয়ে করল।'

রাজা বিক্রমাদিত্যের এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ওই গাছে ফিরে গেল।

৩৩. ব্যাবসার ভাগ্য

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে গিয়ে গাছ থেকে শব নামিয়ে যথারীতি শ্মশানের দিকে নীরবে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, সবাই সব কাজ পারে না, কেউ কেউ পারে। আর কিছুটা পাওয়ার ভাগ্যও থাকা চাই। ভাগ্যে নেই জানা সত্ত্বেও রতনশেঠ জিদ ধরে না থেকে হাল ছেড়ে দিয়েছিল। আমার ধারণা, যা পারা যাবে না, যা পাওয়া যাবে না, তার বিষয়ে আশা ছেড়ে দেওয়াই ভালো। উদাহরণস্বরূপ আমি রতনশেঠের কাহিনি বলছি। শুনলে তোমার পথচলার পরিশ্রম লাঘব হবে।' বলে বেতাল এই কাহিনি বলল—

প্রাচীন কালে রত্নগিরিতে রতনশেঠ ও গোবিন্দশেঠ নামে দুই বন্ধু ছিল। জাতব্যাবসা না হলেও রতনশেঠ চাষ-আবাদের দিকেই ঝুঁকল। সে ব্যাবসার দিকে গেল না। গোবিন্দশেঠ ব্যাবসা করে ভালো পয়সা করেছিল।

গোবিন্দ একবার তার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আচ্ছা রতন, তোমার চোদ্দোপুরুষ ব্যাবসা করল আর তুমি চাষ করতে শুরু করে দিলে কেন?

'ব্যাবসা সইছে না ভাগ্যে?' রতন বলল।

রতনের ঠাকুরদা মস্তবড়ো ব্যাবসাদার ছিল। সাতসমুদ্রের ওপার থেকে জিনিস আনত আবার এপারের জিনিস ওপারে বিক্রি করত। একবার সমুদ্রে জাহাজ ডুবে গেল। তার ঠাকুরদাও জাহাজের সঙ্গে ডুবে মরে গেল। ঠাকুরদা মারা যাওয়ার পর রতনের বাবা ভীষণ দুঃখ পেয়ে ব্যাবসা করাই ছেড়ে দিয়ে চাষ করতে লাগল। বাপের আমলে চাষের তত উন্নতি না হলেও রতন চাষ করে যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। ফলে তার কোনোকিছুর অভাব হয়নি। একবার গোবিন্দ বলল, 'দেখো রতন, একটা ভালো সুযোগ এসেছে। সুগন্ধি জিনিসের ব্যাবসা। সমুদ্রে পাড়ি দিতে হবে। এই ব্যাবসায় যত টাকা ঢালব তার চার গুণ তুলে আনতে পারব। তুমিও যদি টাকা ঢালো তাহলে খুব ভালো হয়।'

বন্ধুর কথা শুনে রতনের মতিভ্রম ঘটল। সে গোবিন্দের সঙ্গে ব্যাবসায় অর্ধেক টাকা ঢালতে রাজি হয়ে গেল। স্ত্রীর বারণও রতন শুনল না। সে অর্ধেক জমিজায়গা বিক্রি করে সেই টাকা ব্যাবসায় ঢেলে দিল। ব্যাবসায় ঢালার পর তার ইচ্ছা করল গোবিন্দর সঙ্গে সমুদ্রে পাড়ি দিতে। বেরোনোর আগে হঠাৎ তার ইচ্ছা করল ছেলেদেরও সঙ্গে নিতে। শেষপর্যন্ত রতনের চারটি ছেলেও রওনা দিল।
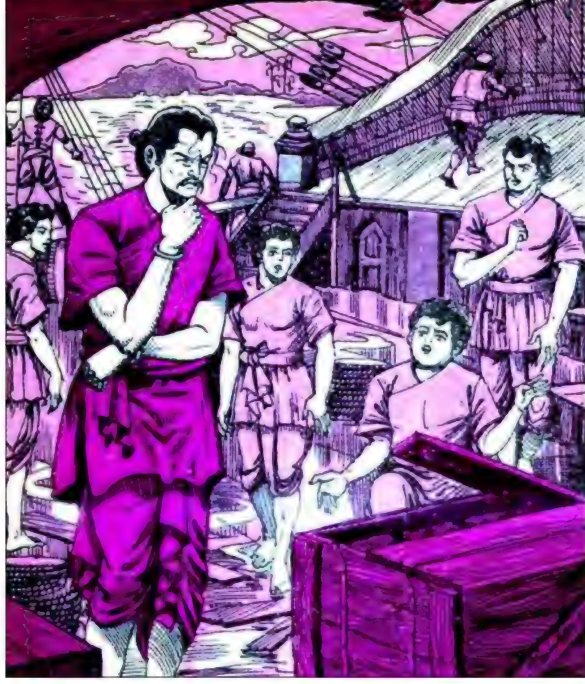
সুগন্ধি জিনিসে জাহাজ বোঝাই হল। মাঝসমুদ্রে ঝড় উঠল। সেই ঝড়ে সমস্ত সুগন্ধি দ্রব্য ভিজে নষ্ট হয়ে গেল। ঝড়ের ঝাপটায় কোনোরকমে জাহাজটা একটা তীরে ভিড়ল। গোবিন্দ, রতন কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে সমুদ্রের অজানা এক তীরে উঠল। তারপর ভেজা সুগন্ধি জিনিস জলের দামে বিক্রি করে ওরা বাড়ি ফিরল।

রতনের বউ বার বার ঠাকুরদেবতার নাম করে বলছিল, 'টাকা যায় যাক ঠাকুর, আমার স্বামী ও ছেলেরা যে প্রাণে বেঁচে এসেছে এটাই আমার সৌভাগ্য।'

ব্যাবসার একটা নেশা আছে। ব্যাবসাদারকে মাঝে মাঝে এই নেশা পেয়ে বসে। ফলে তার জিদ চেপে যায়। রতন বাকি যে জমিজায়গা ছিল তা বিক্রি করে দিয়ে আবার সুগন্ধি জিনিস কিনে সমুদ্রে পাড়ি দিতে তৈরি হয়ে গোবিন্দকে বলল, 'কি হল, তুমি সমুদ্রে যাবে না?'

'আবার! না বাবা, আর যাব না।'

এবারেও রতন নিজের ছেলেদের সঙ্গে নিল। যথারীতি স্ত্রীর বারণ ছিল। কিন্তু রতন গোঁ ধরে রওনা দিল।

এবারে রতন অনেক টাকা লাভ করতে পারল। যেখানে চার গুণ লাভ করার কথা সে দশ গুণ লাভ করল। ফিরে এসে যে যত জমি বিক্রি করে দিয়েছিল তার দ্বিগুণ পরিমাণ জমি কিনে আরও অনেক জিনিস এবং গয়নাগাঁটি কিনে নিল।

রতনের লাভের অঙ্ক শুনে গোবিন্দ দুঃখে মাথা চাপড়াতে লাগল। সে অনুতপ্ত হয়ে বলল, 'যা হয়ে গেছে তার দুঃখ ভুলে যাওয়া অত সহজ নয়, তবে এখন থেকে বলে রাখছি, তুমি আগামী বারে যখন যাবে আমি অবশ্যই তোমার সঙ্গে যাব।'

'তুমি যে আমার সঙ্গে যাবে বলছ, তার আগে আমি আর যাব কি না জিজ্ঞেস করবে তো। শোনো গোবিন্দ, ব্যাবসা আমাদের চোদ্দোপুরুষের কাজ হলেও ঠাকুরদাদার আমল থেকে আমাদের ভাগ্যে সইছে না। তাই আর ব্যাবসায় নামছি না।' রতন বলল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, রতন হঠাৎ এ কী করল! সে যখন জানত যে ব্যাবসা তাদের ভাগ্যে সইছে না তখন দু-দু বার টাকা ঢালল কেন? প্রথম বারে অত টাকা খুইয়ে দ্বিতীয় বার ব্যাবসা করতে গেল কেন? আর দ্বিতীয় বার দশগুণ লাভ করেও ঝট করে ব্যাবসা করব না বলল কেন? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'চাষ এবং ব্যাবসা দু-রকমের কাজ। মানুষ যে ধরনের কাজ করে তার মনও সেই ধরনের হয়ে যায়। ব্যাবসার একটা মানসিকতা আছে। একটা জুয়াড়ির যত সাহস থাকে তার চেয়ে বেশি সাহস রাখে ব্যাবসাদার। শুধু সাহস নয়, ধৈর্য এবং পরিশ্রম করার ক্ষমতাও থাকা চাই। রতন বুঝেছিল ব্যাবসাদারের ধৈর্য এবং সাহস তার মধ্যে নেই। এই বোধ থেকে সে ব্যাবসা ছেড়ে দিল। গোবিন্দর কথায় বাপঠাকুরদাদার মানসিকতা একবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। তাই সে হঠাৎ গোবিন্দর সঙ্গে ব্যাবসা করতে রাজি হয়ে গেল। দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা পর পর দু-বার ঘটে না। তাই দ্বিতীয় বারে সমস্ত টাকা ঢেলে রতন ব্যাবসায় নেমে গেল। এটা তার একটা জুয়ো খেলা। এই জুয়োতে সে ভালোভাবেই জিতল। জীবনে জুয়ো খেলার ঝুঁকি দু-একবার নেওয়া যায়, সারাজীবন ঝুঁকি নেবার মানসিক অবস্থা রতনের ছিল না। সে আর একবার বুঝল সারাজীবন ধৈর্য এবং সাহস রেখে তার পক্ষে ব্যাবসা করা সম্ভব নয়। তাই সে আবার চাষের কাজ শুরু করে দিল।'

রাজা বিক্রমাদিত্যের এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৩৪. কথার দাম

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে গিয়ে, গাছ থেকে শব নামিয়ে, কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে নীরবে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তোমার মতো কিছু রাজা কোনটার কত দাম তা বোধ হয় জানে না। আর জানো না বলেই দেশ শাসন করে, ইচ্ছেমতো খেয়ে, সেবা করিয়ে বিশ্রামে থেকে, সুখভোগ করার পরিবর্তে এই গভীর রাত্রে কত-না ঝামেলায় পড়ছ। প্রসঙ্গত আমার মনে পড়ে গেল চন্দ্রগিরির রাজার কথা। ওই রাজা একটা অসভ্য লোকের পাল্লায় পড়ে আজেবাজে কথা শুনে এমন হয়ে গেল যে, এক মহান পণ্ডিতের কথা সহ্য করতে পারল না। আমি তার কাহিনি বলছি। শুনতে শুনতে হাঁটলে পথচলার পরিশ্রম কমে যাবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল—

চন্দ্রগিরির রাজা পণ্ডিত এবং সাহিত্যিকদের অনুরাগী ছিল। তার আশ্রয়ে বহু পণ্ডিত এবং কবি থাকত। ওদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিল ধনঞ্জয়। ধনঞ্জয় যে তার আশ্রয়ে আছে তারজন্য রাজা গর্বিত ভেবে ধনঞ্জয়েরও গর্ব ছিল।

রাজা মাঝে মাঝে ছদ্মবেশে দেশের অবস্থা নিজের চোখে দেখে আসতে বেরোত। একবার ওইভাবে ঘুরে বেড়ানোর সময় রাজা এক ভয়ংকর বিপদে পড়ে গেল। রাজাকে সেই বিপদ থেকে বাঁচাল এক মেষপালক রাখাল। রাজধানীতে ফিরে এসে রাজা ওই রাখালকে ডেকে আনতে লোক পাঠাল। লোকগুলোর ওপরে রাজার নির্দেশ ছিল ওরা যেন রাখালকে সসম্মানে আনে।

রাজসভায় পা রেখেই রাখাল হতবাক হয়ে গেল। রাজা সিংহাসন থেকে নেমে এসে রাখালকে অভিনন্দন জানিয়ে বলল, 'মনে আছে, তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ? তোমাকে সম্মানিত করতে আনিয়েছি।'

রাজার কথা শেষ হওয়ার আগেই রাখাল তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, 'কি, তুমি রাজা? রাজা হয়ে তুমি নিজেকে বাঁচাতে পারনি? যে নিজেকে

বাঁচাতে পারে না সে আমাদের সবাইকে বাঁচাবে কী করে?’

রাখালের কথা শুনে সভার মধ্যে যারা ছিল তারা সবাই অবাক হয়ে গেল। প্রত্যেকে ভাবল রাজা রাখালকে কঠোর শাস্তি দেবে। কিন্তু রাজা হাসিমুখে তাকে বলল, ‘তুমি দামি কথা বলেছ। জীবনে মাত্র একটি বার বিপাকে পড়ে যদি কেউ অন্যের সাহায্য নেয়, তাহলে ওই একটি ঘটনা দিয়ে সারাজীবনে বিচার হয় না।’ বলে রাজা তাকে একশোটি স্বর্ণমুদ্রা উপহার দিল।

অত স্বর্ণমুদ্রা পেয়ে রাখাল হতবাক হয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে সে ওই স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে অনেকক্ষণ ভেবে রাজাকে বলল, ‘এবার থেকে ছদ্মবেশে ঘোরার সময় একটু সাবধানে থেকো। আমি ভীষণ কাজেকম্মে থাকি। সবসময় তোমাকে বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য ছুটে আসতে পারব না।’

তার কথা শুনে রাজা হেসে উঠল। রাজার ধৈর্য দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল।

এই ঘটনার পর থেকে ধনঞ্জয়ের মনে একটা দুঃখ থেকে গেল। রাজা হিসেবে রাখালকে সভায় ডেকে পাঠানো এবং তাকে সম্মানিত করা পর্যন্ত যা-কিছু ঘটল সব ঠিক ঠিকভাবেই ঘটেছিল। কিন্তু সভার অত লোকের মধ্যে রাখাল ফিরে যাওয়ার আগে যে ধরনের কথা বলল তা হাসিমুখে সহ্য করা উচিত হয়েছে বলে মনে হল না। যে লোকটা কোথায় কীভাবে রাজার সঙ্গে কথা বলতে হয় জানে না, তার মতো অপদার্থকে সম্মানিত করা আদৌ উচিত হয়েছে কি না, এই মৌলিক প্রশ্ন তার মনে জাগল।

তার ইচ্ছে করল যে রাখালকে রাজা সম্মানিত করেছে সেই রাখাল স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে কী করছে তা জানার। আর একটা বিষয়ে তার জানার ইচ্ছা করল রাখালকে উপহার দেওয়ার বিষয়ে সভার লোক কী ভাবছে।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে ধনঞ্জয় একটা সুযোগ পেল। রাজার এক প্রশ্নের জবাবে সে বলল, ‘যে বিষয়ে অতি মূর্খের মনেও সন্দেহ জাগে না, আপনার জাগল?’
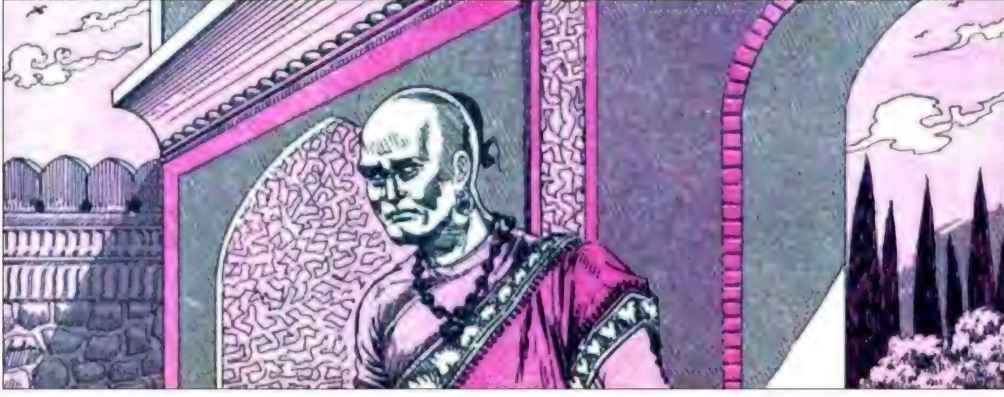
তার কথা শুনে রাজা অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। রক্তচক্ষুতে রাজা ধনঞ্জয়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে হঠাৎ চলে গেল।

পরদিন রাজা ধনঞ্জয়ের চাকরি খেল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, এই চন্দ্রগিরির রাজা যা করল তার কি কোনো মানে হয়? রাখালের মতো একটা মূর্খ লোক সভার অতগুলো লোকের মধ্যে রাজাকে অপমানজনক কথা বলে পার পেয়ে গেল। আর অতবড়ো পণ্ডিত ধনঞ্জয়ের মুখে সামান্য কথা শুনে রাজা এত রেগে গেল যে তাকে তার পদ থেকে সরিয়ে দিল। এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না-দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এই প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'অনেকগুলো কারণে রাজার কাজকর্মের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করা যায়। যে প্রাণদান করে সে পিতৃতুল্য। পিতা তার পুত্রকে সাবধান করে দিতে পারে। সেইজন্যেই রাজা রাখালের কথা অপমানজনক কথা হিসেবে মনে করেনি। রাখাল যেভাবে বলল তাতে রাজার রাগের পরিবর্তে হাসি পাওয়ারই কথা। একমাত্র ভাঁড় রাজসভায় এই ধরনের কথা বলতে পারে। তৃতীয় কারণ হল রাজসভায় ঢুকে রাখালের যে কী অবস্থা হয়েছিল তা রাজা বুঝতে পারলেন। রাজসভায় কীভাবে কথা বলতে হয়, চলতে হয় তা সে জানে না। সে কোনোদিন কল্পনাই করেনি যে রাজসভায় তাকে সম্মানিত করা হবে। আর একটি কারণ হল, রাজা ভালোভাবেই জানতেন যে রাখালের কথায় রাজসভার কেউ অত গুরুত্ব দেবে না। কিন্তু ধনঞ্জয়ের কথার প্রভাব সভায় যারা উপস্থিত থাকে তাদের মনে গভীরভাবে পড়তে পারে। তাই ধনঞ্জয়ের অপমানজনক কথা সহ্য করলে দু-দিন পরে যেকোনো লোক রাজাকে অপমানজনক কথা বলতে পারে। তাই রাজা ধনঞ্জয়কে সরিয়ে দিলেন।'

রাজার মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৩৫. ঘুসখোর পার পেল

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে গিয়ে, গাছ থেকে শব নামিয়ে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি হয়তো কোনো নীতিগত বিষয় মনে রেখে এত পরিশ্রম করছ। আমি জানি নীতি অনুসরণ করে না চললেও কেউ কেউ সংসারে শাস্তি পায় না। নীতি মেনে না চললে যদি শাস্তি না পায় তাহলে নীতি নিয়ে এত পরিশ্রম করার যে প্রয়োজন আছে, আমি তা মনে করি না। আমার বক্তব্যের স্বপক্ষে আমি তোমাকে গিরিধর নামক একজনের কাহিনি বলছি। কাহিনিটি শুনতে শুনতে পথ চললে, পথ চলার পরিশ্রম লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল—

অনেককাল আগে হরিপ্রসাদ নামে একজন, তিন-তিনটে গ্রামের জমিদার ছিল। জমিদারির যাবতীয় কাজকর্ম দেখাশোনা করত গিরিধর। চরিত্রের দিক থেকে লোকটা ছিল ভালো, বিশ্বাসী এবং জমিদারের যে বিষয়টা গোপন রাখার সে বিষয় গোপন রাখার ক্ষমতা ছিল। জমিদারও তার প্রতিটি পরামর্শ কান পেতে শুনত। তার উপদেশ মতো চলত।

এই তিনটে গ্রামের গ্রামবাসীদের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি খবর রাখত গিরিধর। কারণ গ্রামবাসীরা গিরিধরের কাছেই তাদের অভাব অভিযোগের কথা জানাত। আস্তে আস্তে গ্রামগুলো বর্ধিষ্ণু হল। লোকের সংখ্যা বাড়ল। সেই অনুপাতে চাহিদা বেড়ে গেল। চাহিদা অনুযায়ী সবসময় কাজ হত না। ফলে অশান্তি দেখা দিল। কিছু লোক প্রভাবশালী হয়ে উঠল। গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকেই গিরিধরকে নমস্কার করত। প্রভাবশালী ধনী লোকেরা গিরিধরকে পুজোপার্বণ উপলক্ষ্যে কাপড়জামা, আংটি এবং তার সঙ্গে কিছু টাকা উপহার দিত। এই ধনীরা তাদের সম্পদ বাড়ানোর জন্য গরিবদের বেশি করে খাটাত। প্রতিদানে টাকা দিত কম। এই নিয়ে ধনী এবং
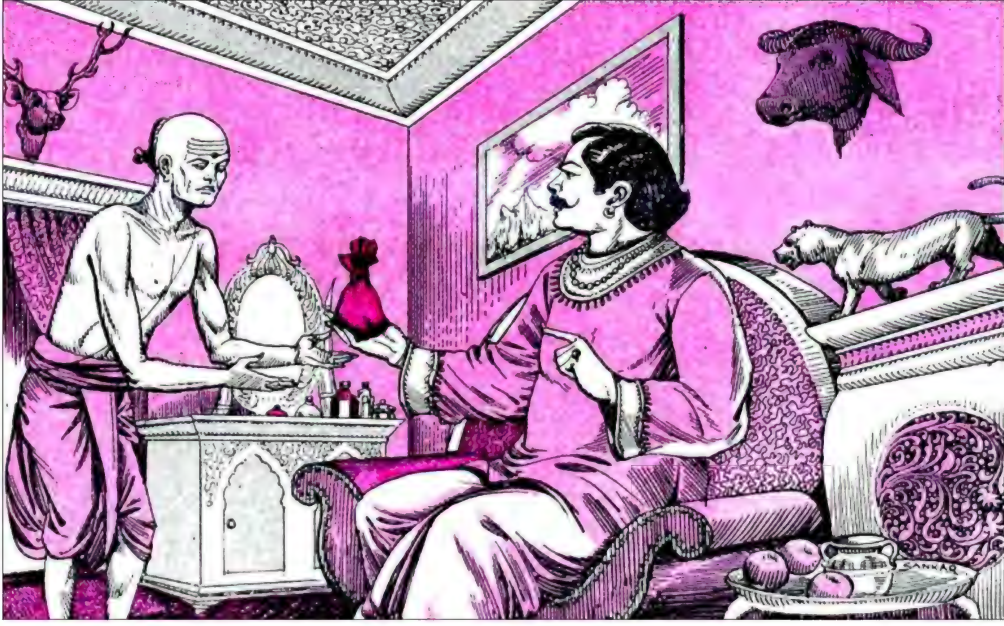
গরিবদের মধ্যে মাঝে মাঝে বিরোধ দেখা দিত। ঝগড়া হত। গিরিধরকে যারা টাকা দিত, তারা কোনো অন্যায় কাজ করলেও গিরিধর তাদের কিছু বলতে পারত না। পূজারি, বিদ্যালয়ের পণ্ডিতমশাই প্রত্যেকেই সাধ্যমতো গিরিধরকে ভেট দিতে লাগল। দেখতে দেখতে ওই তিনটে গ্রামে গিরিধরকে ভেট দেওয়ার একটা প্রতিযোগিতা দেখা দিল। গিরিধরের স্ত্রীর গলা সোনার অলংকারে এবং আসবাবপত্রে বাড়ি ভরে গেল।

ফলে হরিপ্রসাদের জমিদারির অন্তর্গত তিনটি গ্রামের মধ্যে, প্রায় প্রতিটি বাড়িতে ঘুসের প্রভাব পড়ল। ঘুস নেওয়া এবং ঘুস দেওয়া জলভাত হয়ে গেল।

শেখর নামে এক গরিব শিক্ষিত লোক ছিল। সে এত গরিব ছিল যে এক একদিন একমুঠো ভাতও খেতে পেত না। গ্রামের অবস্থা এমন হয়ে গেল ঘুস ছাড়া সহজভাবে কিছুই পাওয়া গেল না। যত ছোটো কাজ হোক না কেন ঘুস ছাড়া তা পাওয়ার উপায় ছিল না। অনেকদিন কাজকর্ম না-পেয়ে খিদের জ্বালা সহ্য করতে না-পেরে আর গিরিধরের ঘুস নেওয়ার বহর দেখে শেখরের ভীষণ রাগ হল। সে সোজা একদিন জমিদারের কাছে গিয়ে তাকে বলল, ‘আপনার জমিদারিতে কী চলছে আপনি কি তা জানেন? আপনার জমিদারিতে ঘুস ছাড়া কোনো কাজ হচ্ছে না। ঘুস দেয় যারা, তারা গরিবদের দিনরাত খাটিয়ে, মজুরি কম দিয়ে, ওদের ঠকিয়ে পয়সা করে। আর এসবের মূলে আছে আপনার অতি বিশ্বাসী গিরিধর। শুনে হয়তো আপনি অবাক

হচ্ছেন, কিন্তু আমি মিথ্যা কথা বলছি না। আমার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। আপনার এত বড়ো বিশ্বাসী পাত্রের বিরুদ্ধে আমি বাধ্য হয়ে বলছি। এর জন্য আমি দুঃখিত কিন্তু নিরুপায়। ভয়ে কেউ আপনাকে বলে না। আমি আর সহ্য করতে না-পেরে বলছি।'

জমিদার শুনে অবাক হয়ে গেল। আসলে গিরিধরের উপর হরিপ্রসাদের ছিল অগাধ বিশ্বাস। এত বছর ধরে গিরিধর তিনটি গ্রামের সব কিছু দেখাশোনা করছে। তার বিরুদ্ধে কেউ আজ পর্যন্ত কোনো অভিযোগ করেনি। তাই শেখরের কথা বিশ্বাস করতে জমিদারের কষ্ট হয়েছিল। হরিপ্রসাদ বলল, 'শেখর, তুমি গিরিধরের বিরুদ্ধে যা বলেছ তা যদি সত্য প্রমাণিত হয় তাহলে আমি তাকে দূর করে দেব।'

এরপর জমিদার একটা ব্রাহ্মণকে ডেকে বলল, 'তোমাকে ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। এখানে একটা মন্দির আছে। এই মন্দিরের পূজারির পদ নেওয়ার জন্য তুমি চেষ্টা করো। প্রয়োজন হলে এই একশোটি টাকা তুমি খরচ করো ওই পদ পাওয়ার জন্য।' তার চলে যাওয়ার পর হরিপ্রসাদ আর একজন ব্রাহ্মণকে ডেকে বলল, 'তুমি বহু বছর ধরে বিভিন্ন জায়গায় পুজো করে আসছ। তোমার অভিজ্ঞতা সীমাহীন। তুমি গিরিধরের সঙ্গে দেখা করো। তাকে নমস্কার করে, একটা নতুন মন্দির হয়েছে, সেই মন্দিরের পূজারির পদ চাও। এই নাও ঠিকানা। আমার ধারণা তুমি ওই পদ পেয়ে যাবে।'

দুই ব্রাহ্মণ একটু আগে-পরে গিরিধরের কাছে গেল। প্রথম ব্রাহ্মণ টাকার থলি নিয়ে বসেছিল। দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ গিরিধরের বাল্যবন্ধু ছিল। গিরিধর দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করে শেষে বলল, 'আমার ধারণা তোমার মতো অভিজ্ঞ পূজারিকে ওই মন্দিরের পূজারি করতে জমিদারকে রাজি করাতে পারব।'

প্রথম ব্রাহ্মণ গিরিধরের সঙ্গে দেখা করে ওই পূজারির পদ পাওয়ার কথা জানাল। গিরিধর বলল, 'আপনাকে আমি কোনোদিন কোথাও পুজো করতে দেখিনি। আমি কী করে বলব জমিদারকে ওই পদ দিতে। আপনি এখন আসতে পারেন।'

গিরিধর দ্বিতীয় ব্রাহ্মণকে পূজারির পদে বহাল করার জন্যে হরিপ্রসাদকে পরামর্শ দিল। তারপর হরিপ্রসাদ শেখরকে ডেকে বলল, 'আমি গিরিধরকে পরীক্ষা করে দেখেছি। গিরিধর ঘুস খায় না, তার প্রমাণ আমি পেয়েছি।'

শেখর কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'মাত্র একবারের চেষ্টায় অত বড়ো ঘুসখোরকে ধরা যায়? আপনি আর একবার পরীক্ষা করে দেখুন। আপনি গিরিধরের

বাড়িতে গিয়ে বাড়ির সাজসজ্জা আর তার স্ত্রীর গয়নাগাঁটি নিজের চোখে দেখে আসুন। আপনি যা মাস মাহিনা দেন তাতে গিরিধর অতকিছু কী করে করতে পারে?'

শেখরের কথা শুনে হরিপ্রসাদ ঠিক করল, খাজনা আদায়ের অজুহাতে সে এক বার প্রত্যেক গ্রামে ভালো করে ঘুরে আসবে। সেই সময় গিরিধরের বাড়ি এবং তার স্ত্রীকেও দেখে আসবে।

হরিপ্রসাদের বেরুনোর আগের দিন গিরিধরের শ্যালক এসে বলল, 'আমাদের গ্রামে অনেকখানি চাষের জমি জলের দামে বিক্রি হচ্ছে। আমার কাছে টাকা থাকলে আমি কিনে ফেলতাম। তুমি যদি কিনতে চাও, এক্ষুনি চলো।'

গিরিধর কালমাত্র বিলম্ব না করে স্ত্রীর সমস্ত গহনা বন্ধক রেখে শ্যালককে জমি কিনে ফেলতে বলল। তারপর সে স্ত্রীকে বলল, 'দেখো সব গহনা তুমি ফেরত পাবে। আমি তো বিক্রি করছি না, বন্ধক রেখেছি ঠিক ছাড়িয়ে নিতে পারব। জলের দামে জমিটা পাচ্ছি কিনে নিই।'

সেইদিনই প্রতিবেশীর বাড়িতে বিয়ে ছিল। ওদের সঙ্গে গিরিধরের ভালো সম্পর্ক ছিল। ওরা দু-চারদিন ব্যবহার করার জন্য গিরিধরের বাড়িতে যত আসবাবপত্র ছিল সব ধার নিয়ে গেল।

পরেরদিন হরিপ্রসাদ আসার পর গিরিধর একটা মাদুর পেতে জমিদারকে বসাল এবং নিজে বসল একটি পিঁড়িতে। গিরিধরের বউ, বাড়ির ভেতরে স্বামীকে দুঃখ করে বলল, 'সব তো প্রতিবেশীদের দিয়ে দিলে। একটা রুপোর গ্লাসও নেই যে জমিদারকে একগ্লাস জল দেব।' বলে গজগজ করতে করতে একটা কাঁসার গ্লাসে তাকে জল দিল। জল নেওয়ার সময় জমিদার আড়চোখে গিরিধরের স্ত্রীর গলার দিকে তাকাল। তার গলায় তখন একটি পুঁতির মালা ছিল। হাতে সোনার কোনো অলংকার ছিল না। এসব লক্ষ করে হরিপ্রসাদ বলল, 'আমার জন্য ব্যস্ত হতে হবে না। হঠাৎ ইচ্ছে হল একটু ঘুরে ঘুরে দেখছি, গ্রামের মানুষ কেমন আছে।'

গিরিধর খুব দুঃখ পাওয়ার মতো ভঙ্গি করে বলল, 'আপনি পায়ে হেঁটে এত কষ্ট করছেন কেন? আমাকে ডেকে পাঠালেই হত। ভালো কথা, একটু দাঁড়ান। কাল পর্যন্ত যা আদায় হয়েছে আপনাকে দিয়ে দিই।' বলে গিরিধর টাকা দিতে এলে হরিপ্রসাদ বলল, 'এখন ওই টাকা তোমার কাছেই থাক। পরে আমি নেবখন।' বলে হরিপ্রসাদ ফিরে গিয়ে শেখরকে সেদিনই ডেকে পাঠাল।

'দেখো শেখর, তুমি আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছ, আমি দেখে এসেছি গিরিধরের বাড়িতে আসবাবপত্র বলতে ছেঁড়া মাদুর আর পিঁড়ি আছে। আর

তার স্ত্রীর গলায় একটা পুঁতির মালা আছে। তুমি আর কোনোদিন আমার কাছে এই ধরনের মিথ্যা কথা বলতে আসবে না। চলে যাও।' হরিপ্রসাদ বলল।

শেখর বড়ো দুঃখ পেল। 'একটা জলজ্যান্ত ঘুসখোর বার বার জমিদারের চোখে ধুলো দিতে পারছে। আমি প্রমাণ করতে পারলাম না। তাহলে কি প্রত্যেক বার ভগবান একটা ঘুসখোরকে বাঁচাচ্ছে! কী জানি!' ভাবতে ভাবতে শেখর ফিরে গেল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, শুনলে তো কীভাবে একাধিক বার গিরিধর বিপদের হাত থেকে বেঁচে গেল। গিরিধরের প্রতি জমিদারের অন্ধবিশ্বাস কিছুতেই ভাঙা গেল না। এর কারণ জানা সত্ত্বেও যদি না জানাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'গিরিধর যে নীতিহীন কাজ করেছে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। গিরিধর যে ঘুস নিত সেটাকে কখনোই সমর্থন করা যায় না। তবে গিরিধরের মূল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ঘুস নেওয়া ছিল না। নির্দিষ্ট পদে উপযুক্ত লোককে নিয়োগ করাই তার লক্ষ্য ছিল। ঘুস ছাড়া সে উপযুক্ত লোককে নেয়নি এ-রকম অভিযোগ খাটে না। সে শোষণ করেনি। যারা গরিবদের শোষণ করে তারা তার বাড়িতে এসে যদি কিছু ভেট দেয় সেটাকে সে ফিরিয়ে দেয়নি। গিরিধরের ওপরে সবচেয়ে বড়ো যে অভিযোগ শেখর করেছিল সেটা প্রমাণিত না হওয়ায়, তার বাড়িতে কিছু আসবাবপত্র দেখলেও, হরিপ্রসাদ হয়তো শেষপর্যন্ত তার চাকরি খেত না। আগের দিন যা আদায় হয়েছে তাও গিরিধর জমিদারকে দিয়ে দিতে চাইল। এর ফলে জমিদার বুঝল, গিরিধর কত সৎ এবং বিশ্বাসী। জমিদারের কাছে অন্য কেউ অভিযোগ না করায় এবং আদায়কৃত খাজনা ঠিকসময় পেয়ে যাওয়ায় গিরিধরের উপর অবিশ্বাসের কোনো কারণ রইল না।'

রাজার মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৩৬. পিতৃসত্য পালন

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে যথারীতি কাঁধে ফেলে শ্মশানের দিকে নীরবে হাঁটতে লাগলেন। এমন সময় শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, উন্নত ধরনের আদর্শ স্থাপনের জন্যই তুমি হয়তো এত পরিশ্রম করছ। পরিশ্রম করলেই হয় না। একটা আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে দক্ষতার দরকার। তা না থাকলে পিতৃসত্য পালনের জন্য শেখরের যে অবস্থা হয়েছিল তোমারও সেই অবস্থা হবে। আমি শেখরের কাহিনি বলছি, শুনতে শুনতে হাঁটলে তোমার পথ চলার পরিশ্রম লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল—

শেখর ছিল বিদেহী দেশের উচ্চপদ অধিকারী এক কর্মচারীর ছেলে। তার বাবার নাম ছিল বৈশাখ। বৈশাখের যেমন একটি ছেলে ছিল তেমনই সেই দেশের রাজারও একটি ছেলে ছিল। ওই রাজকুমারের নাম ছিল বিজয়। বাল্যকাল থেকেই শেখরও বিজয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। একই শিক্ষকের কাছে ওরা লেখাপড়া করেছিল। ওরা এমনভাবে চলাফেরা করত যে দেখে মনে হত ওরা দুই ভাই। যদিও বিজয়ের ভবিষ্যতে রাজা হওয়ার কথা; তবু সে শেখরের সঙ্গে এমনভাবে মিশত যা দেখে মনে হত না যে, তার মধ্যে রাজা হওয়ার কোনো অহংকার আছে।

শেখরের বাবা বৈশাখ মৃত্যুশয্যায় ছেলেকে কাছে ডেকে গোপনে বলল, 'বাবা, তুমি যদি তোমার বাবার ঋণ শোধ করতে চাও তাহলে আমার একটা ইচ্ছা পূরণ করতে হবে। তুমি আমাকে কথা দাও, তুমি আমার সেই ইচ্ছা পূরণ করবে?'

'নিশ্চয় করব বাবা। বাবার ইচ্ছা যে ছেলে পূরণ করে না সে ছেলে ছেলেই নয়। এখন তুমি তোমার ইচ্ছা আমাকে জানাও।'

বৈশাখ বলল, 'তুমি বিদেহী রাজবংশকে নির্মূল করো।'

শেখর এই কথা শুনে হতবাক হয়ে গেল। বাবার ইচ্ছা পূরণ করতে হলে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এবং রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। এমনকী প্রয়োজন হলে নিজের বন্ধু বিজয়কেও মেরে ফেলতে হবে। অর্থাৎ বন্ধুর বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে হবে।

শেখর বাবার এই ইচ্ছার কথা শুনে ভীষণ অস্বস্তিবোধ করে বলল, 'বাবা, তোমার এই ধরনের ইচ্ছার নিশ্চয় কোনো কারণ আছে সেটা কি আমাকে জানাবে?'

বিদেহী দেশের রাজা আমারও রাজা হতে পারে, তবে আমাকে সে একবার ভীষণ অপমান করেছে। যখনই সুযোগ পেত তখনই রাজা আমার উপর অত্যাচার চালাত। তাই এই রাজবংশ নির্মূল হলে আমার আত্মার শান্তি হবে। যদি তুমি আমার ইচ্ছা পূরণ করতে চাও তাহলে তুমি আমার এই ইচ্ছে যে পূরণ করবে তার প্রতিশ্রুতি দাও। তুমি কথা না দিলে আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারব না।' বৈশাখ বলল।

তৎক্ষণাৎ শেখর বাপের ইচ্ছা পূরণ করার শপথ করল। বৈশাখ পরিতৃপ্তির হাসি নিয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

বৈশাখের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেখর রাজার অধীনে চাকরি পেল। ঠিক সেই সময় বিদেহী দেশের রাজসিংহাসনে বসল বিজয়। নিজের অধীনের কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও বিজয় কিন্তু শেখরকে আগে যেভাবে দেখত সেইভাবেই দেখতে লাগল। আগের মতোই শিকার অথবা কোথাও বেড়াতে গেলে শেখরকে সঙ্গে নিয়ে যেত।

রাজসিংহাসনে বসার পর বিজয়ের মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখা না দিলেও শেখর কিন্তু আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হতে লাগল। শেখর ভাবত, এই রাজবংশ নির্মূল করতে হলে শুধু বিজয়কেই মেরে ফেললেই হবে। বিজয়ের কোনো সন্তান নেই। এখনই কোনো সন্তান হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। এই কথা ভেবে সে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

একবার বিজয় শিকারে বেরোনোর সময় শেখরকে সঙ্গে নিল। শিকার করতে করতে এমন একটা সময় এল যখন ওদের দু-জনের কাছাকাছি রাজার কোনো প্রহরী ছিল না। বিজয়ের দেহরক্ষীও দূরে ছিল। হঠাৎ শেখর বিজয়কে আক্রমণ করার জন্য অস্ত্র তুলতেই রাজার প্রহরীরা কাছাকাছি এসে গেল। শেখরের অস্ত্র তোলা বিজয়ের নজরে না পড়লেও সে যাত্রায় শেখরের চেষ্টা ব্যর্থ হল।

আর একবার শেখর ও বিজয় পাহাড়ে উঠেছিল। সেখান থেকে চারদিকের দৃশ্য খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচের দিকে তাকালে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। পাহাড়টা অনেক উঁচুতে থাকায় সেখান থেকে নীচে পড়ে গেলে কারও বাঁচার উপায় ছিল না। বিজয় কথায় কথায় শেখরকে পাহাড়ের ধারে নিয়ে গেল। শেখর ভাবল, 'এখান থেকে আমি যদি বিজয়কে ঠেলে ফেলে দিই তাহলে তার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যাবে না।' শেখর এই কথা ভেবে বিজয়কে ঠেলে ফেলে দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে বিজয় পেছনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলো এখান থেকে নীচে যাওয়া যাক।'

গাড়িতে করে নামছিল ওরা। রাত পেরোনোর পরে ভোরে বিজয় বলল, 'বুঝলে শেখর, কাল রাত্রে আমি খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি।'

'কোন খারাপ স্বপ্ন দেখেছ?' শেখর প্রশ্ন করল।

'তুমি নাকি আমাকে ছোরা মারলে, আমার প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে আমি নাকি একদৃষ্টিতে তোমার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমাদের বন্ধুত্ব কত গভীর তা সত্ত্বেও এই ধরনের স্বপ্ন কেন দেখলাম তা বুঝতে পারলাম না।' বিজয় বলল।

এই কথা শুনে শেখরের মুখে কোনো কথা সরল না। তার মুখ ক্রমশ রক্তহীন হয়ে উঠছিল। সেটা লক্ষ করে বিজয় বলল, 'শোনো শেখর, তুমি বেশ কিছুদিন ধরে চেষ্টা করছ আমাকে মেরে ফেলার। প্রাণ খুলে বলতো আমি সত্যি কথা বলছি কি না? কিছু না-ঢেকে বলো।'

বন্ধুর কাছে মিথ্যে কথা বলতে শেখরের ঠোঁট কাঁপল। সে অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করে মৃত্যুশয্যায় তার বাবা যা বলেছিল তা অকপটে বিজয়কে বলে দিল।

তার কথা শুনে বিজয় বলল, 'তুমি শ্রীরামচন্দ্রের মতো পিতৃসত্য পালনের জন্য যদি প্রতিজ্ঞা করে থাকো তাহলে নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। ঠিক আছে, তুমি তোমার তরবারি দিয়ে আমাকে মেরে ফেলে তোমার প্রতিজ্ঞা তুমি রাখো।'

শেখর বন্ধুর কথা শুনে তরবারি বের করে বিজয়কে আক্রমণ করতে গেল। তৎক্ষণাৎ বিজয়ও খাপ থেকে তরবারি বের করে আক্রমণের মোকাবিলা করে বলল, 'দেখো শেখর, আমি যদি কিছু না করি, আর তুমি যদি আমাকে নিরস্ত্র অবস্থায় আক্রমণ করো, মেরে ফেলো, তাহলে তোমার পাপ হবে। নরকযন্ত্রণা ভোগ করবে। তার চেয়ে এসো আমরা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। এই যুদ্ধে যে মরে যাবে সেই বরণ করবে বীরের মৃত্যু। আর বীরের মৃত্যু বরণ করার অর্থ স্বর্গলাভ।'

তারপর ওরা দু-জনে যুদ্ধে লিপ্ত হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই শেখর মাটিতে পড়ে গেলে তার হাতের তরবারি ছিটকে পড়ে গেল দূরে। তখন বিজয় বলল, 'শেখর, তুমি পিতৃসত্য পালন করতে পারলে না। তবে বীরের মতো

যুদ্ধ করে তুমি স্বর্গে যেতে পারছ।' বলেই সে তৎক্ষণাৎ শেখরের মুণ্ড কেটে ফেলল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, বিজয়ের কি উচিত হয়েছে তার প্রাণের বন্ধুকে মেরে ফেলা? আর যাই হোক, শেখর তো নিছক হত্যাকারী হতে চায়নি? সে একটা আদর্শ স্থাপনের জন্য, শপথ রক্ষার্থে বিজয়কে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। শেখরকে বিজয় কারাগারে রাখতে পারত। একেবারে মেরে ফেলা বিজয়ের কি উচিত হয়েছে? তাহলে কি বিজয় শেখরকে গভীরভাবে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেনি? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'পিত্যসত্য পালনের জন্য শেখর বিজয়কে হত্যা করতে গিয়েছিল, কিন্তু বিজয় শেখরকে গোপনে হত্যা করার চেষ্টা করেনি। সে শেখরকে যুদ্ধে আহ্বান করে তাকে মেরে ফেলার সুযোগ দিয়েছিল। যুদ্ধে বিজয়কে পরাজিত করার মতো ক্ষমতা শেখরের ছিল না। শুধু পিতৃসত্য পালন করাই নয়— একটা মানুষকে অনেক কিছু পালন করতে হয়। রাজভক্তি, কৃতজ্ঞতা, বন্ধুর প্রতি কর্তব্যপালন প্রভৃতির কথাও তাকে মনে রাখতে হয়। যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার আগে উন্নত ধরনের কর্তব্যের কথাও মানুষকে ভাবতে হয়।

শেখরের বাবা নিশ্চয় এমন কিছু করেছিল যে জন্য রাজা তাকে অপমান করেছিলেন। বিজয় যখন স্বপ্নের কথা বলল তখন শেখর নিজের কথা জানিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিলে হয়তো ক্ষমা পেত। শেখর কোনো কথা না বলে একাই তরবারি বের করে বিজয়কে মেরে ফেলতে গেল। এতে তার নীচতাই প্রকাশ পেয়েছে।'

রাজার মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৩৭. রাক্ষসভীতি ও রাজনীতি

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য সেই গাছের কাছে ফিরে গিয়ে গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, অপ্রিয় কথা বলতে নেই, তবে তুমি যে পরিমাণ পরিশ্রম করছ এত পরিশ্রম করা বোধ হয় রাজার ধর্ম নয়। ঠিক তোমারই মতো রাজা নিরঙ্কুশ রাজধর্ম পরিত্যাগ করার মতো কাজ করেছিল। রাজার কখনোই এমন কাজ করা উচিত নয় যার সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। আমি ওই নিরঙ্কুশ রাজার কাহিনি বলছি। শুনতে শুনতে হাঁটলে পরিশ্রম লাঘব হবে।' বলে বেতাল এই কহিনি বলল—

কোনো এককালে নিকুঞ্জদেশের রাজা ছিল নিরঙ্কুশ। ওই দেশের প্রান্তে যে অরণ্য ছিল সেই অরণ্যে একটি রাক্ষসের দেখা পেল কোনো কোনো লোক। যারা দেখল তারা ছুটে এসে নিরঙ্কুশ রাজাকে জানাল। ভয়ে আর কেউ ওই অরণ্যে ঢুকল না।

রীতি অনুসারে কলিযুগে রাক্ষস থাকা স্বাভাবিক নয়। রাক্ষস থাকতে পারে না। তাই রাজা ওদের কথা বিশ্বাস করেনি। ওদের কাছ থেকে রাজা জানতে পারল যে রাক্ষসের তাড়া খেয়ে ওরা অরণ্য ছেড়ে পালিয়ে আসেনি। ওরা অরণ্য ছেড়ে পালিয়ে এসেছে ভয়ে। রাজা ওদের একজনকে প্রশ্ন করল, 'যাকে তুমি দেখেছ সে যে রাক্ষস এটা তুমি বুঝলে কী করে?'

ওই লোকটা বলল, 'মহারাজ, ওই লোকটা অনেক লম্বা আর খুব চওড়া।'

রাজা আবার ওদের প্রশ্ন করল, 'অনেক লম্বা এবং চওড়া লোককে রাক্ষস বলছ কেন?'

তখন ওরা বলল, 'মহারাজ, আমরা অত লম্বা এবং চওড়া লোককে এর আগে কোনোদিন দেখিনি। আমরা নিজেদের চোখে দেখেছি, একটা বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওই লোকটার ওপর। লোকটা ওই বাঘটার পেছনের পা
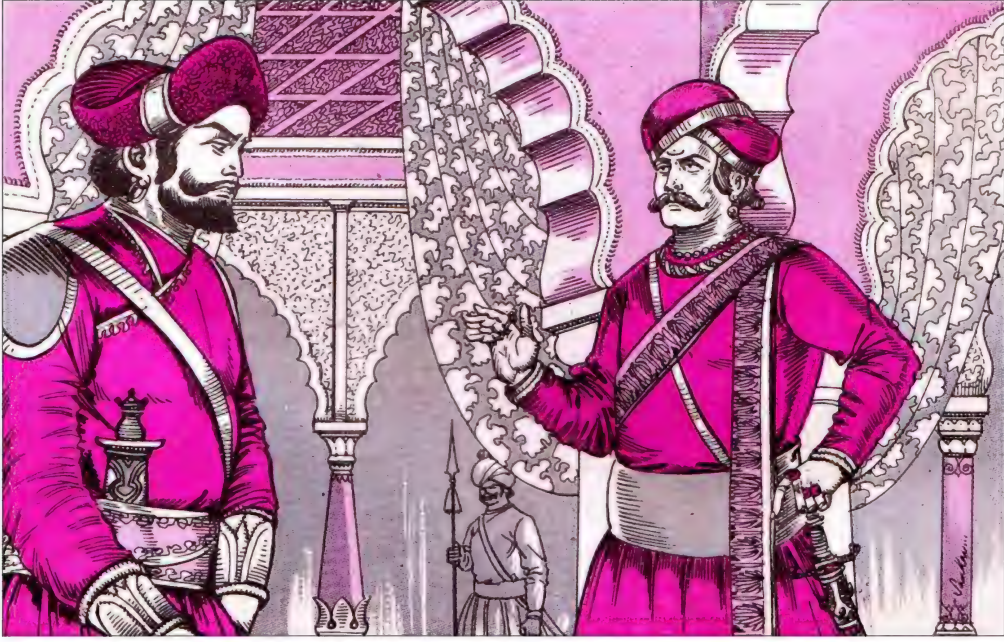
ধরে একটা গাছের গোড়ায় আছাড় মেরে বাঘটাকে মেরে ফেলল। রাক্ষস ছাড়া আর কে এইধরনের কাজ করতে পারে মহারাজ? ওর হাতে কোনো অস্ত্র নেই। যখন-তখন সে হরিণ থেকে বাঘ পর্যন্ত মেরে, পুড়িয়ে খেয়ে নেয়। এর পরেও কি ওকে রাক্ষস বলা যায় না মহারাজ?'

রাজা কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'তোমাদের কথা শুনলাম। এখন আমার কথা হল অকারণ ভয়ে তোমরা ছোটাছুটি করছ। ও যদি তোমাদের কোনো ক্ষতি করে তখন আমাকে বলবে। তোমাদের সাহায্যের জন্য আমার কাছে যা চাইবে তাই পাবে।'

রাজার কথা শুনে ওরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। কিন্তু রাজার ওই কথার জবাবে কেউ কোনো কথা বলার সাহস করল না। যে যার আস্তানায় ফিরে গেল।

ওদের চলে যাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে মন্ত্রী হাঁক পাঁক করে বলল, 'এ কী করলেন মহারাজ? আপনি কি ওই রাক্ষসটাকে ধরার বা মেরে ফেলার কথা ভাবছেন না?'

'না ভাবছি না। কেন, ভাবতে হবে?' রাজা বলল।

'যে একটা বাঘকে খালি হাতে মারে সে কি মানুষের ক্ষতি করবে না? এটা ভাবতে পারলেন কী করে?' মন্ত্রী বলল।

'অত্যন্ত হিংস্র জন্তুও বিনা কারণে কারও কোনো ক্ষতি করে না। সেক্ষেত্রে আমি মনে করি এই রাক্ষসও মানুষের ক্ষতি করবে না।' রাজা বলল।

'মহারাজ, আপনার যুক্তি আমার কাছে যুক্তিপূর্ণ মনে হচ্ছে না। যে রাক্ষস বাঘকে খালি হাতে মেরে ফেলতে পারে সে যে মানুষের কোনো ক্ষতি করবে না— এটা আমি ভাবতে পারি না। আপনি কি ভুলে গেছেন মহারাজ, রাক্ষস ও মানুষের মধ্যে সবসময় দ্বন্দ্ব লেগে থাকে। রাক্ষস কোনোদিন মানুষকে বরদাস্ত করেনি।' মন্ত্রী বলল।

রাজা বলল, 'এই যদি আপনি ভেবে থাকেন তাহলে অবিলম্বে ওই রাক্ষসকে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করুন।'

মন্ত্রী রাজার কথায় উৎসাহিত হয়ে সেনানায়ককে ডেকে বলল, 'তুমি অরণ্যে ঢুকে রাক্ষসকে মেরে সোজা ওই মৃতদেহ নিয়ে চলে আসবে।'

সেনানায়ক তৎক্ষণাৎ হাতির পিঠে চেপে রাক্ষসকে ধরার জন্য রওনা দিল। সঙ্গে নিল বাছাই করা কুড়ি জন সৈনিক। সৈনিকদের হাতে ছিল ভালো অস্ত্র। অরণ্যে ঢুকে কিছুক্ষণ খোঁজার পরেই ওরা রাক্ষসের আভাস পেল। বাঘের আর্তনাদ ওরা শুনতে পেল। যেদিক থেকে আর্তনাদ শোনা গেল সেদিকে ওরা এগিয়ে গেল। ওরা দেখতে পেল লম্বা-চওড়া একটি লোক একটা বাঘকে তুলে আছড়ে মেরে ফেলছে। ওদের চোখের সামনে বাঘ রক্তবমি করতে করতে মারা গেছে। বাঘ মারার পর রাক্ষসটা ওই সেনাপতি ও তার লোকজনের দিকে তাকাল। রাক্ষসকে দেখেই সৈনিকদের মনে খুব ভয় ঢুকেছিল। তারপর রাক্ষস যখন ওদের দিকে তাকাল তখন ওরা ভয়ে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। সেনাপতি একা রাক্ষসকে মোকাবিলা করার জন্যে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। রাক্ষসটা ছিল অনেক লম্বা আর ওই সৈনিকটা ছিল তার হাঁটুর কাছে। রাক্ষসটা বাঘটাকে মেরে ফেলে ওই সেনাপতির কাছে এসে বলল, 'কী ব্যাপার? কেন এসেছ এখানে?' রাক্ষসটা মানুষের ভাষায় এই প্রশ্ন করল।

তার কথা শুনে সেনাপতির মনে হল আর যাই হোক, এ তো রাক্ষস

নয়, এ তো সাধারণ মানুষ। একে মেরে ফেলা এমন কী শক্ত কাজ। সে বলল, 'আমি এখানে এসেছি তোমাকে মেরে ফেলতে রাজার নির্দেশে।'

'না, তুমি আমাকে মেরে ফেলতে আসনি। তুমি নিজেই মরে যেতে এসেছ।' বলে রাক্ষসটা সেনাপতির তরবারি কেড়ে নিয়ে পায়ের তলায় চেপে বলল, 'ফিরে যাও।'

ফিরে গিয়ে সেনাপতি মন্ত্রীকে সমস্ত ঘটনা বলল। মন্ত্রী রাজাকে জানিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মহারাজ এখন কী করি?'

রাজা বলল, 'আর আপনাকে কিছু করতে হবে না।' রাজা এমনভাবে বলল যেন মন্ত্রী আর কোনোদিন ওই রাক্ষসের প্রসঙ্গ না তোলে।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, রাক্ষসের ব্যাপারে রাজা নিরঙ্কুশ প্রথম থেকেই উদাসীন ছিল কেন? রাক্ষসের সঙ্গে পেরে উঠবে না— এই ভয়ে? রাক্ষস মানুষের শত্রু বলে? লোকের কথায় বিশ্বাস না হলেও নিজের সেনাপতির কথা তার বিশ্বাস করা উচিত ছিল। সব জেনে-শুনে এ-রকম শক্তিশালী শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো মানে হয়? রাজা এ-রকম করল কেন? জানা সত্ত্বেও আমার এই প্রশ্নের জবাব যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'রাক্ষসরাও মানুষের মতো একটি প্রাণী। বলা চলে একই জ্ঞাতিগোষ্ঠী। দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জাতি বাস করে। পুরাণকালে মানুষের ক্ষতি যেসব রাক্ষস করেছিল তাদের বিষ্ণু নাকি মানুষের রূপ ধরে মেরে ফেলেছিল। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া রাজার ধর্ম। যে রাক্ষস তাকে মেরে-ফেলতে-আসা-মানুষকে কোনো ক্ষতি না করে ছেড়ে দেয়, ফিরে যেতে বলে তাকে আর যাই হোক অপরাধী বলা চলে না। মন্ত্রীর কথায় রাজা পরীক্ষামূলকভাবে মন্ত্রীকে রাক্ষসটাকে ধরে আনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মন্ত্রী মৃত অথবা জ্যান্ত রাক্ষসের দেহ আনার জন্য সেনাপতিকে পাঠিয়েছিল। কার্যত মন্ত্রী যা করতে চেয়েছিল তা রাজনীতি বর্জিত কাজ। স্বয়ং রাজা তাকে অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু তারপর রাজা আর অনুমতি দেয়নি।'

রাজা বিক্রমাদিত্য এই কথা বলার জন্য মুখ খোলার সঙ্গেসঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৩৮. মনের কথা

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ওই গাছের কাছে ফিরে গেলেন। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, কোনো এক অদ্ভুত শক্তির অধিকারী হওয়ার জন্য তুমি হয়তো চেষ্টা করছ। তোমার এই নিষ্ঠাপূর্ণ প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য। তার কারণ মানুষকে সৎপথে রাখতে হলে সাম্য, দানদক্ষিণা, বিভেদসৃষ্টি প্রভৃতি নানা পন্থার চেয়ে অদ্ভুত শক্তির প্রয়োগ সবচেয়ে বেশি কার্যকরী! আমার বক্তব্যের স্বপক্ষে আমি ভীম নামক একজনের অদ্ভুত শক্তি অর্জনের কাহিনি বলব। আমার এই কাহিনি শুনতে শুনতে পথ চললে পথ চলার পরিশ্রম লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল—

এক চাষির নাম ছিল ভীম। বাপের মৃত্যুর পর নিজে চাষ-আবাদের কাজে নামল। নিজেই লাঙল চালাত, বীজ বুনত। হঠাৎ একদিন লাঙলের ফলায় কী যেন ঠেকল। ভীমের কৌতূহল জাগল। সে কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে জিনিসটাকে বের করার চেষ্টা করল। প্রথমে কোদালে ঠেকল একটা পাথর। তারপর সে পেল একটা কলসি। কলসির নীচে একটি বিচিত্র ধরনের হার এবং একটি তালপাতার পুঁথি।

ভীম লাঙল চালানো বন্ধ করে ওই গর্ত থেকে হার এবং পুঁথি নিয়ে বাড়ি ফিরল। পুঁথি পড়ে জানতে পারল ওই হারের বিষয়ে অনেক কিছু।

ওই হার গলায় দিয়ে যার সামনে দাঁড়াবে তার মনের কথা জানা যাবে। অনেক বছর আগে দয়ানিধি নামে একজন যোগীর কাছ থেকে ওই হার সংগ্রহ করতে পেরেছিল। ওই যোগীর কাছ থেকে দয়ানিধি ওই হারের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারল। দয়ানিধি ওই হার গলায় দিয়ে বহু বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে দেখা করেছিল। ওদের মনের কথা জানতে পেরে ওদের শাসিয়ে বলেছিল, 'তুমি এইসব কথা ভাবছ! আমি সবাইকে তোমার এই মনের কথাগুলো জানিয়ে

দেব।' ওইসব বড়লোক দয়ানিধির কথা শুনে ভয় পেয়ে তাকে কিছু টাকা দিয়ে বিদায় করত। দিনের পর দিন একইভাবে অর্থ রোজগার করে সেটাতেই তার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। সেই হার গলায় দিয়ে একদিন সে আবিষ্কার করল তার স্ত্রী তাকে ভালোবাসে না। রাগে, অভিমানে, ক্ষোভে সে স্ত্রীকে হত্যা করল। তারপর কিছুদিন পরে তার জীবনে পরিবর্তন এল। জীবনের প্রতি তার ঘৃণা এবং বিরক্তি জাগল। ওই হার গলায় পরে কার মনের কথা জানতে পেরেছে এবং জানতে পেরে সে কী করেছে ইত্যাদি বিষয়ে ওই তালপাতার পুঁথিতে লিখে মাটিতে পুঁতে দিল।

এইসব কথা তালপাতায় লেখা ছিল। পড়ে ভীমের প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। হার সম্পর্কে কিছুক্ষণ ভেবে সে আপন মনে বলল, 'আচ্ছা! এই হার গলায় দিয়ে আমি তো এমন কিছু করতে পারি যাতে দেশের মানুষের উপকার হয়।' যাই হোক, হারের আদৌ কোনো ক্ষমতা আছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য ভীম গলায় ওই হার পরে কৃষ্ণের বাড়িতে গেল। কৃষ্ণ ভীমের কাছে কিছু পেত। সেটা ফেরত দেওয়ার জন্য ভীম তার বাড়িতে গেল।

কৃষ্ণ ছিল জমিদার রতনলালের ছোটো ভাই। ভীম যখন কৃষ্ণের কাছে গেল তখন কৃষ্ণ ভাবছিল কী করে তার দাদাকে হত্যা করবে। ব্যাপারটা জানতে পেরে ভীম কৃষ্ণকে বলল, 'কৃষ্ণ, যদি তুমি কিছু মনে না করো তাহলে একটা কথা বলছি। তোমার দাদা ধর্মাত্মা লোক, তাকে মেরে ফেলার পাপচিন্তা করছ কেন? তুমি তোমার এই চিন্তা ত্যাগ করো।'

কৃষ্ণ মুহূর্তকাল নীরব রইল। তার মুখ ক্রমশ সাদা হয়ে যাচ্ছিল। অনেক কষ্টে মুখে হাসি এনে ভীমকে বলল, 'কী যে বলছ ভীম, আমি কোন দুঃখে দাদাকে মেরে ফেলতে যাব। এসব আজেবাজে কথা তোমাকে কে বলেছে?'

'যেই বলুক, তুমি কিন্তু পাপচিন্তা ত্যাগ করো। আর এই নাও তোমার পাওনা টাকা।' বলে ভীম কৃষ্ণের প্রাপ্য টাকা তাকে ফেরত দিল।

ফেরার পূর্ব মুহূর্তে ভীমের মনে হল, কৃষ্ণ তার পেছনে দুটো লোক পাঠিয়ে তাকে মেরে ফেলার চিন্তা করছে। এটা জানার পর ভীম আঁকাবাঁকা পথে অন্ধকারে ছুটে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল।

কৃষ্ণ যাদের পাঠিয়েছিল ভীমকে হত্যা করতে তারা কিছুদূর গিয়ে তাকে আর খুঁজে না পেয়ে ভাবল, ভীম তাহলে সোজাপথে যায়নি। অগত্যা ওরাও আঁকাবাঁকা পথে, পা চালিয়ে হেঁটে ভীমকে ধরার চেষ্টা করল।

ভীম অন্ধকারে লুকিয়ে ওই দু-জনকে সুযোগ বুঝে এক এক করে দু-জনকেই মেরে গাছে বেঁধে জমিদারের কাছে খবর পাঠাল!

কৃষ্ণের ওই লোক দুটো জমিদারের মার সহ্য করতে না পেরে কেন যে ওরা ভীমকে অনুসরণ করছিল তা জানাল। তারপর থেকে কৃষ্ণের সঙ্গে রতনলালের সম্পর্ক ছিন্ন হল। ভীম এভাবে উপকার করায় রতনলাল ভীমকে পুরস্কৃত করল।

তারপর থেকে ভীম ওই হার দিয়ে বহু লোকের প্রাণ বাঁচাল। সে ওই হার গলায় দিয়ে একদিন বিজয়লক্ষ্মীর সামনে দাঁড়িয়েছিল। ভীম জানতে পারল যে সে তাকে ভালোবাসে। তারপর বিজয়লক্ষ্মীর বাবার সঙ্গে দেখা করে নিজের ইচ্ছে প্রকাশ করল। পরে ওদের বিয়ে হল।

কিছু কিছু ঘটনা লক্ষ করে গ্রামের লোক বুঝতে পারল ভীম অনেকের মনের কথা জানতে পারে। ওই হার পরে ভীম যখন চোরদের সামনে দাঁড়াত সে তাদের মনের কথা বুঝতে পারত। কবে, কোথায় ওরা চুরি করবে তা সে জানতে পারত। জানতে পেরে রাজ-প্রহরীদের জানিয়ে দিত। ফলে চোরগুলো ধরা পড়ত।

আরও কিছুদিন পরে এমন অবস্থা হল যে ভীমের সামনে দাঁড়াতে লোক ভয় পেত। দেখতে দেখতে লোকে খারাপ চিন্তা করা কমিয়ে ফেলল। তাদের মনে সবসময় একটা ভয় থাকত এই বুঝি ভীম এসে মনের সব কথা জেনে গেল। কারও কারও ইচ্ছে করছিল ভীমকে মেরে ফেলবে। কিন্তু ওই চিন্তা নিয়ে ভীমের সামনে গেলেই তো সে টের পাবে— সেই ভয়ে কেউ তার সামনে যেত না।

ভীমের ওই অসীম ক্ষমতার মূলে যে ওই হার ছিল তা কেউ জানত না। আরও কিছুদিনের মধ্যে ভীমের এই অসীম ক্ষমতার কথা আরও বহুলোক জানতে পারে। কেউ কেউ ভীমকে জিজ্ঞাসা করে তাদের সম্পর্কে কে কী ভাবছে। একজন সম্পর্কে আর একজন কী ভাবছে সেটা জানতে পারত ভীমের মাধ্যমে।

এভাবে কিছু লোকের কথামতো চলার পর ভীম বুঝতে পারল সে যা করছে তাতে বিপদের আশঙ্কা আছে। কারণ, অভিজাত পরিবারের লোক একে অন্যকে শত্রু ভাবে,

একজন অন্যজনকে মেরে ফেলার চক্রান্ত করে, একের কথা অন্যকে জানালে শেষ পর্যন্ত তাতে যে কার লাভ হবে সেটা ভীম বুঝে উঠতে পারল না। এইভাবে কিছুকাল চলার পর ভীম আর একের কথা অন্যকে জানাত না। ওকে যারা অন্যের কথা জেনে বলার জন্য টাকা দিয়ে নিয়ে যেত তাদের সে এলোমেলো কথা বলে যেত।

গ্রামের সাধারণ মানুষ থেকে ভীমের বিষয়ে জানতে পারল মোড়ল, মোড়লের কাছ থেকে কোতোয়াল, সেনাপতি, মন্ত্রী এবং পরিশেষে রাজা। রাজার কানে ভীমের এই অসীম ক্ষমতার কথা যেতেই সে ভীমকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'বলতো ভীম, আমি এখন কি ভাবছি?'

'মহারাজ! আপনি এখন ভাবছেন যে আমি এখন আপনার মনের কথা বলতে পারব কি না?' ভীম সগর্বে বলল। রাজা অনুধাবন করল ভীমের সত্যি সত্যিই একটা ক্ষমতা আছে।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে রাজা আবার ভীমকে ডেকে পাঠিয়ে বলল, 'বলতো, আজকে আমি কেন তোমাকে ডেকেছি?'

ভীম বলল, 'রানির বিষয়ে আপনি আমার কাছে বিশেষ কিছু জানতে চান।'

'তুমি এক কাজ কর, তুমি এই চিঠি রানিকে দিয়ে, চিঠির জবাবে উনি কী বলেন সেটা শুনে আর ঠিক সেইসময় ওনার মনের কথা কি ছিল তা জেনে আমাকে গোপনে জানিয়ে দাও।' রাজা বলল।

ভীম রাজার চিঠি রানিকে দিল; চিঠি পড়ে রানি বলল, 'ঠিক আছে।'

ওই চিঠিতে লেখা ছিল: 'আজ সন্ধের সময় গানের ব্যবস্থা করব।'

ভীম রানির মনের কথা বুঝতে পারল। রাজার প্রতি রানির একটুও ভালোবাসা ছিল না। রানির ভালোবাসার পাত্র ছিল অন্য।

ভীম রাজার কাছে এসে বলল, 'মহারাজ, রানি পতিব্রতা নারী।'

রাজা খুশি হয়ে গলার হার ভীমকে দিল।

সেদিন রাত্রে ভীম নিজের হার উনুনে আগুনে ফেলে দিল; কিছুক্ষণের মধ্যেই পুড়ে গেল।

ভীম সেই রাত্রেই ধনীদের দেওয়া ধনসম্পত্তি নিয়ে অন্য দেশে রওনা দিল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, অমন অদ্ভুত শক্তি সম্পন্ন হার ভীম কি করে উনুনে ফেলে দিতে পারল? আর যাই হোক হারটা তো ভীমের এবং অন্যের অনেক উপকার করেছিল। হারের রহস্য সে ছাড়া অন্য কেউ তো জানত না। গলায় ওই হার ধারণ করলে ভীমের এমন কি অসুবিধা হত? কেন সে পুড়িয়ে দিল রাজা? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'যেকোনো শক্তিকে ধনীরা নিজেদের ইচ্ছাপূরণের জন্য ব্যবহার করতে পারে। যারা দুর্বল তারা যদি ওই অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন হারের ভয়ে মিথ্যা কথা বলাও বন্ধ করে তা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত হারের ক্ষমতা ধনীদের মর্জির গোলাম হতে বাধ্য। সে যা করতে চেয়েছিল তা তার পক্ষে সম্ভব হল না। ভীম সোজা সরল মানুষ। ওই হারের ফলে ভীম আবিষ্কার করল তার জীবনের সারল্য চলে যাচ্ছে। তাই সে ওই হারটাকে আগুনে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল!'

রাজার মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৩৯. পদের লোভ নেই

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, সাধারণভাবে মানুষ ভাবে জগতে তার শক্তি যতটা থাকা উচিত ততটা নেই। আবার লক্ষ করা যায় কোনো চাকর তার প্রভুর কাছে কাজের জন্য প্রশংসা পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়। কিন্তু দয়ানিধির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষ করেছি। রাজা তার কাজে খুশি হয়ে তাকে উন্নত পদ দিলে সে কুণ্ঠাবোধ করে। এহেন লোককে কী বলা যায়? যদি মন দিয়ে শোনো তাহলে আমি তোমাকে এই দয়ানিধির কাহিনি বলব। এই কাহিনি শুনতে শুনতে পথ চললে তোমার পথ চলার পরিশ্রম লাঘব হবে।' বলে বেতাল দয়ানিধির কাহিনি শুরু করল—

কলিঙ্গদেশের রাজা ছিল মার্তণ্ড। এই রাজার অধীনে যে সেনাবাহিনী ছিল তাতে দয়ানিধি কত বড়ো ছিল তা প্রমাণ করার একটাও সুযোগ না এলেও যুদ্ধের বিভিন্ন পর্বে কখন কোথায় কোন কৌশল অবলম্বন করতে হয় তা দয়ানিধির খুব ভালোভাবে জানা ছিল এবং সে তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করত।

একদিন রাজা সদলবলে শিকারে বেরোল। রাজপ্রাসাদ দেখাশোনার এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দয়ানিধিকে দিয়ে গেল। প্রতিবেশী রাজার নজর ছিল কলিঙ্গদেশের উপর। রাজার সঙ্গে বড়ো বড়ো যোদ্ধা, সেনাপতি এবং বিরাট বাহিনীও গেছে শুনে প্রতিবেশী রাজা বীরবর্মা হঠাৎ এসে রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। এই ধরনের আক্রমণের পূর্বপ্রস্তুতি কিছু না থাকলেও শত্রুর আক্রমণের সঙ্গেসঙ্গে দয়ানিধি যে কজন সৈনিককে কাছে পেল তাদের দেয়ালের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে শত্রুর উপর পাথর, তির, আগুন নিক্ষেপ করার আদেশ দিল। এত ধরনের আক্রমণ যে হবে তা অনুমান করতে না পেরে শত্রুপক্ষের সৈনিকরা
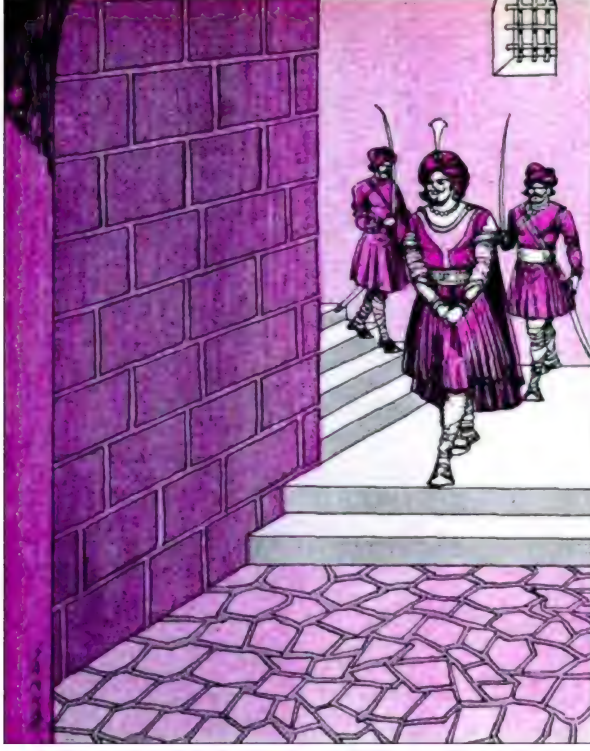
হকচকিয়ে গেল। ওরা বিভ্রান্ত হয়ে কেউ নিহত হল কেউ পালিয়ে গেল। অবশেষে বাধ্য হয়ে বীরবর্মা নিজের, যে কজন সৈন্য তখনও বেঁচে ছিল তাদের নিয়ে ফিরে গেল। এদিকে দয়ানিধি মৃত সৈনিকদের মাটিতে পুঁতে আহত সৈনিকদের প্রাসাদের ভেতরে চিকিৎসার ব্যবস্থা করল।

রাজা মার্তণ্ড শিকার থেকে ফিরে এসে সমস্ত খবর শুনে দয়ানিধিকে খুব প্রশংসা করল। রাজা মার্তণ্ড লক্ষ করল দয়ানিধি নিজেদের বাহিনীর আহত সৈনিকদের সঙ্গে শত্রুপক্ষের বাহিনীর আহত সৈনিকদেরও ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। নিজের দেশের নিহত সৈনিকদের পাশাপাশি শত্রুপক্ষের নিহত সৈনিকদেরও সমাধিস্থ করেছে। এটা রাজার ভালো লাগল না। রাজা শত্রুপক্ষের আহত সৈনিকদের মৃত্যুদণ্ড দিল।

তারপর মার্তণ্ড সেনাবাহিনীকে যুদ্ধ সাজে সাজিয়ে প্রতিবেশী শত্রুরাজা বীরবর্মাকে আক্রমণ করতে রওনা হল।

এই ধরনের একটা কিছু যে ঘটবে সে বিষয়ে বীরবর্মার একটা আশঙ্কা ছিল। সে অন্যান্য রাজাদের সাহায্য নিয়ে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিল। ফলে রাজা মার্তণ্ডের আক্রমণের মোকাবিলা করতে তার কষ্ট হয়নি। অল্প সময়ের মধ্যে মার্তণ্ডের সেনাবাহিনী পর্যুদস্ত হল। রাজা মার্তণ্ড বীরবর্মার হাতে বন্দি হল। মার্তণ্ডের সেনাবাহিনী লোককে বীরবর্মার দাস বানিয়ে নিল। পরিশেষে বীরবর্মা কলিঙ্গ দেশের রাজা হল।

দয়ানিধি নিজেকে শেষ মুহূর্তে কোনোরকমে বাঁচিয়ে কলিঙ্গ নগরে গা-ঢাকা দিয়ে সাধারণ নাগরিকের জীবনযাপন করছিল।

বীরবর্মা কলিঙ্গদেশ জয় করে প্রজাদের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করতে লাগল। শত্রুর উপর যেভাবে আক্রমণ করে, কলিঙ্গদেশের প্রজাদের উপর

বীরবর্মার সৈনিকরা সেইভাবে আক্রমণ করত। ওরা এত অমানুষিক অত্যাচার করত যে দেখে দয়ানিধির অসহ্য লাগল। তখন দয়ানিধি কিছু যুবকদের নিয়ে একটা দল গঠন করে গোপনে এবং পরিকল্পিতভাবে রাজা বীরবর্মা ও তার মুখ্য কর্মচারীদের বন্দি করে রাজা মার্তণ্ডকে মুক্ত করল।

রাজা মার্তণ্ডের মুক্ত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গেসঙ্গে গোটা কলিঙ্গ দেশের প্রজাদের মধ্যে যথেষ্ট উদ্দীপনা দেখা দিল এবং তারা বীরবর্মার সৈনিকদের কুকুর-বিড়ালের মতো তাড়া করে মারতে লাগল।

রাজা সিংহাসনে বসেই বীরবর্মাকে মৃত্যুদণ্ড দিল। তার অধীনস্থ কর্মচারীদেরও চরম শাস্তি দেওয়ার পর রাজা মার্তণ্ড দয়ানিধির কার্যাবলীর প্রশংসা করে তাকে সর্বাধিনায়ক করা হবে বলে ঘোষণা করল।

সেইদিন রাত্রে দয়ানিধি বলল, 'মহারাজ, আপনি আমাকে আপনার সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদ দেবার কথা ঘোষণা করেছেন। এই পদ গ্রহণ করার ক্ষমতা আমার নেই।' দয়ানিধি সবিনয়ে নিবেদন করল।

রাজা মার্তণ্ড তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দয়ানিধির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, কাল সকালের আগে তুমি দেশ ছেড়ে চলে যাবে।'

'ঠিক আছে মহারাজ, আমি চলে যাচ্ছি।' বলে দয়ানিধি চলে গেল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, দয়ানিধি অত বড়ো পদ পেয়েও ত্যাগ করল কেন? দয়ানিধি কী দোষ করল যে রাজা তাকে দেশ ছেড়ে যেতে বলল? যে দয়ানিধি বীরবর্মার আক্রমণ থেকে রাজপ্রাসাদ রক্ষা করল, মার্তণ্ডকে সিংহাসনে বসাল তাকে কোন বিবেচনায় রাজা দেশ থেকে বের করে দিল? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এই প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'রাজা মার্তণ্ডের ধারণা ছিল, দয়ানিধির রাজভক্তি গভীর। এই কথা ভেবে রাজা মার্তণ্ড তাকে সর্বাধিনায়কের পদ দিতে চাইলেন। কিন্তু দয়ানিধি ওই পদ নিতে না চাইলে রাজা মার্তণ্ড বুঝলেন যে দয়ানিধির মনে রাজভক্তির চেয়ে দেশভক্তি বেশি আছে। দয়ানিধি মানবতাবাদী। সেইজন্যেই সে শত্রুপক্ষের আহত সৈনিকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিল। বীরবর্মা প্রজাদের অত্যাচার করেছিল বলেই দয়ানিধি তাকে সরিয়ে দিল। পরে মার্তণ্ড প্রজাদের উপর অত্যাচার চালালে দয়ানিধি তাকেও সরিয়ে দিতে পারে। এই ভয়ে দয়ানিধিকে রাজা বহিষ্কার করে দিলেন।'

রাজার মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৪০. স্নেহ বড়ো অন্ধ

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, আমার ধারণা, যেকোনো রাজা রাজনীতিকেই অগ্রাধিকার দেয়। প্রথমে রাজনীতি পরে অন্য নীতি। কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে, এটা লক্ষ করা গেছে স্নেহ প্রীতি ভালোবাসা রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। রবিবর্মার কাহিনি শুনলে আমার কথা পরিষ্কার বোঝা যাবে। এই কাহিনি শুনতে শুনতে চললে পথচলার পরিশ্রমও লাঘব হবে।' বলে বেতাল এই কাহিনি শুরু করল—

রবিবর্মা ছিল খুব শক্তিশালী রাজা। বিজয়শেখর নামে এক রাজাকে সহজেই সে যুদ্ধে হারিয়ে দিল। তারপর সে সিংহাসনে বসল। বিজয়শেখর শেষমুহূর্ত পর্যন্ত রবিবর্মার বিরুদ্ধে বীরের মতো যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করল। তার মৃত্যুর বিবরণ শুনে তার স্ত্রী বুক চাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে মরে গেল। বিজয়শেখরের একটি ছেলে ছিল। রবিবর্মার কোনো ছেলে ছিল না। সে বিজয়শেখরের ছেলেকে নিজের ছেলের মতো যত্নে লালনপালন করতে লাগল। সেই ছেলের নাম রাখল বিজয়বর্মা। বিজয়শেখরের ছেলে বিজয়বর্মাকে রবিবর্মা আদরযত্নে লালনপালন করে বড়ো করতে লাগল।

রবিবর্মার ছিল একটি মেয়ে। মেয়েটি যথাসময়ে বড়ো হল। ওই মেয়ের পাত্র নির্বাচন উপলক্ষ্যে স্বয়ম্বর সভা ডাকা হল। ঘোষণা করা হল যার সঙ্গে বিয়ে হবে তাকে অর্ধেক রাজত্বও দেওয়া হবে।

এই ঘোষণা শুনে বিজয়বর্মার মনে কোনোরকম প্রতিক্রিয়া হল না। তবে নতুন সেনাপতি হয়ে যে লোকটা তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছিল সেই ভূপতির দুঃখ হল। সে বিজয়বর্মার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলল। তারপর বিজয়বর্মার হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে রবিবর্মার বিরুদ্ধে নানা কথা তার কানে ঢালতে লাগল। এই কথার বেশিরভাগই বানানো এবং কষ্টকল্পিত।

একবার বিজয়বর্মাকে ভূপতি বলল, 'যে যাই বলুক, আমরা তো জানি, তুমি রবিবর্মার পোষ্যপুত্রের মতো। এই যদি তোমার বাবা হত তাহলে তোমার প্রাপ্য রাজত্ব থেকে অর্ধেকটা জামাইকে দিয়ে দিত না। আর এক্ষেত্রে সত্যি কথা বলতে কী, এটা তো তোমার বাবার সিংহাসন। তোমার বাবার সিংহাসনে বসে রবিবর্মা নিজের জামাইকে অর্ধেক রাজত্ব দিতে চাইছে। এ হল পরের ধনে পোদ্দারি। ন্যায়বিচারের দিক থেকে এই দেশ তো তোমাদের। রবিবর্মার কি উচিত ছিল না এই জমির প্রতিটি কণা তোমার হাতে তুলে দেওয়া? এখন তুমি যদি কিছু করতে চাও তাহলে আমি সবদিক থেকে তোমাকে সাহায্য করতে পারি।'

বিজয়বর্মা কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু রবিবর্মার বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে একটা দল তো গঠন করতে হবে। দল গঠন করতে গেলে বিপদের আশঙ্কা আছে। যেকোনো সময় উনি গুপ্তচরদের মাধ্যমে জানতে পারবেন। যদি একবার সব জেনে যান তাহলে তোমাকে এবং আমাকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দেবেন। তাই নয় কি!'

ভূপতি হেসে বলল, 'তোমার কোনো ভয় নেই। যে মুহূর্তে টের পাব, রবিবর্মা আমাদের গোপন ব্যাপার জেনে গেছে সেই মুহূর্তে আমরা গোপন পথে পাশের দেশে চলে যেতে পারব। পাশের দেশের রাজা নরসিংহ ভালো রাজা। ওনার কাছে আমরা সবরকমের সাহায্য পেতে পারি। তার সাহায্য নিয়ে আমরা অতর্কিতে আক্রমণ করে অতি সহজেই রাজধানী দখল করতে পারব। তুমি জানো না, গোপন পথ কোত্থেকে কোথায় গেছে?'
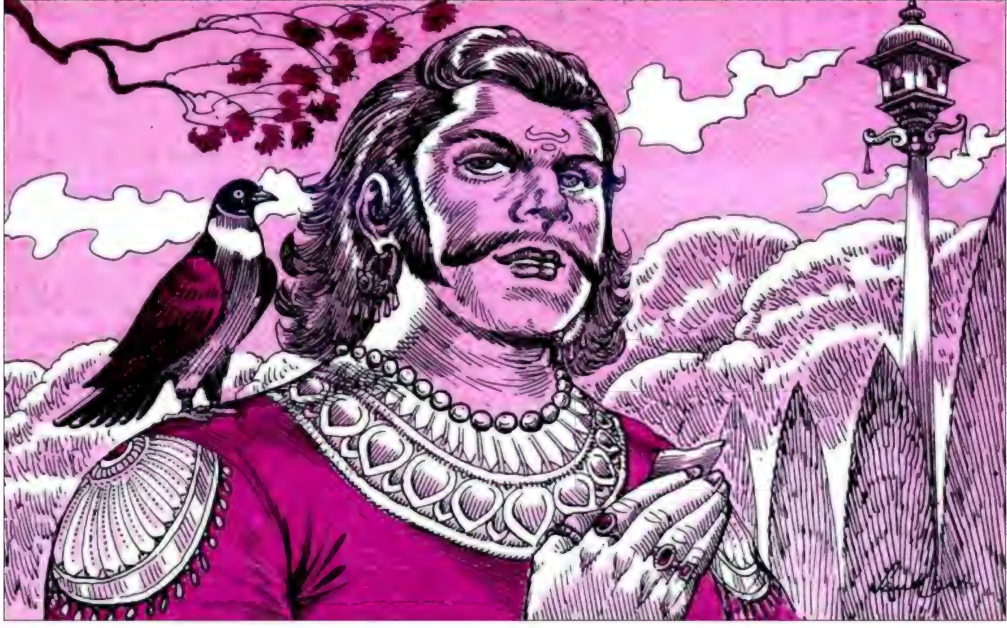
সেদিন সন্ধ্যার সময় রবিবর্মা উদ্যানে পায়চারি করছিল। এমন সময় তার পোষা একটি পায়রা, মুখে একটি চিঠি নিয়ে তার কাঁধে বসল। সেই চিঠিতে লেখা ছিল: 'আজ রাত্রে রবিবর্মার জীবন বিপন্ন হতে পারে। সেনাপতি ভূপতির সাহায্যে বিজয়বর্মা আপনার রাজত্ব কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত করছে।'

রবিবর্মা তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে ঢুকে প্রহরীদের ডেকে পাঠাল। সবাইকে পরীক্ষা করে রবিবর্মাকে হত্যা করার জন্য যে প্রহরীকে ঠিক করা হয়েছিল তাকে ধরা হল।

সেদিন রাত্রে রবিবর্মা খোঁজ নিয়ে জানতে পারল, ভূপতি বিজয়বর্মার সঙ্গে আছে। কিন্তু রাজভবনের ভেতরে ওরা যে ঘটনা ঘটাবে ভেবেছিল তা ঘটাতে পারল না। ওরা যে গোপন পথে অন্য কোথাও চলে গেছে তারও কিছু কিছু চিহ্ন দেখা গেল। রাজভবনের অন্তঃপুর থেকে যে সুড়ঙ্গপথ শুরু হয়েছে সেটা শেষ হয়েছে অনেকদূরের বনের একটি দেবালয়ের মূর্তির পেছনে। ওই দেবালয়ের চারদিকে গোপনে কিছু সৈনিককে নিয়োগ করা হল। ওরা রাতদিন সেখানে পাহারা দেয়।

সেই গোপন পথ দিয়ে বিজয়বর্মা ও ভূপতি রাজা নরসিংহের কাছে গেল। ভূপতি রাজা নরসিংহকে গোপনে বলল, 'আপনি অবিলম্বে বিজয়বর্মাকে বন্দি করুন। চলুন বিজয়বর্মার সিংহাসন দখল করতে।'

তারপর ভূপতি রাজা নরসিংহ এবং তার পঞ্চাশ জন বীর সৈনিককে নিয়ে সুড়ঙ্গপথে রাজা রবিবর্মাকে সিংহাসন থেকে সরানোর উদ্দেশ্যে রওনা হল।

এদিকে রবিবর্মা জানতে পারল যে এখন যারা আসছে তাদের মধ্যে

বিজয়বর্মা নেই। সে নির্দেশ দিল সুড়ঙ্গপথ দু-দিক থেকে বন্ধ করে দেওয়ার। ওরা সুড়ঙ্গের ভেতরে আটকে পড়ল। রবিবর্মা সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজা নরসিংহের সিংহাসন দখল করল।

বিজয়বর্মাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে তাকেই সেই দেশের রাজা করে ফেলল।

এদিকে একহপ্তা একফোঁটা জলও খেতে না পেয়ে রাজা নরসিংহ-সহ প্রত্যেকে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। রবিবর্মা নরসিংহ ও ভূপতিকে মৃত্যুদণ্ড দিল। সৈনিকদের ফেরত পাঠিয়ে দিল।

যথাসময়ে রবিবর্মার মেয়ের বিয়ে হল। অর্ধেক রাজত্ব জামাই পেল। বাকি অর্ধেক রবিবর্মা বিজয়বর্মার রাজত্বের সঙ্গে জুড়ে দিল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'মহারাজ, চক্রান্তকারীদের মধ্যে প্রধান যে দু-জন, ভূপতি এবং বিজয়বর্মা, তাদের মধ্যে, রাজা রবিবর্মা ভূপতিকে মৃত্যুদণ্ড দিল আর বিজয়বর্মাকে রাজা করে ফেলল। এতে রাজনীতির চেয়ে বিজয়বর্মার প্রতি স্নেহ কি বেশি প্রকাশ পাচ্ছে না? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এই প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'ভূপতি যে চক্রান্ত করেছিল সেটা নষ্ট করার মূলে ছিল বিজয়বর্মা। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে পায়রার মাধ্যমে চিঠি পাঠিয়েছিল বিজয়বর্মা নিজে। এই ঘটনা রবিবর্মা ভালোভাবে অনুধাবন করেছেন। ভূপতি এবং বিজয়বর্মার মধ্যে যে বিরোধ ছিল তার পরিণতি ঘটেছে বিজয়বর্মাকে কারাগারে নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে। এই ঘটনাতেই প্রকাশ পায় যে ভূপতি বুঝতে পেরেছিল বিজয়বর্মা বিশ্বাসঘাতকতা করছে অথবা ভবিষ্যতে সিংহাসনে বসার জন্য করবে।'

রাজার এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৪১. ভাই ভাইকে মারল

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে গিয়ে, গাছ থেকে শব নামিয়ে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে এগোতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, জীবনের সঙ্গে স্বার্থের সম্পর্ক খুব বেশি। প্রত্যেক মানুষ বিশেষ অবস্থায় স্বার্থের কারণে প্রভাবিত হয়। স্বার্থান্ধ হয়ে অনেক সময় অনেক পাপ করা হয়। চরম স্বার্থের মূলে থাকে, হয় দেশ অথবা রমণী। সিংহাসনে বসার আশায় অথবা রমণীকে পাওয়ার লোভে মানুষ চরম স্বার্থান্বেষী হয়ে ওঠে। এর নিদর্শনস্বরূপ আমি চন্দ্রসেনের বিষয়ে বলছি। এই কাহিনি শুনতে শুনতে পথ চললে পথ চলার পরিশ্রম লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল—

অমরাবতীর রাজা ছিল অমরসেন। যুবক অবস্থাতেই সে রাজা হয়। কালিকোটা এবং অমরাবতীর মধ্যে বহুকাল থেকে শত্রুতা ছিল। অমরসেনের বাপের আমলে কালিকোটার রাজার চোখের বিষ ছিল অমরাবতী। সবসময় সে অমরাবতীর ওপর আক্রমণ চালানোর কথা ভাবত। অমরসেন যখন অল্প বয়সে সিংহাসনে বসল তখন কালিকোটার রাজা ভাবল, 'এই হল সুবর্ণ সুযোগ। অমরসেনের বয়স কম, অভিজ্ঞতা কম, এই সময় ওর দেশ যদি আক্রমণ করি তাহলে সহজেই অমরাবতী দখল করতে পারব।' রাজা যা ভাবল কার্যত তার বিপরীত ঘটনা ঘটল। অমরসেনের হাতে তাকে চরম পরাজয় বরণ করতে হল।

কিছুকাল পরে কালিকোটার রাজা তার মেয়ের বিয়ের জন্য স্বয়ম্বর সভা ডাকল। তার মেয়ের নাম মনিমালা। সে ছিল সুন্দরী। স্বয়ম্বর সভায় কালিকোটার রাজা সব দেশের রাজা এবং যুবরাজদের আহ্বান করল। খবর পাঠাল না শুধু অমরাবতীর অমরসেনের কাছে। এই ঘটনায় অমরসেন অত্যন্ত দুঃখ পেল এবং অত্যন্ত অপমান বোধ করল। কালিকোটা দেশের

রাজা তাকে যেভাবে অপমান করেছে তার প্রতিশোধ কীভাবে নেওয়া যায় সে সম্বন্ধে মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করল।

মন্ত্রী বলল, 'কালিকোটার রাজা আমাদের শত্রু। শত্রুর কাছ থেকে আমন্ত্রণ না পাওয়ায় দুঃখ করার কিছু নেই। উনি যদি আমন্ত্রণ পাঠাতেন তাহলেও আমাদের সেই সভায় অংশগ্রহণ করা উচিত হত না। কারণ শত্রু ভালো কথায় কাছে ডেকে প্রাণনাশ করতে পারে।'

মন্ত্রীর কথা অমরসেনের মনে ধরল না। স্বয়ম্বর সভায় যে সব রাজাদের ডাকা হয়েছিল, তারা যেভাবে নিজেদের ছবি পাঠিয়েছিল সেইভাবে অমরসেনও নিজের ছবি লোক মারফত পাঠাল।

কালিকোটার রাজা অমরসেনের ছবিটা ওই লোকের হাত থেকে নিয়ে, মেঝেতে ফেলে মাড়িয়ে ছবিটাকে ফেরত দিয়ে বলল, 'ওই ছবি তোমার রাজাকে ফেরত দাও।'

নিজের লোক মারফত অমরসেন জানতে পারল, কালিকোটার রাজা তার ছবি কীভাবে মাড়িয়েছে। শুনেই অমরসেনের মাথা গরম হয়ে গেল। সাপের লেজে পা পড়লে সাপ যেমন ফুঁসে ওঠে অমরসেনও তেমনি অপমানের জ্বালায় জ্বলে উঠল। তৎক্ষণাৎ কালিকোটার রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল। তারপর যুদ্ধ ঘোষণা করল।

খবর শুনেই কালিকোটার রাজা ঘোষণা করল, 'অমরসেনের মুণ্ডু যে কেটে আনবে তার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব।'

মনিমালাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্য যেসব রাজা এবং রাজকুমার সমবেত হয়েছিল তারা অমরসেনের মুণ্ডু আনতে রওনা দিল।

সেই সময় অমরসেনের ছোটো ভাই চন্দ্রসেন গুরুর কাছে লেখাপড়া করছিল। বড়ো ভাইয়ের ওপর বিপদের আশঙ্কা আছে শুনে সে তৎক্ষণাৎ বাড়ি ফিরে এল। এক এক রাজকুমার নিজের নিজের ছোটো ছোটো সেনাবাহিনীকে নিয়ে অমরাবতীর দিকে এগোচ্ছিল। রাজপ্রাসাদের ছাদ থেকে

লক্ষ করা গেল, ছোটো ছোটো দলে চারদিক থেকে সেনাবাহিনী আসছে। ওই সেনাবাহিনী দেখে অমরসেন ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল। ততক্ষণে সব রাজা ও রাজকুমার নিজের নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে রাজপ্রাসাদের কাছে পৌঁছে গেছে।

চন্দ্রসেন দাদা অমরসেনের কাছে এসে নীচের ওই দৃশ্য দেখতে দেখতে হঠাৎ তরবারি বের করে দাদার মুণ্ডু কেটে নীচে ছুড়ে ফেলে দিল।

ওই মুণ্ডু দেখে যেসব রাজা ও রাজকুমার এসেছিল তারা ভাবল, 'অমরসেনের মুণ্ডু তো কাটা হয়ে গেছে। যে কেটেছে সে নিয়ে যাবে। আমাদের আর এখানে থেকে লাভ কী?' এই কথা ভেবে যে যার রাজ্যে ফিরে গেল।

তারপর চন্দ্রসেন দাদার কাটা মুণ্ডু কালিকোটার রাজার কাছে নিয়ে গিয়ে মনিমালাকে বিয়ে করে কালিকোটার রাজার সঙ্গে সম্পর্ক মধুর করে তুলল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'আচ্ছা রাজা, চন্দ্রসেন হঠাৎ অকারণে নিজের দাদার মুণ্ডু কেটে ফেলল কেন? মনিমালার মতো পরমাসুন্দরীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে, না কি সিংহাসনে বসার লোভে? চন্দ্রসেনের সঙ্গে কালিকোটার রাজা নিজের মেয়ের বিয়ে দিল কেন? আমার প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এই কথার জবাবে বিক্রমাদিত্য বললেন, 'রাগের মাথায় রাজা অমরসেন কালিকোটার রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। এই ঘোষণার ফলে তিনি যেচে নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছেন। মন্ত্রীর পরামর্শ শুনে তাঁর উচিত ছিল কিছু না করা। অমরসেনের ধারণা ছিল কালিকোটার রাজা দুর্বল। মনিমালাকে পাওয়ার আশায় বহু রাজা যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠবে সেই ধারণা অমরসেনের ছিল না। ফলে অমরসেনের মৃত্যু ঘনিয়ে এল। এই অবস্থায় চন্দ্রসেন ভাবল, দাদার মৃত্যু যখন অবধারিত তখন অন্য লোকে না-মেরে সেই যদি মারে তাহলে সে মনিমালাকে ঘরে আনতে পারবে। তার চেয়ে বড়ো কথা, শত্রুদের হাত থেকে দেশকে বাঁচানো যাবে। মনিমালাকে যদি অন্য কোনো রাজা বিয়ে করত তাহলে অমরাবতীর বিরুদ্ধে কালিকোটার রাজা এবং জামাই দু-জনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোনো না কোনো সময়ে অমরাবতীর ওপর আক্রমণ চালাত। তাই কালিকোটার রাজা যা করেছিলেন তা ঠিক করেছিলেন।'

রাজা বিক্রমাদিত্যের মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৪২. নাম করার ইচ্ছা

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে গিয়ে, গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। সেইসময় শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি যেভাবে পরিশ্রম করছ তা লক্ষ্যণীয়। তোমার এই পরিশ্রম যদি নিজের প্রতিষ্ঠা এবং সুনাম বৃদ্ধির জন্যই হয়ে থাকে তাহলে এর কোনো মূল্য নেই। খ্যাতির সঙ্গে প্রয়াসের কোনো সম্পর্ক নেই। আমার এই কথা যে কতখানি সত্য তার প্রমাণ পাবে মুকুন্দের কাহিনি শুনলে। শুনতে শুনতে পথ হাঁটলে আমার ধারণা তোমার পথ চলার পরিশ্রম লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করে দিল—

মুকুন্দ ছিল কোনো এক গ্রামের চাষি পরিবারের ছেলে। চাষি পরিবারের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও সে ছিল মেধাবী। তার লেখাপড়ার দিকে খুব ঝোঁক ছিল। একবার যা পড়ত তা দীর্ঘকাল মনে রাখতে পারত। এত লেখাপড়া করেও তাকে কিন্তু চাষির জীবনযাপন করতে হয়েছে।

সে অতি সাধারণ গ্রামের ছেলে হলেও তার গ্রামের নাম কিন্তু ইতিহাস প্রসিদ্ধ ছিল। সেখানে এক সময় যে অনেক কিছু ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সেইসব নিদর্শনগুলো দেখার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক আসত। ওইসব দর্শকদের সঙ্গে কথা বলে মুকুন্দ ভেবেছিল, 'এঁরা বিখ্যাত লোক। কিন্তু এঁদের সঙ্গে কথা বলে মনে হচ্ছে এঁদের চেয়ে আমি কোনো অংশে কম নই। এঁরা যদি এত কম জেনে এত বেশি নাম করে থাকেন তাহলে আমিই বা বিখ্যাত হতে পারব না কেন?' এই কথা সে যে শুধু ভেবেছিল তাই নয়, তার এই মনোভাব কয়েক জনের কাছে প্রকাশও করেছিল।

একজন বৃদ্ধ মুকুন্দের মনের এই কথা জানতে পেরে তাকে বলল, 'দেখো বাবা, তুমি যদি এই গ্রামের এককোণে পড়ে থাকো তাহলে কোনোদিন তোমার নাম ছড়িয়ে পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তুমি যদি সত্যি নাম

করতে চাও, খ্যাতি অর্জন করতে চাও, তাহলে তোমাকে এই গ্রাম থেকে বেরিয়ে নগরে যেতে হবে। নগরে না গেলে কেউ নাম কিনতে পারে না।'

বৃদ্ধের এই কথা মুকুন্দের মনে ধরল। সে বাবার সম্মতি ছাড়াই নগরের দিকে রওনা দিল। তার যাওয়ার পথে একটা বন পড়ল। একা একা ওই পথে যাতায়াত করতে অনেকেই ভয় পায়। কিন্তু মুকুন্দের মনে সেই ভয় ঢুকল না। সে ওই পথেই হাঁটতে লাগল।

বনের মাঝপথে একটা চোর তার পথ আগলে দাঁড়াল। মুকুন্দ তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে নিজের পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগল। ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়ে চোর ভাবল, 'আমি গত দশ বছর ধরে এখানে চুরি করছি। আমার নাম শুনেই লোকের পিলে চমকে যায়, আর এই লোকটা আমাকে কোনোরকম তোয়াক্কা না-করে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে গেল! এ তো বড়ো আশ্চর্যের কথা!' সে এই কথা ভেবে মুকুন্দকে বলল, 'ভাই, তোমার মতো সাহসী লোক আমি জীবনে দেখিনি।'

লোকটা যে একটা নামকরা চোর এবং সে যে একটা নামকরা চোরকে জব্দ করেছে এটুকু জানতে পেরে মুকুন্দের খুব গর্ব হল। চোরের নাম ছিল বীরেন্দ্র।

'দেখো ভাই, আমি নাম করতে চাই। তুমি যেভাবে বিখ্যাত হয়েছ আমাকেও সেইভাবে বিখ্যাত করে দাও। আমার মূল উদ্দেশ্য হল খ্যাতি অর্জন করা। আমি আর কিছু চাই না।' মুকুন্দ বলল।

তার কথা শুনে খুব খুশি হয়ে বীরেন্দ্র বলল, 'তাহলে চলো আমরা দু-জনে মিলে নগরে যাই। নগরে আমি তোমাকে চুরি বিদ্যা শেখাব।'

বীরেন্দ্র এবং মুকুন্দ নগরে পৌঁছাল। ঘুরে ঘুরে বীরেন্দ্র ঠিক করল এক বাড়িতে চুরি করবে। রাত্রে দু-জনে মিলে গুটি গুটি পা পা এগিয়ে ওই বাড়ির কাছে পৌঁছাল। বাড়ির দেয়াল টপকে উঠোনে দাঁড়াল। তারপর দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলে বীরেন্দ্র। মুকুন্দ তার প্রতিটি কাজ গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বীরেন্দ্র মুকুন্দকে নিয়ে যে ঘরে সিন্দুক ছিল সেই ঘরে পৌঁছাল। সিন্দুকে যত টাকাপয়সা ছিল সব খুলে একটা পোঁটলায় বেঁধে নিল। তারপর বীরেন্দ্র চারদিকে ভালো করে দেখে নিয়ে, পোঁটলা নিয়ে আস্তে আস্তে সেখান থেকে তখনই বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে লাগল। ওই ঘর থেকে বেরোনোর সময় দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা একটা রমণীর ছবি নজরে পড়তেই বীরেন্দ্র চমকে উঠল। সেই ছবি দেখে সে পা টিপে টিপে আর একটু এগিয়ে পাশের ঘরে ঘুমন্ত মানুষের দিকে তাকাল। তারপর সে ওই পোঁটলাটা সেখানেই রেখে দিয়ে খুব সাবধানে ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

'এটা কি ধরনের চুরি? এত কষ্ট করে ঘরে ঢুকলাম, সিন্দুকের টাকাপয়সা বের করলাম, পোঁটলা বাঁধলাম, শেষে কিনা সব ফেলে রেখে চলে আসতে হল! তাহলে না ঢোকাই উচিত ছিল।' মুকুন্দ বিরক্ত হয়ে বলল।

'তাহলে বলি শোনো, একবার আমি যেকোনো কারণে অজ্ঞান হয়ে বনে পড়েছিলাম। এক মহিলা ওই বনপথ দিয়ে গাড়ি করে যাচ্ছিল। আমাকে দেখতে পেয়ে সে গাড়িতে তুলে বসিয়ে তার বাপের বাড়িতে নিয়ে গেল। যতদূর মনে হচ্ছে এই বাড়ি হল ওই মহিলার স্বামীর। যে মহিলা একসময় আমাকে বাঁচিয়েছে, যার জন্য আমি প্রাণে বেঁচেছি তাকে কি আমি কখনো ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারি। তাই সব কিছু সেখানে ফেলে রেখে আমি চলে এসেছি। আমি চোর হলেও আমার একটা নিয়ম আছে, বিবেক আছে।' বীরেন্দ্র বলল।

মুকুন্দ ভাবল, বীরেন্দ্রের কাছে শেখার কিছু নেই। সে তাকে ছেড়ে চলে গেল।

তারপর মুকুন্দ একা একা নগরে ঘুরতে লাগল। কোথায় থাকবে, কী খাবে ঠিক নেই। সেই সময় তার সঙ্গে পরিচয় হল ওই নগরের শ্রেষ্ঠ বিচারক শরৎচন্দ্রের।

বিচারকের একটা অভ্যেস ছিল একা খেতে না-বসা। প্রত্যেকদিন উনি একজন অতিথিকে নিয়ে বসতেন। সেদিন মুকুন্দকে অতিথি হিসেবে পেল ওই বিচারক। মুকুন্দের কথা শুনে সে বলল, 'তুমি যতদিন না এই নগরে স্থির হয়ে কোথাও থাকছ, ততদিন আমার বাড়িতে থাকতে পারো।'

ওই নগরে চক্রধর নামে এক বীর ছিল। ওই বীরকে নাকি কেউ পরাজিত করতে পারে না। মুকুন্দের ইচ্ছা করল ওই বীরকে পরাজিত করে খ্যাতি অর্জন করা।

চক্রধর প্রত্যেকদিন সন্ধ্যের সময়ে নিজের উদ্যানে একা ঘুরতে ভালোবাসে। একবার মুকুন্দ অত্যন্ত সন্তর্পণে এবং গোপনে উদ্যানে ঢুকে চক্রধরের সামনে অতর্কিতে তার তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

চক্রধর প্রশ্ন করল, 'কে তুমি?'

‘তোমাকে পরাজিত করে আমি খ্যাতি অর্জন করতে চাই।’ মুকুন্দ বলল।

‘সেটাই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তুমি গোপনে এই জনমানবশূন্য স্থানে এলে কেন?’ চক্রধর বলল।

‘আমি তোমাকে হারিয়ে দিতে চাই। কিন্তু তোমার কাছে হেরে যাওয়ার ভয়ও তো আছে। তাই এসেছি।’ মুকুন্দ বলল।

তারপর চক্রধর নিজের তরবারি বের করল। কিছুক্ষণের মধ্যে মুকুন্দ চক্রধরকে পরাজিত করল। পরাজিত হয়ে চক্রধর বলল, ‘ভাই, তুমি যে ধরনের অস্ত্র চালনা জানো তাতে মনে হচ্ছে তুমি আমার চেয়ে অনেক বড়ো এবং ক্ষমতাবান। আমি তোমার বন্ধু হতে চাই। তোমার কাছে আমি অস্ত্র চালনা শিখতে চাই।’

'তোমাকে অস্ত্র চালনা শিখিয়ে আমার কী লাভ?' মুকুন্দ বলল।

'তুমি আমাকে অস্ত্রচালনা শেখাবে, আমি তোমাকে দৈনিক একশোটি স্বর্ণমুদ্রা দেব।' চক্রধর বলল।

দু-মাসের মধ্যে চক্রধর মুকুন্দের কাছ থেকে সমস্ত রকমের অস্ত্রশিক্ষা শিখে নিল। মুকুন্দের অস্ত্রচালনার শেখানোর চাকরি চলে গেল। কিন্তু মুকুন্দ দমে যায়নি। কারণ তার কাছে ছ-হাজার স্বর্ণমুদ্রা ছিল। মুকুন্দ ভাবল, এই ছ-হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে ব্যাবসা করলে ভালো হয়। সে এক রত্নব্যবসায়ীর সঙ্গে আলোচনা করল। রত্ন ব্যবসায়ীর নাম ছিল রত্নেশ্বর। নগরে তার নাম ডাক ছিল। মুক্তোর ব্যাবসা করে মুকুন্দ এক বছরের মধ্যে লক্ষাধিপতি হয়ে গেল।

রত্নেশ্বর মুকুন্দকে বলল, 'যা রোজগার করবে তার দশভাগের একভাগ দান করবে।'

কিন্তু মুকুন্দ তার কথা কানে তুলল না। ব্যাবসা ছেড়ে সে গানের চর্চা করল। কিন্তু কোনোটাতেই নাম করতে পারল না।

হঠাৎ মুকুন্দ নগরে তার বাবাকে দেখে বলল, 'কী ব্যাপার, তুমি এখানে?'

'আর বলিস কেন? এবছর আমাদের ক্ষেতে তিনগুণ ফসল হওয়াতে রাজা পুরস্কার দেওয়ার জন্য আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।' মুকুন্দের বাবা বলল।

মুকুন্দ বুঝল এতকাল সে যা ভেবেছে তা ভুল। খ্যাতি অর্জনের জন্য নগরে আসার তেমন কোনো প্রয়োজন নেই।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, মুকুন্দের খ্যাতিলাভের ইচ্ছা ব্যর্থ হল কেন? তার কি সামর্থ্য ছিল না? বাবাকে দেখেই কি তার বাড়ি ফেরার ইচ্ছা করল? নগরের সব ব্যাপারেই তো সে এগিয়ে গেল, তা সত্ত্বেও সে বিখ্যাত হল না কেন? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'মুকুন্দ ভেবেছিল, খ্যাতি অর্জনের জন্য কয়েকটি ক্ষেত্র আছে। ওই ক্ষেত্র ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে নাম করা যায় না। সে ইচ্ছে করলে যেকোনো ক্ষেত্রে টিকে থেকে নাম করতে পারত। কিন্তু তার মধ্যে সেই ধৈর্য ছিল না। বাপ যখন রাজার কাছে পুরস্কার নিতে এল তখন সে বুঝতে পারল খ্যাতি অর্জনের জন্য যেকোনো একটি ক্ষেত্রই যথেষ্ট। তাই সে নিজের গ্রামে ফিরে গেল।'

রাজার এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৪৩. বেশি কথা বলে

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে গিয়ে, গাছ থেকে শব নামিয়ে, কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। এমন সময় শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, নিঃসন্দেহে তোমার মন প্রতিজ্ঞা-দৃঢ়, কিন্তু তোমার মতো বহু দৃঢ় মনোভাবসম্পন্ন লোকও পরিবর্তিত হয়। আমার কথার স্বপক্ষে আমি একটি কাহিনি বলছি। শুনলে তোমার পথ চলার পরিশ্রম লাঘব হবে। শোনো বলছি।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল—

বীরকেশরী নামে এক সাধারণ লোক ছিল। লোকটার এক অসাধারণ গুণ ছিল, তা হল সে চুপ করে থাকতে পারত না। পথে যার সঙ্গে দেখা হত তাকেই কোনো না কোনো কথা বলত। কেউ জবাব দিক বা না দিক প্রশ্ন করাই ছিল তার স্বভাব। এমনকী তার প্রশ্নের সঠিক জবাব পেল কি না তা নিয়ে তার মাথাব্যথা ছিল না। প্রশ্ন করেই সে খুশি। এটা যাদের কাছে ভালো লাগত না তারা তাকে এড়ানোর চেষ্টা করত।

তার স্ত্রী ছিল খুব ভালো। কেউ তার কথা শুনুক বা না শুনুক তার স্ত্রী বাধ্য হত তার কথা শুনতে। শুনে শুনে তার যেন শোনাটাই অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। সে কোনো প্রশ্ন করত না আর কোনো প্রশ্নের জবাবও চাইত না। বীরকেশরী যা বলত, সত্য হোক মিথ্যা হোক সে শুধু শুনে যেত। এসব দেখে তার দাদা শম্ভু মনে মনে দুঃখ পেয়েছিল। সে তার বোনকে এই ধরনের কষ্ট থেকে মুক্ত করার জন্য অন্য এক গ্রাম থেকে এক কুস্তিগীরকে নিয়ে এল। কুস্তিগীর ওই গ্রামে এসে সোচ্চারে ঘোষণা করল, 'আমার সঙ্গে কেউ কি কুস্তি লড়তে চাও? এই গ্রামে কি আমার সঙ্গে কুস্তি লড়ার কোনো লোক আছে? কেউ যদি থাকো, এগিয়ে এসো।'

দর্শকদের মধ্যে বীরকেশরী ছিল। সে এগিয়ে এসে বলল, 'তুমি ভালোভাবেই জানো, এখানে কোনো কুস্তিগীর নেই। আর নেই বলেই এত জোর গলায় ঘোষণা করছ।'

কুস্তিগীর ভীষণ রেগে গিয়ে বলল, 'ভিড়ের ভেতর থেকে কে বলছ? সাহস থাকে এগিয়ে এসো। তুলে আছাড় মেরে তাকে এক্ষুনি মেরে ফেলব। কে বলেছ, এগিয়ে এসো।'

বীরকেশরী তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এসে বলল, 'কেন, কী হয়েছে? আমি বলেছি। যা সত্য তাই বলেছি। সত্য কথা বললে অত রাগ করার কী আছে?'

এই কথায় কুস্তিগীর আরও রেগে গিয়ে বীরকেশরীর হাত ধরে টেনে তুলে একটা আছাড় মেরে তাকে ছেড়ে দিল। সে যাত্রায় সে প্রাণে বেঁচে গেল বটে, কিন্তু তার শরীরে অসংখ্য ঘা হয়ে গিয়েছিল। পরে বীরকেশরীকে শম্ভু বলল, 'দেখলে তো, সবসময় তুমি এই যে প্রয়োজনে নিষ্প্রয়োজনে কথা বল তারই ফল হল এই। অতগুলো লোকের মধ্যে আর কেউ কোনো কথা বলল না। তুমি হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে যা মুখে এল তাই বলে দিলে।'

সারা গায়ে ব্যথা হলেও বীরকেশরী শ্যালককে বলল, 'অতবড়ো কুস্তিগীরের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার সাহস কারও আছে? আমার আছে তাই বলেছি।'

শম্ভু ভাবল, 'এর স্বভাব অত সহজে বদলাবে না। প্রবাদ আছে— "স্বভাব যায় না মলে, ইল্লত যাই না ধুলে।" তাই এর পেছনে সময় নষ্ট করে লাভ নেই।'

একদিন বীরকেশরী যখন বাড়িতে ছিল না তখন এক সাধু এল। বীরকেশরীর স্ত্রী বলল, 'দেখুন আমার স্বামী এখন বাড়িতে নেই। এসে যদি শোনেন যে তাঁর অনুপস্থিতির সময় আমি কাউকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছি তাহলে উনি ভীষণ রেগে যাবেন এবং যা মুখে আসবে তাই আমাকে বলে ফেলবেন।'

'মা জননী, আমাকে একটু খেতে দাও। তোমার কর্তার মুখ কী করে বন্ধ করতে হয় তা আমি জানি।' সে বলল।

তার কথায় বিশ্বাস করে বীরকেশরীর স্ত্রী তাকে খাওয়াতে বসল।

এমন সময় বীরকেশরী বাড়িতে এসে ওই সাধুকে গোগ্রাসে গিলতে দেখে সাধুকে ধমক দিয়ে বলল, 'এই খাওয়ার জন্যে এত কষ্ট করে দাড়ি গোঁফ বাড়িয়ে রাখতে হয়েছে! একটু গায়ে-গতরে খেটে রোজগার করে খেতে পারো না? স্বাস্থ্য তো বেশ বাগিয়েছ।' এই ধরনের আরও অনেক খারাপ খারাপ কথা বলল।

'দেখো, আমার যে কত ক্ষমতা আছে তা তুমি জানো না। আমাকে গালাগাল দিয়ে তুমি কিন্তু নিজের কবর খুঁড়ছ।' সাধু বলল।

'চুপ করো, তোমার মতো ভণ্ড সন্ন্যাসী অনেক দেখেছি। আর একটি কথা বলেছ কী মজা দেখিয়ে দেব! তুমি ভণ্ড।' বীরকেশরী বলল।

পরক্ষণেই দেখা গেল সন্ন্যাসীর ছেঁড়া কাপড়ের পরিবর্তে ভালো পোশাকের অন্য লোক। সে বলল, 'বীরকেশরী, তোমাকে একটা বর দিচ্ছি। এবার থেকে তুমি যার সর্বনাশ কামনা করবে তারই পৌষমাস হবে।' বলে ওই সাধু চলে গেল।

তারপর অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। একদিন বীরকেশরী একজনকে অভিশাপ দিয়ে বলল, 'তোমার ধান ক্ষেত পুড়ে যাক।' সঙ্গেসঙ্গে ওই ধানক্ষেত সোনালি ধানে ভরে গেল। কাউকে হয়তো বলল, 'তোমার বাড়ি ঝড়ে উড়ে যাক।' আর সেই বাড়ি সঙ্গেসঙ্গে প্রাসাদ হয়ে গেল।

এইভাবেই রাগের মাথায় যাকে অভিশাপ দেয় তারই আশীর্বাদ হয়। এতগুলো লোকের রাতারাতি উপকার হয়ে যাওয়ায় চমকে উঠে সে সংযত হল এবং কারও অপকার কামনা না-করে উপকার কামনা করতে লাগল। তার মধ্যে দেখতে দেখতে অনেক পরিবর্তন দেখা দিল। আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও কারও না কারও বিরুদ্ধে যখন সে কথা বলত তখন শেষপর্যন্ত প্রতিপক্ষের উপকারই হত। এই ঘটনার ফলে সে যে শুধু অন্যের উপকারের কামনা করতেই লাগল তা নয়, সে কথাও কম বলতে লাগল। তার এই পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে খুশি হল তার স্ত্রী। এটা তার স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাপার ছিল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, দেখে-শুনে মনে হচ্ছে, শেষপর্যন্ত সাধু বীরকেশরীর মনে পরিবর্তন এনেছিল। অথচ সাধু এমন কিছুই করল না। শুধু একটি ব্যবস্থা করে গেল যাতে বীরকেশরী অভিশাপ দিলে তা

আশীর্বাদ হয়ে ওঠে। এইটুকুর জন্যে বীরকেশরীর আজীবনের স্বভাব পালটে গেল কেন? তার রাগ এত কমে গেল কী করে? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে অনতিবিলম্বে আমার সামনেই তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এই প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'যেকোনো লোক যখন প্রতিপক্ষকে অভিশাপ দেয় তখন সে চায় যে তার অভিশাপ লাগুক। পুরাণে আছে কিছু লোকের অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের অত বড়ো ক্ষমতা নেই। এই ক্ষমতা না থাকার ফলে সাধারণ মানুষ যা মুখে আসে তাই বলে। যা বলত তাই যদি ঘটে যেত তাহলে মানুষ সংযত হয়ে কথা বলত। বীরকেশরী যা বলত তার বিপরীত ঘটনা ঘটে যাওয়ার ফলে শেষপর্যন্ত তাকে সংযত হয়ে কথা বলতে হল। বীরকেশরী অন্যের উপকার করতে চাক আর নাই চাক তার কথা ফলে যাওয়ায় সে সংযত হয়ে কথা বলতে শুরু করল। এইভাবে যে লোকটা অনবরত কথা বলত, গালাগালি দিত তা বন্ধ করে আশীর্বাদ করতে লাগল। এ যেন মরা মরা করতে করতে রাম নাম জপ করা। এর ফলে তার স্বভাবের পরিবর্তন ঘটে গেল।'

রাজার এইভাবে নীরবতা ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৪৪. ধর্মপরায়ণ

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে গিয়ে, গাছ থেকে শব নামিয়ে, কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। এমন সময় শবেস্থিত বেতাল বলে উঠল, 'রাজা, তুমি যা করছ তা ধর্মের না অধর্মের সে প্রশ্ন তুলছি না। তবে তোমার প্রয়াস সফল হবে কি না সেটাই আমার কাছে বড়ো প্রশ্ন। সিংহপুরীর রাজা নরসিংহবর্মা মস্তবড়ো ধার্মিক ছিলেন। বিজয়লাভের জন্য তিনি অত্যন্ত অধর্মের পথ ধরেছিলেন। আমার এই কাহিনি শুনলে তোমার পথ চলার পরিশ্রমও লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল—

শোনপুরের রাজা জয়পুর রাজার অধীন ছিল। শোনপুর ছিল একটি ছোট্ট দেশ। তবে সেই দেশে ছিল গুণী-জ্ঞানী ও ধনী লোক। জয়পুরে রাজার নাম ছিল জয়দেব। জয়দেব বিপদে-আপদে শোনপুরের রাজাকে সাহায্য করত। যেহেতু শোনপুর দেশ হিসেবে ছিল ছোট্ট এবং সম্পদশালী অথচ লোকবল ও সৈন্যবলে দুর্বল ছিল সেইহেতু মণিপুরের রাজা মনিমন্ত শোনপুরের ওপর হঠাৎ আক্রমণ করল। তার নিশ্চিত ধারণা ছিল এই ধরনের দেশের ওপর আক্রমণ করে অতি সহজে জয়ী হওয়া যায়।

ঠিক সেইসময় জয়দেব ঝামেলায় পড়েছিল। অন্য সময় হলে সে সোনপুরকে রক্ষা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ত; কিন্তু নিজের দেশে ঝামেলায় জড়িয়ে থাকার জন্য অন্য দেশকে সাহায্য করার কোনো উপায় ছিল না। অগত্যা মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে সিংহপুরীর রাজা নরসিংহ বর্মার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তাকে আর্থিক সাহায্য দিল। জয়পুর ও সিংহপুরীর মধ্যে মৈত্রীভাব গড়ে উঠল। নরসিংহবর্মা ধর্মপরায়ণ হিসেবে খ্যাতি লাভ করল। জয়পুর ও শোনপুরের নানা সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে নরসিংহবর্মা এগিয়ে এল। নিজের সেনাবাহিনীকে জয়পুরের সেনাবাহিনীর সঙ্গে এক করে মণিপুর আক্রমণ করল।

উভয় দেশের মধ্যে দু-দিন ধরে যুদ্ধ হল। দু-দিনের যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে জয় যে মণিপুরের হবে সেটা নিশ্চিতভাবে জানা যাচ্ছিল। যুদ্ধের পরিস্থিতির যখন এই অবস্থা তখন জয়দেব নরসিংহবর্মাকে একটি কৌশল গ্রহণ করতে পরামর্শ দিল। নরসিংহবর্মা তৎক্ষণাৎ সেই কৌশল গ্রহণ করল। সে সঙ্গেসঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব দিল। প্রস্তাবটা একেবারে একতরফা ছিল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নরসিংহবর্মা ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিল।

সেদিন রাত্রে মণিপুরের সৈনিকদের শিবিরে বিজয়োৎসব হচ্ছিল। সৈনিকরা মদ খেয়ে নাচানাচি করছিল। তারা যখন মত্ত অবস্থায় ছিল সেইসময় জয়পুরের সৈন্য ও সিংহপুরীর সৈন্য ঐক্যবদ্ধভাবে মণিপুরের সৈনিকদের উপর আক্রমণ চালাল। সহজেই মণিপুরের রাজাকে বন্দি করল।

শোনপুর মুক্ত হল। জয়পুরের রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নরসিংহবর্মা নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে দেশে ফিরে গেল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, নরসিংহবর্মার ধর্মপরায়ণ হিসেবে খ্যাতি ছিল। এহেন ধর্মপরায়ণ লোক জয়দেবের পরামর্শে সন্ধি ঘোষণা করেও, রাত্রির অন্ধকারে শত্রুর শিবির আক্রমণ করল কী করে? জয়দেবের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করার জন্য না কি মণিমন্তের দম্ভ চূর্ণ করার জন্য? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এই প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'নরসিংহবর্মা জয়দেবের পরামর্শ গ্রহণ না করলে তাকে শোচনীয়ভাবে পরজিত হতে হত। ধর্মসংস্থাপনের জন্য একটা পরিবেশ প্রয়োজন। শোনপুরকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচানো জয়দেবের ধর্ম। কিন্তু সেই ধর্মকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সাময়িকভাবে অধর্মের পথ গ্রহণ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। স্থায়ীভাবে ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য এই পথ গ্রহণ করতে হয়েছিল। যারা ছোট্ট দেশের ওপর আক্রমণ করে তারা কি অধর্ম করে না? শোনপুরের মতো ছোটো দেশের উপর আক্রমণ করা কি অধর্ম নয়? বিশেষ করে শোনপুর তো কোনো দেশের প্রতি ক্ষতিকারক কিছু করেনি। যে রাজা কথায় কথায় যুদ্ধে মেতে উঠতে চায় তাকে পরাজিত করে তার যুদ্ধলিপ্সা স্তব্ধ করা কি অধর্মের কাজ? বিনা অপরাধে যে রাজা আক্রমণ করে তাকে অধর্মের পথে পরাস্ত করা কোনো ক্রমেই অধর্ম নয়।'

রাজা মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৪৫. সঠিক বিচার

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে গিয়ে, গাছ থেকে শব নামিয়ে, কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, এই মধ্যরাত্রে তুমি যে শ্মশানের দিকে যাওয়া ঠিক করেছ, শব কাঁধে ফেলে যাচ্ছ, এতে আমার বলার কিছু নেই। আমি শুধু বলতে চাই, রাজাদের সিদ্ধান্ত সবসময় যে সঠিক হয় তা নয়। আমার কথাকে প্রমাণ করার জন্য আমি জ্ঞানশীল নামক এক রাজার দুটো চোরকে শাস্তি দেওয়ার বিষয়ে জানাচ্ছি। আমার এই কাহিনি শুনতে শুনতে পথ হাঁটলে পথচলার পরিশ্রম লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল—

জ্ঞানশীল যখন মগধের সিংহাসনে বসল তখন সেখানে দারুণ অরাজকতা চলছিল। নীতিহীন কাজ অনবরত হত। ফলে প্রজাদের জীবন যেকোনো সময়ে বিপন্ন হত। এই অবস্থায় জ্ঞানশীল শুধু শাস্তি দিয়ে দিয়ে দেশের বহু অপরাধীকে পর্যুদস্ত করল। ফলে অপরাধপ্রবণতা অনেকখানি কমে গেল। প্রজাদের জীবনধারা অনেকখানি স্বাভাবিক হয়ে এল।

অপরাধপ্রবণতা কমে গেলেও দেশে সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হল না। ঘন ঘন ছোটো ছোটো চুরির পরিবর্তে কিছুদিন অন্তর বড়ো বড়ো চুরি হতে লাগল। এসব চুরি সাধারণ প্রজাদের বাড়িতে হত না। ধনীদের বাড়িতে চুরি হত।

কিছুদিন পরে রাজা জানতে পারল যে মাত্র দু-টি চোর বিভিন্ন ধনীর বাড়িতে চুরি করছে এবং চুরির কিছু অর্থ গোপনে গরিবদের মধ্যে বণ্টন করে দিচ্ছে। এটা যে দু-জন করছে তা জানতে পারল ঘটনা বিশ্লেষণ করে। একই রাত্রে দুটো বাড়িতে একই সময়ে চুরি হত। চুরির পদ্ধতি ঠিক এক ধরনেরই ছিল। তাই সহজেই অনুমান করা গিয়েছিল যে চুরিটা একজন করেনি।

রাজা জ্ঞানশীল ঠিক করল এই দুটি চোরকে ধরার। কিন্তু চোর দুটো

এত চতুর ছিল যে ওদের ধরা রাজপ্রহরীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কীভাবে যে চোর দুটোকে ধরা যায় সেই বিষয়ে রাজা মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করল।

'যারা চোর ধরে দেবে তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা যেতে পারে। চোরগুলো যেহেতু গোপনে গরিবদের অর্থ দিচ্ছে সেইহেতু একমাত্র গরিবরাই বলতে পারবে চোর দুটো কোথায় গা-ঢাকা দিয়ে আছে। পুরস্কারের লোভে গরিব মানুষগুলো ধরিয়ে দিতে পারে।' মন্ত্রী বলল।

রাজার কাছে মন্ত্রীর এই প্রস্তাব ভালো না লাগায় রাজা মন্ত্রীকে বলল, 'আমরা পুরস্কার দেবো মাত্র একবার। এই একটি বার মাত্র পুরস্কার পাওয়ার লোভে গরিব মানুষগুলো চোরের সন্ধান দেবে বলে আমার মনে হয় না। কারণ চোর দুটো প্রত্যেকদিন ওদের সাহায্য দিয়ে থাকে। অর্থের দিক থেকে গরিব হলেও গরিব মানুষগুলো বিশ্বাসঘাতক হয় না। আর একটি বিষয় হল প্রজাদের মধ্যে পুরস্কারের লোভ ছড়িয়ে পড়লে কিছুকালের মধ্যেই ঘুস খাওয়ার লোভ ছড়িয়ে পড়বে। তৃতীয় বিষয় হল, পুরস্কার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ হয়ে যাবে যে রাজার প্রহরীরা চোর ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে ভয় পেয়ে ধনীরা চোর ধরার কথা ভাবতে পারবে না। আর গরিবরা চোর ধরিয়ে দেবে না। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য এর আগে অনেক কাজ করা গেছে। এবারেও আমি চেষ্টা করব। চোরকে ধরার শ্রেষ্ঠ উপায় হল নিজে চোর সাজা। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়।'

মন্ত্রীকে এই কথা বলে রাজা ছদ্মবেশে গভীর রাত্রে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে রাজা জানতে পারল চোর দুটোর নাম রসরাজ ও নারান। দু-জনেই অভিজাত পরিবারের সন্তান। দুটো পরিবারেরই সমাজে নাম আছে। এক ডাকে ওই দুটো পরিবারকে লোকে চেনে। দেশে যখন চরম অরাজকতা চলছিল তখন তারা এই পথে পা বাড়িয়েছে।

ছদ্মবেশে ঘুরে ঘুরে এক রাত্রে রাজা তার দেহরক্ষীদের সহযোগিতায় ওদের ধরে ফেলল। ভরা রাজসভায় রসরাজ ও নারানের বিচার হল। দু-জনেই স্বীকার করল যে তারা চুরি করেছে। নারান বলল, 'মহারাজ, আপনি যখন সিংহাসনে সবে বসলেন তখন চুরি করা ছাড়া আমাদের সামনে অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না। চুরি করি। খাই-দাই ভালোয় আছি। এই হল আমার কথা। কিন্তু এই রসরাজ আমার মতো চোর নয়। যা চুরি করে, পারলে সবটাই গরিবদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়। নিজের সুখের জন্য সে খরচ করে না।'

রাজা বেশি সময় নষ্ট না-করে নারান ও রসরাজকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল।

বেতাল এই কাহিনি বলে শেষ করল এইভাবে, 'আচ্ছা রাজা, আমার একটা প্রশ্ন আছে। রাজা জ্ঞানশীল ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে রসরাজ ও নারান দু-জনেই চোর হলেও দু-জনে একই ধরনের অপরাধী নয়, তা সত্ত্বেও দু-জনকে একই ধরনের শাস্তি দিল কেন? এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এই প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'যেকোনো রাজার চোখে চুরি করাটাই অপরাধ। চুরি করা অর্থ গরিবদের মধ্যে বণ্টন করে দেশের উন্নতি হয় না। সারা দেশে যখন অপরাধীদের দমন করে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিলেন সেইসময় জ্ঞানশীল জানতে পারলেন যে, দু-টি চোর নিয়মিত চুরি করে। তিনি যে লক্ষ্যে পৌঁছাতে চান তার পথে বাধার সৃষ্টি করছে। প্রজাদের মধ্যে গোপনে অর্থ বণ্টন করার ফলে তাদের মনে ধারণা হচ্ছিল রাজার চেয়ে চোর বড়ো উপকারী। এই অবস্থা কোনো রাজা মেনে নিতে পারেন না। সেইজন্যই রাজা একই ধরনের শাস্তি দিয়েছিলেন। আমার মতে রাজার বিচার সঠিক ছিল।'

রাজা এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৪৬. বাস্তব জ্ঞান

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে গিয়ে, গাছ থেকে শব নামিয়ে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি যেভাবে খেটে যাচ্ছ তাতে মনে হচ্ছে তোমার বাস্তব জ্ঞানের অভাব আছে। যাদের জাগতিক জ্ঞান আছে, তারা অত্যন্ত সাধারণ অবস্থা থেকে অনেক উন্নতি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বরুণের কাহিনি আমি শোনাতে পারি। পথ চলতে চলতে যদি এই কাহিনি শোনো তাহলে তোমার পথচলার পরিশ্রম কমে যাবে। এবার বলি, শোনো।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল—

ধর্মপুরী দেশের এক গ্রামে বরুণ নামে এক বৈশ্যকুমার ব্যাবসা করে জীবনযাপন করবে বলে ঠিক করেছিল। যেকোনো ব্যাবসা করতে হলে কিছু পুঁজি লাগে। তাই সে ওই গ্রামের যে লোকটা সুদে টাকা খাটাত তার কাছে টাকা ধার নিল। ধারের টাকায় ব্যাবসা শুরু হল। কিন্তু যত বেশি কেনাবেচা হবে ভেবেছিল তত বেশি না হওয়ায় ঠিকসময় সে টাকা শোধ করতে পারল না।

সুদের কারবারী টাকার জন্য তাকে তাগাদা দিতে লাগল। বরুণ তাকে বলল, 'সব টাকা আমি মিটিয়ে দেব। সেরেস্তা থেকে আমাদের বাসুদেব আসছে। তার আসার সঙ্গে সঙ্গে সব টাকা মিটিয়ে দেব।'

'বাসুদেবের সঙ্গে তোমার আলাপ আছে?' সুদের কারবারী তাকে প্রশ্ন করল।

'আলাপ থাকবে না কেন? ও তো আমাদের বন্ধুর মতো।' বরুণ বলল।

'তাহলে এতদিন আমাকে এই কথা জানালে না কেন? ঠিক আছে, তাহলে তো তোমার একটা ভালো উৎস আছে। যখন সময় হবে দিও। অত তাড়ার কিছু নেই।' বলে সুদের কারবারী তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে গেল।

বাসুদেবের নাম শুনে সুদের কারবারী যে ধরনের ব্যবহার করল তাতে বরুণ রীতিমতো বিস্মিত হল। কিন্তু পরের দিন সব কিছু তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

পরের দিন সুদের কারবারী একটা ছেলেকে সঙ্গে করে তার কাছে এসে বলল, 'এই দেখো বরুণ, এই ছেলেটা আমার শ্যালক। বাসুদেবকে বলে জমিদারের সেরেস্তায় একটা কাজ পাইয়ে দাও না। এর জন্য একটা চাকরি যদি পাইয়ে দাও তাহলে আমি তোমার কাছে যা পাব তা তোমায় শোধ করতে হবে না।'

সুদের কারবারী কী বুঝতে কী বুঝল কে জানে! বরুণের বন্ধু বাসুদেব জমিদারের সেরেস্তায় একটা সাধারণ চাকরি করত। তবে বাসুদেব নামে আর একজনও ওই সেরেস্তায় চাকরি করত উচ্চপদে। ওই উচ্চপদের চাকুরের কথা ভেবে সুদের কারবারী তার শ্যালককে নিয়ে এসেছিল।

বরুণ যে মুহূর্তে বুঝতে পারল, সুদের কারবারী ভুল বুঝেছে সেই মুহূর্তে তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। তক্ষুনি যদি ওর ভুল ভেঙে দেওয়া হয় তাহলে ধার শোধ করতে হবে। তাই সে ওই প্রসঙ্গ না তুলে বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে, চেষ্টা করব। আপনি কালকে একবার আসবেন।' বলে সুদের কারবারীকে বিদায় দিয়ে নিজে চলে গেল সেরেস্তায়। সেরেস্তায় যত লোক কাজ করে তাদের প্রত্যেকের নাম, ঠিকানা, পদ ইত্যাদি লিখে নিল।

তারপর বরুণ যে দপ্তরে কাজ করে সেই দপ্তরে গিয়ে প্রহরীকে বলল, 'আমাকে মণ্ডলাধিকারী বীরবর্মা পাঠিয়েছেন, তাঁর কোনো এক আত্মীয়ের

চাকরির ব্যাপারে। এক্ষুনি আমাকে বাসুদেবের সঙ্গে দেখা করতে হবে।' প্রহরী বরুণের কথা শুনেই বাসুদেবের সঙ্গে দেখা করতে দিল। বীরবর্মার নাম শুনেই বাসুদেব বরুণকে বলল, 'ঠিক আছে, কালকে ওকে নিয়ে আসুন।'

সুদের কারবারী পরের দিন তার শ্যালককে নিয়ে জমিদারের সেরেস্তায় পৌঁছে গেল।

যথারীতি উচ্চ পদাধিকারী বাসুদেব ওই ছেলেটিকে চাকরিতে বহাল করে নিল।

এদিকে গ্রামে দু-একদিনের মধ্যে রটে গেল যে বরুণ জমিদারের সেরেস্তায় সুদের কারবারীর শ্যালককে একটা চাকরি পাইয়ে দিয়েছে। আরও রটে গেল যে সেরেস্তার বড়ো বড়ো পদে যারা আছে তাদের সঙ্গে বরুণের বেশ চেনাজানা আছে। এই রটনার ফলে, গ্রামের বহু লোক বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বরুণের কাছে আসতে লাগল। কেউ চায় চাকরি আবার কেউ চায় খাজনার হার কমাতে। যারা যে উদ্দেশ্যেই আসুক না কেন, কিছু-না-কিছু তাকে দিয়ে যেত। এইভাবে লোকের যাতায়াত বাড়তে বাড়তে এমন একটা সময় এল যখন মন্ত্রী ও সেনাপতির লোকও তার বাড়িতে যাতায়াত শুরু করে দিল। এই সুযোগে বরুণও তাদের পরিবারে যাতায়াত করত। বড়ো বড়ো লোকের বাড়িতে যাতায়াতের ফলে বরুণের খ্যাতি এবং সম্মান বেড়ে গেল। দেশের ব্যাবসাদাররাও বরুণের বন্ধু হয়ে গেল। যোগাযোগ বেড়ে যাওয়ার ফলে বরুণ সত্যিসত্যি একদিন চাকরি পাইয়ে দেবার মতো ক্ষমতাবান হয়ে উঠল। সেনাপতি এবং মন্ত্রীর বাড়িতে যেকোনো উৎসবে তাকে দেখা যেত। এমনকী বাড়ির কাজকর্মেও তার উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় হয়ে উঠল। এইসব উৎসবে অংশ গ্রহণ করে বরুণ সবিনয়ে তার উপহার দিতে দিতে বলত, 'অধীনের এই ক্ষুদ্র উপহার।' তারপর এমন একদিন এল যখন সে আর নিজে সেরেস্তায় না গিয়ে একটা চিরকুট পাঠিয়ে যেকোনো লোকের চাকরি পাইয়ে দিতে পারত। একবার রাজার জন্মদিন উপলক্ষ্যে বরুণ বিশেষ আমন্ত্রণ পেল। এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পেয়েছিল দেশের গণ্যমান্য লোক। এই অনুষ্ঠানে গল্প করতে করতে বিভিন্ন লোক নিজেদের জীবনের গোড়ার কথা, কীভাবে উন্নতি করল তার কথা কিছু বাড়িয়ে-কমিয়ে বলল। বরুণ যা ঘটেছিল তাই বলল। তার কথা শুনে সবাই হেসে উঠল।

সকলের বলার পর রাজা বলল, 'আপনাদের সকলের চেয়ে বরুণ হল অত্যন্ত বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন লোক। বৈষয়িক বুদ্ধিও আপনাদের সকলের চেয়ে বরুণের বেশি আছে।' রাজা বরুণের প্রশংসা করল।
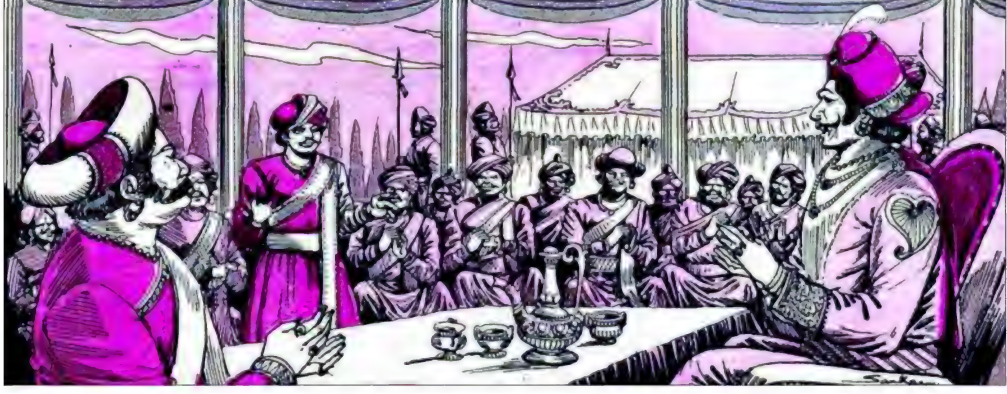
বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা বৈষয়িক জ্ঞান বরুণের বেশি থাকতে পারে, কিন্তু সে যা করল সেটা তো ধোঁকাবাজি। এই ধোঁকাবাজির কাহিনি শুনে ওই অনুষ্ঠানে যারা ছিল তারা কোন আক্কেলে হেসে উঠেছিল? আর রাজাই বা এত বড়ো একটা ধোঁকাবাজির প্রশংসা করল কী করে? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এই প্রশ্ন শুনে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'সংসারে কেউ উন্নত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে আবার কেউ অনুন্নত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে উন্নতি করে। যারা অনুন্নত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং উন্নতি করে তাদের বৈষয়িক জ্ঞান রাখতেই হবে। মন্ত্রীর ছেলের উন্নতির জন্য বাস্তবজ্ঞানের প্রয়োজন ততটা নেই। একই যুক্তিতে বরুণের পরিবার যখন উন্নত হয়ে গেল তখন তারও আর প্রয়োজন নেই বৈষয়িক জ্ঞানের। একটা সাধারণ ব্যাবসা থেকে শুরু করে রাজধানীর গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে উন্নীত হওয়ার মূলে বরুণের বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় পাই।'

রাজা এই কথা বলতেই বেতাল ফিরে গেল সেই গাছে।

৪৭. সম্পর্ক

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে গিয়ে, গাছ থেকে শব নামিয়ে, কাঁধে ফেলে শ্মশানের দিকে নীরবে হাঁটতে লাগলেন। সেইসময় শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, সবসময় নিজেকে বিচার করতে সবাই পারে না। ধীরে-সুস্থে বসে নিজের মন যে কী চায় তা ঠিক বুঝতে পারে না। এক একজন লোক শত্রুকে শেষ করার জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করে, যেকোনো বিপদের ঝুঁকি নেয়— এই প্রসঙ্গে দুই ভাইয়ের কাহিনি বলছি। এই কাহিনি শুনতে শুনতে হাঁটলে তোমার পথচলার পরিশ্রম লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল—

নগেন ও গঙ্গাধর দুই ভাই। দু-জনেই চাষি। কিন্তু ওরা যেন আজন্ম পরস্পরের শত্রু। পরস্পরের প্রতি ওরা ঈর্ষাভাব পোষণ করত। মাঝে মাঝে ওদের একপক্ষের বিদ্বেষ বেড়ে গিয়ে ভয়ংকর আকার ধারণ করত। সেইদিনই ওরা যেন একজনকে শেষ করে অন্যজন জল খাবে।

একবার কিছু পশু পাহাড়ের উপর চরে নীচে নেমে আসছিল। নামতে নামতে নগেনের ক্ষেতে কয়েকটা ঢুকে পড়েছিল। এই ঘটনা ঘটেছিল গঙ্গাধরের চোখের সামনে। সে মনে মনে খুব খুশি হয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে রাখাল ছুটতে ছুটতে এসে ওই পশুগুলোকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল। ব্যাপারটা শুনেই নগেন রাখালটিকে ধরে মারল। ওর মারার পর গঙ্গাধর গ্রামবাসীকে বলল, 'আমাদের বয়সি লোক যদি ওইটুকু ছেলেকে মারে তবে লোকে কী বলবে? মূক পশু যদি কারও ক্ষেতে ঢুকে পড়ে তাহলে রাখাল কী করবে? ছেলেটার তো কোনো দোষ ছিল না। সে যে মুহূর্তে লক্ষ করেছে সেই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে পশুগুলোকে অন্যদিকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ও যদি ছুটে না আসত তাহলে তো ক্ষেত সাবাড় হয়ে যেত। রাখাল ছেলেটা নেহাত গরিব মানুষ, ওর হয়ে দু-চার কথা বলতে কেউ নেই তাই ওকে ধরে নগেন মেরে দিল। যার কেউ নেই তার

ভগবান আছে। একদিন না একদিন এর ফল অবশ্যই ভোগ করতেই হবে।'

নগেন জানতে পারল যে তার ভাই গঙ্গাধর তার বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের কাছে প্রচার করেছে। শুনেই সে তার উপর ভীষণ রেগে গেল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে গাড়ি নামছিল। হঠাৎ এক বলদের পা হড়কে গেল। সে পড়ে গেল। গঙ্গাধর ওখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে লোকজনকে ডাকতে লাগল। সবাই জানতে পারল বলদ চোট পেয়েছে।

এই খবর শুনে নগেন খুব খুশি হল। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। ডেকে ডেকে যাকে সামনে পেল তাকেই বলল, 'পাপ ঢাকা থাকে না। পাপীদের ফলভোগ করতেই হয়। যতই হোক যারা মিথ্যে কথা বলে তাদের যেকোনোভাবে ভগবান শাস্তি দেন। তাদের অহংকার চূর্ণ করাই ভগবানের কাজ।'

নগেন এই কথা প্রচার করেছে শুনে গঙ্গাধর তেলে-বেগুনে চটে গেল।

নগেন এবং গঙ্গাধরের বউরা দুই ভাইয়ের মধ্যেকার অবস্থা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল। এমনিতেই জায়েদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক থাকে না। তার ওপর দুই ভাইয়ের অবস্থা দেখে ওরা পরস্পরের বিরুদ্ধে বিষ ওগরাতে লাগল। এর কথা ওকে লাগাত আবার ওর কথা একে লাগাত।

একবার গঙ্গাধরের স্ত্রী একটা হার গড়িয়ে, গলায় পরে গাঁয়ের মেয়েদের ডেকে ডেকে বলতে লাগল, 'টাকা থাকলেই গহনা পরার ভাগ্য সকলের থাকে না। যার ভাগ্যে ভোগ করার আছে সেই ভোগ করতে পারে।'

গঙ্গাধরের স্ত্রীর কথা মুখে মুখে ঘুরে নগেনের স্ত্রীর কানে এল। কানে যত কথা এল সেই কথাগুলো আরও বাড়িয়ে নগেনকে সে বলল, 'আমাদের কীসের অভাব? তবু আমাকে দেখে মনে হবে ভিখিরির ঘরের বউ। তোমার যদি একটু মানসম্মান থাকে তাহলে আমার জন্যে দু-একদিনের মধ্যে ওর চেয়ে ভালো একটা হার গড়িয়ে দেবে। আমি কীসের জন্য অন্যের কাছে খাটো হতে যাব?'

নগেন স্ত্রীর কথায় উত্তেজিত হয়ে নিজের স্ত্রীর জন্য আরও দামি গহনা গড়িয়ে দিল। নগেনের স্ত্রী গহনা পরে গাঁয়ের মেয়েদের বলল, 'গহনা থাকলেই যে বের করতে হবে তার কী মানে আছে? সবাই তো ভালো চোখে দেখে না। আর দেখে না বলেই ভালো জিনিসও পরি না।' এই কথা ঘুরতে ঘুরতে গঙ্গাধরের স্ত্রীর কানে গেল। সে শুনে চটে গিয়ে যাকে পেল তাকেই বলল, 'যে যাই ইচ্ছে পরুক, আমার চোখ টাটাবে কেন? আমি ভালো চোখে দেখব না কেন? ভালো জিনিস সবাই ভালো চোখে দেখে। তবে খারাপ জিনিস পরে কেউ যদি ভালো বলে প্রচার করতে চায় তাহলে আমি নিরুপায়। আর যাই হোক নিজের ঢাক নিজে অত বেশি পেটানো উচিত নয়।'

এ ধরনের ছোটোখাটো খোঁচাখুঁচি লেগেই থাকত। কোনো পরিস্থিতি এক জায়গায় থাকতে পারে না। তাই ছোটো ঝগড়া বাড়তে বাড়তে একদিন ভয়ংকর রূপ ধারণ করল। দুই জায়ে মিলে প্রকাশ্যে গালাগালি ও চুলোচুলি করল। ওদিকে ভাইরাও চুপচাপ বসে রইল না। তারাও প্রকাশ্যে মারামারি শুরু করে দিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে টানা কয়েক দিন বৃষ্টি হল। গঙ্গাধরের বাড়ির দক্ষিণ দিকের দেওয়াল পড়ে গেল। গঙ্গাধর উঠে ঘরে যাতে জল না-পড়ে তার ব্যবস্থা করছিল। এমন সময় সারা আকাশ আলোকিত হয়ে উঠল বিদ্যুতের আলোয়। পরক্ষণেই শব্দ হল।

বাড়ির ভেতর থেকে গঙ্গাধরের স্ত্রী চিৎকার করে স্বামীকে ডাকল। কিন্তু স্বামীর সাড়া পেল না। সে তৎক্ষণাৎ পাশের বাড়িতে ঢুকে নগেনের বউকে জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করে উঠল, 'দিদি, তোমার ঠাকুরপোকে বাঁচাও!'

কিছুক্ষণের জন্য নগেনের বউ থতমত খেয়ে গেল। পরক্ষণেই সে নগেনকে বলল, 'দেখছ কী? তাড়াতাড়ি আলো নিয়ে গিয়ে দেখো তোমার ভাইয়ের কী হয়েছে!'

তারপর তিন জনে মিলে আলো নিয়ে ঘটনার স্থলে এল। গঙ্গাধর অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। নগেন তাকে তুলে নিয়ে, নিজের ঘরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিল। সেই রাত্রির অন্ধকারে নগেন বৈদ্যকে ডেকে আনতে গেল। বৈদ্য এসে ওষুধ দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে গঙ্গাধরের জ্ঞান ফিরল।

এই ঘটনার পর প্রতিবেশীদের মনে কৌতূহল জাগল, ওদের সম্পর্ক কোনদিকে গড়ায়। কিন্তু তারপর অনেকদিন কেটে গেল। প্রতিবেশীরা আর ওদের ঝগড়া শোনেনি। ওরা যে প্রত্যাশা করেছিল বরং তাই ঘটল। গঙ্গাধরের বউ পাড়ার লোকজনকে বলতে লাগল, 'সেদিন রাত্রে ওর দাদা চেষ্টা না করলে আমার সিঁথির সিঁদুর মুছে যেত।' এই কথাই সে জনে জনে ধরে ধরে বলতে লাগল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, ওই দুই ভাইয়ের মধ্যে শেষপর্যন্ত কী সম্পর্ক ছিল? আত্মীয়তা না শত্রুতা? আগে তো একের ক্ষতি হলে অন্যে খুশি হত। সেবারে ভাইয়ের বিপদে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নগেন ছুটে গেল কেন? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এই প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'মান-অভিমান, বিদ্বেষ মানুষের মধ্যে থাকে। সম্পর্ক থাকলেই এগুলোও থাকবে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি যদি নির্লিপ্ত থাকে তাহলে কেউ কারও প্রতি টান অনুভব করে না। অনেক সময় ভালোবাসার উৎস থেকে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। সেই ঝড়বৃষ্টির রাত্রে যদি ছোটো ভাই মরে যেত তাহলে নগেন তার ভাইকে চিরদিনের মতো হারাত। সেইজন্য জীবন-মৃত্যুর চরম মুহূর্তে ছোটো ভাইকে বাঁচানোর জন্য ছুটে গেল। ক্রোধের চেয়ে ভালোবাসার শক্তি অনেক বেশি। যে উপকৃত হয় সে ভুলে গেলেও যে উপকার করে সে কিন্তু ভুলতে পারে না।'

রাজার মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৪৮. জাদুর আরশি

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে গিয়ে, গাছ থেকে শব নামিয়ে, কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, অলৌকিক শক্তির অধিকারী হলে অনেক লাভ হয় বলে অনেকের ধারণা; কিন্তু অলৌকিক শক্তি অর্জন করার ফলে অনেক সময় ক্ষতিও হয়। আমার বক্তব্য যে সঠিক তার প্রমাণ স্বরূপ আমি তোমাকে বজ্রগিরির রাজা অমরদীপের কাহিনি শোনাচ্ছি। এই কাহিনি শুনতে শুনতে হাঁটলে তোমার পথ চলার পরিশ্রম লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল—

বজ্রগিরির রাজার ইচ্ছা ছিল সুষ্ঠুভাবে দেশ শাসন করা। রাজা হিসেবে তার নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুক— এটাই ছিল তার সুপ্ত বাসনা। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও দেশ শাসন করার মতো যোগ্যতা এবং সামর্থ তার ছিল না। সে যেকোনো সাধু সন্ন্যাসীর দেখা পেলে তাকে মনের কথা বলত, কিন্তু সাধু সন্ন্যাসী, অথবা যোগী তার তেমন কোনো উপায় বলে দিতে পারল না।

এইভাবে অনেককাল পরে একটা সাধু রাজা অমরদীপের কাছে এসে তার কথা শুনে, তার ইচ্ছা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে জানিয়ে একটি আরশি তার হাতে দিয়ে বলল, 'মহারাজ, এই আরশির অলৌকিক ক্ষমতা আছে। আপনার অধীনে যারা কাজ করে তাদের উপর এই আরশি নজর রাখবে। আপনি যখন যাকে ইচ্ছা তখন তাকেই এই আরশিতে দেখতে পাবেন। শুধু আপনি তাকে স্মরণ করবেন এবং আরশির দিকে তাকাবেন তাহলেই তাকে দেখতে পাবেন। যাকে যে দায়িত্ব দিলেন সে ঠিকমতো সেই কাজ করছে কিনা তা আপনি পরিষ্কার দেখতে পাবেন। শুধু তাই নয়, আপনি ইচ্ছা করলে সে কী ভাবছে তাও আরশিতে তার মুখ দেখে বুঝতে পারবেন।'

রাজা অমরদীপ ভেবেছিল ওই আরশির সাহায্যে সারাদেশ সুষ্ঠুভাবে শাসন

করতে পারবে। গোপন জায়গায় ওই আরশিটা রেখে শাসন কাজ চালাতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ নির্ভরতা এসে গেল ওই আরশির ওপর। রাজা একটুও ভাবত না, এমনকী মন্ত্রীদের সঙ্গে কোনো বিষয় পরামর্শ করাও বন্ধ করে দিল। কারও কথা বিশ্বাস করার তার প্রয়োজন হত না। আরশিতে দেখে রাজা যা বুঝত তাই করত।

রাজার এই নতুন ধরনের আচরণ মন্ত্রী সেনাপতি-সহ প্রত্যেকে লক্ষ করল, কিন্তু কারণটা যে কী তা কেউ বুঝতে পারল না। রাজা নিজেই যা ভাবত তা মন্ত্রী এবং অন্যান্যদের করতে বলত। অন্যদের মতামত কী তা আরশি দেখে রাজা নিজেই বুঝতে পারত। রাজার পরিকল্পনা যার পছন্দ হত না তার প্রতি কী করা উচিত তা রাজা ঠিক করে ফেলত।

রাজা অমরদীপের প্রধানমন্ত্রীর নাম ছিল বিক্রমসেন। একদিন আরশিতে রাজা দেখতে পেল বিক্রমসেন তার প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করছে। রাজার কোনো কাজ তার পছন্দ হচ্ছে না। রাজা তৎক্ষণাৎ বিক্রমসেনকে কারাগারে নিক্ষেপ করল। এই ঘটনার পর দেখা গেল বহু লোক রাজাকে মনে মনে পছন্দ করছে না। রাজার কাজকর্ম বহু প্রজার ভালো লাগছে না। দেখতে দেখতে, কিছুদিনের মধ্যেই বহু গণ্যমান্য লোককে রাজা কারাগারে নিক্ষেপ করল।

বহুলোক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় সারাদেশ জুড়ে অশান্তি দেখা দিল। সারা দেশে শান্তি স্থাপনের জন্য রাজা সেনাপতির উপর ভার দেওয়ার কথা

ভাবল। ভাবতে ভাবতে সে এই মুহূর্তে সেনাপতি কী ভাবছে, কী করছে, তা জানার জন্য আরশির দিকে তাকাল। রাজা জানতে পারল, সেনাপতি ভাবছে কীভাবে রাজাকে বিব্রত করে, তাকে সিংহাসন থেকে ফেলে দেওয়া যায়।

সেনাপতি এই ধরনের চিন্তা করছে জেনে রাজা তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করল। প্রধানমন্ত্রী এবং সেনাপতি-সহ সারা দেশ জুড়ে এতগুলো লোক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে প্রজারা ভাবল রাজার মতিভ্রম ঘটেছে। ওই রাজাকে দিয়ে আর যে দেশ শাসন করা সম্ভব নয়, সে ব্যাপারে কারও সন্দেহ রইল না।

এই অবস্থায় অমরদীপ ভাবল, ছেলের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল, ছেলের সঙ্গে পরামর্শ করার আগে ছেলে তার সম্পর্কে কী ভাবছে তা জানার। সেই আরশিতে রাজা দেখল, তার ছেলে ভাবছে অন্য কাউকে দিয়ে তার বাবাকে হত্যা করাবে অথবা বাপকে কারাগারে নিক্ষেপ করে নিজেই রাজা হবে।

আরশির মাধ্যমে এই ব্যাপারটা জানতে পেরে রাজা ভাবল, 'আমার ছেলেই যখন পছন্দ করছে না তখন আমি গোটা দেশ শাসন করব কী করে?' রাজা তৎক্ষণাৎ ছেলেকে ডেকে বলল, 'বাবা কান্তিদীপ, আমার আর এক মুহূর্ত সিংহাসনে বসার ইচ্ছা নেই। আগামী কাল থেকে তুমিই হবে এই দেশের রাজা। আমি বনে তপস্যা করতে চলে যাব।' বলে ছেলেকে সিংহাসনে বসানোর সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন সেরে ফেলে রাজা অমরদীপ ওই আরশিটা ভেঙে ফেলল।

পরেরদিন রাজা কান্তিদীপ সিংহাসনে বসল আর অমরদীপ গেরুয়া পোশাক পরে তপস্যা করতে বনে চলে গেল। এই পরিবর্তনের ফলে সমস্ত বন্দি মুক্তি পেল। সারা দেশের প্রজারা খুশি হল। রাজা যে বনে চলে গেল সে ব্যাপারে একজনেরও দুঃখ হল না।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, অমন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন আরশি পেয়েও রাজা অমরদীপ কেন দেশ শাসনের কাজে ব্যর্থ হল? দোষ কি আরশির না রাজার? রাজা বনে গেল। না-হয় ভালোই করল, কিন্তু আরশিটা তো ছেলেকে দিয়ে যেতে পারত? ছেলে ওই আরশিটা কীভাবে ব্যবহার করে তা জানার কৌতূহল কি ছিল না অমরদীপের? —এই প্রশ্নগুলোর জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না-দাও, তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'ওই আরশিটা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন হলেও দেশ শাসনের পক্ষে উপযুক্ত আদর্শ বস্তু সেটা নয়। প্রজারা নানারকম

চিন্তা করতে পারে। যে যখন রাজার বিরুদ্ধে চিন্তা করল তাকে তখনই কারাগারে নিক্ষেপ করা আদর্শ রাজার কাজ নয়। প্রত্যেকের চিন্তাধারা ভিন্ন ধরনের থাকতে পারে। সবাই বেশিরভাগ সময় নিজের কথাই ভাবে আর সব রাজাকেই প্রধানমন্ত্রী সেনাপতি-সহ বহু রাজকর্মচারীর উপর নির্ভর করতে হয়। একজন রাজার বিরুদ্ধে ভাবলেই সে তেমন কিছু করতে পারে না। চিন্তাভাবনা এবং কাজের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে। কেউ কিছুক্ষণের জন্য বিরুদ্ধে ভাবতে পারে। তাই বলে তাকে চিরশত্রু ভেবে কারাগারে নিক্ষেপ করা উচিত নয়। আরশির জন্য রাজার সব থেকে বড়ো ভুল হল এটাই। আর ছোটো ভুল হল আরশির উপর রাজার নির্ভরতা। এই নির্ভরতার ফলে রাজা একটুও ভাবতেন না। মন্ত্রী সেনাপতি অথবা কারও সঙ্গে পরামর্শ করতেন না। প্রাচীন কালে রাজাদের একটা মহৎ গুণ ছিল, ছদ্মবেশে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে নিজের চোখে দেখে আসা। প্রধানমন্ত্রী, গুপ্তচর, দূত এদের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের খবর সংগ্রহ করা সত্ত্বেও রাজা বেরিয়ে পড়তেন ছদ্মবেশে, কিন্তু এই রাজা ওই পদ্ধতি গ্রহণ করলেন না। সম্পূর্ণরূপে আরশির উপর নির্ভর করে খেয়ালখুশিমতো যাকে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। পরিশেষে যখন বুঝলেন তখন তিনি আরশি ছেলেকে না-দিয়ে, যাওয়ার আগে নিজের হাতে ভেঙে ফেললেন।’

রাজার মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৪৯. ধর্মের পথ

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে গিয়ে, গাছ থেকে শব নামিয়ে, কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি যে কেন, কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এত পরিশ্রম করছ আমি তা জানি না। তবে একটা কথা মনে রেখো, শ্রেষ্ঠ কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রেষ্ঠ পন্থাই গ্রহণ করতে হয়। তা যদি না-হয়, আঁকাবাঁকা পথে মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করা যাবে না। সেটা ধর্মবিরুদ্ধ। আমার কথা যে সত্য তা প্রমাণ করার জন্য উদাহরণ হিসেবে আমি ধর্মনন্দন যোগীর কাহিনি বলছি। শুনলে তোমার পথচলার পরিশ্রম লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল—

প্রাচীন কালে শিলাময় গ্রামে ধর্মনন্দন নামে এক নামকরা যোগী ছিল। সে বহু স্থান ঘুরে দেশবাসীর কাছ থেকে অনেক অর্থ সংগ্রহ করে একটি বিদ্যায়তন স্থাপন করল। সেই বিদ্যায়তনে বেদ এবং শাস্ত্র পড়ানো হত। সঙ্গে সঙ্গে কার্যকরী শিক্ষাও শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। এই দুই ধরনের শিক্ষার সুযোগ থাকায় বহু ছাত্র সেই বিদ্যায়তনে ভরতি হল।

কিছুকালের মধ্যেই ওই বিদ্যায়তনের নাম সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। সারা দেশ থেকে আরও বেশি করে চাঁদা সংগৃহীত হল। লোকে নিজে থেকে এগিয়ে এসে সাগ্রহে চাঁদা দিত। এমনকী রাজার কাছ থেকেও ওই বিদ্যায়তনের জন্য সাহায্য সংগ্রহ করতে ধর্মনন্দন রাজার কাছে গেল।

রাজা ধর্মনন্দনের মুখে ওই বিদ্যালয় সম্পর্কে সমস্ত শুনে বলল, 'এতকাল আমার সাহায্য ছাড়াই ওই বিদ্যায়তন চলেছে। এখন এমন কোন ঘটনা ঘটে গেল যার জন্য আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে? সত্যি সত্যি যদি শিক্ষার প্রসার ওই বিদ্যালয়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে তাহলে অর্থের টান পড়ল কেন? এসব বিষয় আমাকে ভাবতে হবে।'

আসলে বিদ্যায়তনের জন্য প্রথম প্রথম অনেক টাকা সংগ্রহ করতে পারলেও শেষের দিকে তার পক্ষে আর অত টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অথচ ধর্মনন্দনের উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যায়তনকে আরও উন্নত করা।

এই অবস্থায় ভীম নামে একজন এসে ধর্মনন্দনকে বলল, 'শুনলাম আপনি বিদ্যায়তন চালাতে না-পেরে বন্ধ করে দেওয়ায় কথা ভাবছেন। আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, এই বিদ্যায়তনের খরচ এবার থেকে আমি দেব।'

ভীমের কথা শুনে ধর্মনন্দন খুব খুশি হয়ে সকৃতজ্ঞ চিত্তে বলল, 'আপনার দান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরা গ্রহণ করব। আপনি যে কী করেন, তা যদি একটু জানান, তাহলে আমার ভালো লাগত।'

'দেখুন ধর্মনন্দন যোগীমহাশয়, আমি যে কী করি তা আপনাকে বলে কী লাভ? আমি আপনার কাজে খুশি হয়ে সাহায্য করে যাব মাসে মাসে।' ভীম বলল।

তারপর থেকে প্রত্যেক মাসে ভীমের কাছ থেকে ধর্মনন্দন সাহায্য পেত। খোঁজখবর নিয়ে ধর্মনন্দন জানতে পারল ভীম ওই অঞ্চলে একজন নামকরা দাতা।

এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হল। হঠাৎ একদিন ভীম সম্পর্কে অদ্ভুত একটা কথা শুনতে পেল। ভীম শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রতিমাসে তাকে টাকা দেয়, সে নাকি ডাকাতদলের নামকরা সর্দার। বাইরের সবাই তাকে জানে মস্তবড়ো দাতা হিসেবে। কিন্তু সে যে লুণ্ঠন এবং ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ

করে সেই বিষয়ে আস্তে আস্তে জানা গেল। তার নামে রাজা ঘোষণা করেছিল ভীমকে ধরে দিলে পুরস্কার দেওয়া হবে।

এই ঘোষণার পর এক হপ্তার মধ্যে ধর্মনন্দন গোপনে রাজার সঙ্গে দেখা করে ভীমকে ধরিয়ে দিল। ধর্মনন্দন ভীমের মতো অত বড়ো ডাকাতসর্দারকে ধরিয়ে দেওয়ায় রাজা খুব খুশি হয়ে ধর্মনন্দনের বিদ্যায়তনের বিষয়ে নতুন করে ভাবল। কিছুদিনের মধ্যে ওই বিদ্যায়তনের সমস্ত খরচ বহন করার দায়িত্ব রাজা নিল। ফলে কিছুকালের মধ্যেই বিদ্যায়তনটি অনেক বড়ো হয়ে গেল। ধর্মনন্দনের আজীবনের স্বপ্ন সফল হল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, ধর্মনন্দনের কাজ সমর্থন করা যায়? তার আজীবনের স্বপ্ন ছিল একটি মস্তবড়ো বিদ্যায়তন গড়া। কিন্তু মাঝপথে সে যখন অভাবে পড়ল, তার বিদ্যায়তন উঠে যাওয়ার উপক্রম হল তখন রাজা এগিয়ে আসেনি, এগিয়ে এসেছিল ভীম। তার দেওয়া টাকায় ধর্মনন্দনের বিদ্যায়তন চলত। এহেন ভীমকে ধর্মনন্দন রাজার কাছে ধরিয়ে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকের মতো কাজ কি করেনি? যে ভীম ভালো কাজে আর্থিক সাহায্য দিয়ে যাচ্ছিল তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে সাহায্য করল ধর্মনন্দন! এই প্রশ্নগুলোর জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'ধর্মনন্দনের বিদ্যায়তনে শুধু যে বেদ পুরাণ পড়ানো হত তাই নয়, হাতেকলমেও শিক্ষা দেওয়া হত। আদর্শের পথে চলার জন্যই ধর্মনন্দন ডাকাতদলের সর্দারকে রাজার হাতে ধরিয়ে দিল। ভীমকে ধরিয়ে দেওয়া তার কাছে একটি পবিত্র কাজ মনে হয়েছিল। এই কাজকে সে ধর্মবিরোধী মনে করেনি।'

রাজার মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৫০. প্রতিজ্ঞা পরিত্যক্ত

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে, কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, এই মাঝরাত্রে, না ঘুমিয়ে গাছ থেকে শ্মশান পর্যন্ত আর কতকাল হাঁটবে? মানুষের জীবনে সবসময় প্রতিজ্ঞায় অটল থাকা চলে না। মাঝে মাঝে প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যাওয়া উচিত। নাগরাজের মতো যুবক একদিন প্রতিজ্ঞার বিষয় সরিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছিল। তার কাহিনি শোনালে আমার কথা পরিষ্কার বোঝা যাবে। পথ চলতে চলতে ওই কাহিনি শুনলে পরিশ্রম লাঘব হবে।' বলে বেতাল ওই যুবকের কাহিনি শুরু করল—

নাগরাজ ছিল ওই যুবকের নাম। নগরে ছিল তার চাকরি। তখনও তার বিয়ে হয়নি। ওর বাবা-মার ইচ্ছা ছিল জানাশোনা পরিবারের মেয়ে রত্নার সঙ্গে নাগরাজের বিয়ে দেওয়া। রত্না লেখাপড়া জানত না। পাড়াগাঁয়ে তার জন্ম। সেখানেই সে মানুষ হয়েছে। দেখতেও সে সুন্দর ছিল না। কীভাবে যেন নাগরাজের প্রতি রত্নার ভালোবাসা জেগেছিল। কিন্তু রত্নার প্রতি নাগরাজের আসক্তি ছিল না।

সেবারে পুজো উপলক্ষ্যে নাগরাজ নগর থেকে গ্রামে এল বাবা-মার কাছে। ওর বাড়িতে আসার দু-একদিন পরে কথা প্রসঙ্গে তার বাবা বলল, 'পুজোর পরেই ভাবছি, রত্নার সঙ্গে তোর বিয়ের পর্ব সেরে ফেলব। নগরে যাওয়ার সময় এবারে বউমাকে নিয়ে যাবি।'

বাপের এই কথা শুনেও না-শোনার মতো ঢং করে অন্য প্রসঙ্গে নাগরাজ চলে গেল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় নাগরাজ আমবাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বেড়ানোর সময় আকাশের মতিগতি সে লক্ষ করেনি। হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি নামল।

ছুটে গিয়ে একটি টালির ঘরের বারান্দায় দাঁড়াল। ছুটে ওই টালির ঘরে আসতে আসতে নাগরাজ সম্পূর্ণ ভিজে গিয়েছিল।

ওই ঘরের জানলা দিয়ে নাগরাজকে দেখে একটি বুড়ি বলল, 'হায়, হায়, তুমি যে বাবা ভিজে গেলে! ঘরের ভেতরে এসো। বৃষ্টি এত সহজে থামবে না। এসো বাবা ঘরে এসো।'

নাগরাজ ওই ঘরের ভেতর ঢুকতে-না-ঢুকতেই বুড়ি উঁচু গলায় বলল, 'সন্ধ্যা, একটা কাপড় নিয়ে আয় তো, বেচারা বৃষ্টির জলে একদম ভিজে গেছে।'

নাগরাজ মনে মনে বলল, 'সন্ধ্যা নামটা তো সুন্দর।' এমন সময় নূপুরের শব্দ শোনা গেল। সেই শব্দ দরজা পর্যন্ত এসে যেন থেমে গেল। বুড়ি এগিয়ে গিয়ে কাপড় নিল। ভেজা কাপড় ছেড়ে, বুড়ির দেওয়া কাপড় পরার পর নাগরাজ নিজের পরিচয় দিল এবং বুড়িরও পরিচয় পেল। বুড়ি ওই গ্রামে নতুন এসেছে। চাষ-আবাদের কাজ নিজের তত্ত্বাবধানেই করছে। সন্ধ্যা নাকি তার একমাত্র মেয়ে। সন্ধ্যার বাবা অনেকবছর আগে মারা গেছে। বুড়ি সংক্ষেপে এই কথাগুলো বলল।

বুড়ির বিষয় জানার পর নাগরাজের প্রবল ইচ্ছা জাগল সন্ধ্যাকে দেখার। কিছুক্ষণ পরে সন্ধ্যা গরম দুধ এনে যথারীতি দোরগোড়ায় দাঁড়াল। বুড়ি এগিয়ে গিয়ে ওই দুধ নিল। এবারেও নাগরাজ সন্ধ্যাকে দেখতে পেল না।

সেদিন সন্ধ্যাকে দেখা আর হল না। পরের দিন কোনো একটা কাজের অজুহাতে ওই কুটিরের কাছে নাগরাজ গেল। লক্ষ করল, বুড়ি জানালায় পর্দা লাগাচ্ছে। হাতে বোনা পর্দা। নাগরাজকে দেখেই হাসিমুখে ডেকে বুড়ি বলল, 'যখনই সময় পায়, সন্ধ্যা পর্দা বোনে।'

নাগরাজ অনেকক্ষণ বুড়ির সঙ্গে একথা সেকথা বলতে বলতে সময় কাটাল। নানা কথা হল। এক সময় হঠাৎ বুড়ি হাত বাড়িয়ে সন্ধ্যার হাত থেকে কিছু খাবার নিল। সন্ধ্যার নিজের হাতে তৈরি জলখাবার বুড়ি নাগরাজকে খেতে

দিল। জলখাবার সুস্বাদু ছিল। কিন্তু সেই বেলায়ও নাগরাজ সন্ধ্যাকে দেখতে পেল না।

পরের দিন নাগরাজ নিজের ক্ষেতের দু-টি ডালিম নিয়ে সন্ধ্যার বাড়িতে গেল। বাইরের দরজা যথারীতি বন্ধ ছিল। ঘরের ভেতর থেকে মধুর কণ্ঠে গান ভেসে আসছিল। নাগরাজ ঠায় দাঁড়িয়ে ওই গান শুনল। মন্দির থেকে সেই সময় বুড়ি ফিরছিল। নাগরাজ বুড়িকে দেখেনি।

বুড়ি কিন্তু নাগরাজকে দেখে নিল। 'কতক্ষণ এসেছ বাবা? মেয়ে আমার গান শুরু করলে সব ভুলে যায়। ঘরে আগুন লেগে গেলেও হুঁশ থাকে না। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো কে জানে!'

হঠাৎ দরজা খুলে গেল। কিন্তু এবারেও নাগরাজ সন্ধ্যাকে দেখতে পেল না। ডালিম দুটো বুড়ির হাতে দিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলে নাগরাজ ফিরে গেল।

সন্ধ্যার হাতে তৈরি খাবার খেয়ে, সন্ধ্যার হাঁটার সময় নূপুরের ধ্বনি শুনে, আড়ি পেতে তার গান শুনে নাগরাজের মনে হল একমাত্র সন্ধ্যাই তার উপযুক্ত স্ত্রী হতে পারে। সন্ধ্যা যদি দেখতে সুন্দর না হয় তবুও বিয়ে করার ইচ্ছা নাগরাজের মনে প্রবল হয়ে দেখা দিল। নাগরাজ ঠিক করল পরের দিন বুড়ির কাছে নিজের ইচ্ছাপ্রকাশ করবে, সন্ধ্যাকে বিয়ে করার প্রতিজ্ঞা মনে মনে সে করে ফেলল।

পরের দিন নাগরাজ সন্ধ্যার বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। বাড়ির কাছাকাছি যেতেই একটা ষাঁড় এসে হঠাৎ নাগরাজকে গুঁতিয়ে ফেলে চলে গেল।

নাগরাজ মাটিতে পড়ে গেল। তার হাতে চোট লাগল। আঘাত লাগার জায়গা থেকে রক্ত ঝরছিল। ঘটনাটা ঘটেছিল সন্ধ্যার বাড়ির সামনে। নাগরাজের আর্তনাদ শুনে বুড়ি বেরিয়ে এসে বলল, 'এ কী বাবা, এত রক্ত ঝরছে কেন?' বলে বুড়ি আঘাত-লাগা জায়গায় চেপে ধরে নাগরাজকে ঘরের ভেতরে আসতে বলল।

'আজকে আপনাকে একটা বিশেষ কথা বলার জন্য আসছিলাম। হঠাৎ একটা ষাঁড় গুঁতিয়ে পালিয়ে গেল।' নাগরাজ বলল।

বুড়ি নাগরাজকে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে বসিয়ে, চিৎকার করে ডাক দিল, 'সন্ধ্যা, একটু জল নিয়ে আয় তো।'

এতক্ষণ যা ঘটছিল সন্ধ্যা আড়ালে দাঁড়িয়ে তা দেখছিল। নাগরাজ যে আঘাত পেয়েছে তারজন্য তার চোখে-মুখে কোনো দয়া বা উদ্‌বেগের চিহ্ন দেখা গেল না। মা চিৎকার করে বলাতে সে একপাত্র জল নিয়ে নাগরাজ যেখানে বসেছিল সেখানে গেল।

এই প্রথম নাগরাজ সন্ধ্যাকে দেখল। অত সুন্দরী তরুণী নাগরাজ জীবনে দেখেনি। সন্ধ্যার আনা জল দিয়ে চোট লাগা জায়গায় ভালো করে ধুয়ে মুছে বুড়ি ওষুধ লাগিয়ে দিল। ওষুধ লাগিয়ে বুড়ি ভালো করে বেঁধে দিল। এতক্ষণ সন্ধ্যা ঠায় সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে ভেতরে চলে গেল। বুড়ি নাগরাজকে বলল, 'তুমি বিশষ কথা বলবে বলছিলে বাবা, বলো।'

তৎক্ষণাৎ নাগরাজ বুড়িকে বলল, 'তেমন কিছু নয়। কিছুদিনের মধ্যেই রত্নার সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে। ওদের পরিবারের সঙ্গে বহুকালের আলাপ। সন্ধ্যাকে নিয়ে আপনাকে কিন্তু বিয়ের দিন আসতেই হবে।' বলে নাগরাজ বাড়ি ফিরে গেল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'আচ্ছা রাজা, সন্ধ্যাকে দেখার আগে থেকেই নাগরাজ মনে মনে তাকে ভালোবেসে ফেলেছিল। তাকে বিয়ে করার প্রতিজ্ঞাও সে করে ফেলেছিল। কিন্তু সন্ধ্যাকে দেখার পর, হঠাৎ তার মত বদলে গেল কেন? অমন সুন্দরীকে বিয়ে না-করে সেই পাড়াগাঁয়ে, লেখাপড়া-না-জানা মেয়ে রত্নাকে বিয়ে করতে গেল কেন? এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না-দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এই কথার জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'নাগরাজের নিজের মত বদলে ফেলার পেছনে যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। পুরুষের মধ্যে যেমন পৌরুষ, আত্মাভিমান, ধৈর্য, সাহস থাকা চাই তেমনই নারীর মধ্যেও দয়া, মায়া, করুণা এবং সেবা করার ইচ্ছা থাকা চাই। নাগরাজের হাত থেকে রক্ত ঝরা দেখেও সন্ধ্যার চোখে-মুখে করুণা বা সহানুভূতির ছাপ ফুটে উঠল না। এই অবস্থা লক্ষ করে নাগরাজ, নিজের মত বদলে, ঠিকই করেছে।'

রাজা মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৫১. কার কত টান

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে গিয়ে, গাছ থেকে শব নামিয়ে, কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি কার জন্য এত পরিশ্রম করছ তা আমি জানি না। ভালোভাবে পরীক্ষায় ফেলে দেখা যাবে কেউ কারও জন্য ত্যাগ স্বীকার করে না। আমার বক্তব্যের প্রমাণ স্বরূপ আমি শ্রীপুর রাজার ছেলের কাহিনি বলছি। এই রাজকুমারের নাম কামপাল। এই কাহিনি শুনতে শুনতে হাঁটলে তোমার পথচলার পরিশ্রম লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল—

শ্রীপুর রাজার নাম ছিল গুনবর্ধন। তার ছেলে কামপাল অসুখে পড়ল। রাজবৈদ্যরা অনেক রকমের ওষুধ খাওয়াল। ওঝা ঝাড়ফুক করল। নানারকমের চেষ্টা চলল রাজকুমারকে সারিয়ে তোলার। কিন্তু দিন দিন রাজকুমার কামপাল আরও বেশি করে ক্ষীণ হতে লাগল।

সেই সময় এক বৌদ্ধ ভিক্ষু এমনভাবে রাজপ্রাসাদে এল যেন তাকে কেউ পাঠিয়েছে। রাজা তাকে সানন্দে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, 'হে মহাত্মা! আপনি আমার আকাঙ্ক্ষিত সময়ে এসেছেন। যেন স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ আপনাকে পাঠিয়েছেন। আমার ছেলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। অনুগ্রহ করে ওকে আপনি বাঁচান।'

'রাজা, আমি শুনলাম আপনার ছেলে মৃত্যুশয্যায় থাকায় রাজকর্মচারীরা রাজকার্য করছে না। ওরা করছে কী করছে না তা দেখাও আপনি প্রয়োজন বোধ করছেন না। এর ফলে সারা দেশের বহু কাজ স্তব্ধ হয়ে আছে। আপনার ছেলে বাঁচুক— এটা যেকোনো লোক কামনা করে। যেকোনো লোক কামনা করলে আপনার ছেলে যে বাঁচবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।' বলল বৌদ্ধ ভিক্ষু।

'কী বলছেন প্রভু, আমার দেশের প্রত্যেকেই তো কামনা করে আমার ছেলে বাঁচুক। তা সত্ত্বেও আমার ছেলে কেন সেরে উঠছে না।' রাজা বলল।

‘শুধু কামনা করলেই তো হবে না, যে কামনা করবে তাকে নিজের আয়ু দিতে হবে। শুধু তাই নয়, রাজকুমারকে বাঁচানোর জন্য নিজেকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।’ বৌদ্ধ ভিক্ষু বলল।

বৌদ্ধ ভিক্ষুর এই কথা শুনে কেউ কোনো কথা বলল না। সবাই চুপচাপ। একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছিল। বোঝা যাচ্ছিল যে প্রত্যেকেই ভাবছে।
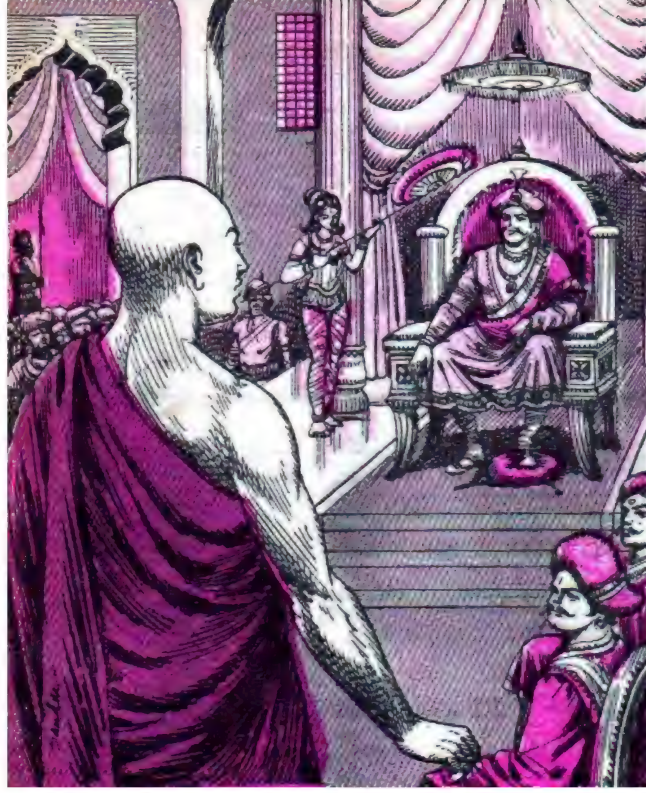
রাজা ভাবল, ‘সেধে কেউ কি মৃত্যুবরণ করতে চায়। এটা কি বিশ্বাস করতে পারা যায়? কেউ যদি এগিয়ে না আসে, আমি যদি আমার আয়ু দিই তাহলে কি ছেলে বেঁচে যাবে? আমার যদি আয়ু ছেলেকে দিই, তাহলে ছেলে কবে বড়ো হবে, কবে যে সিংহাসনে বসবে তা তো আমি জানতে পারব না। আমার মৃত্যুর পর আমার এই ছেলেকে কে দেখাশোনা করবে? আমার মৃত্যুর সঙ্গেসঙ্গে চক্রান্ত করে ওকে যদি কেউ মেরে ফেলে তাহলে তো সব শেষ। এই অবস্থায় ছেলেকে বাঁচানোর জন্য আমার মৃত্যুবরণ করা অনুচিত হবে।’

বৌদ্ধ ভিক্ষুর কথা শুনে রানি মনে মনে বলল, ‘আমার ছেলে যদি আমার আয়ু নিয়ে বেঁচে ওঠে তাহলেই ভালো হয়। কিন্তু আমি যে মৃত্যুবরণ করব সেটা কি ঠিক হবে। আমার মরার পরের দিনেই তো রাজা আর একটা বিয়ে করবে। আমার ছেলে কি বিমাতার কাছে ভালো ব্যবহার পাবে। রাজা নতুন রানির কথামতো চলতে গিয়ে আমার ছেলেকে কি অবহেলা করবে না। আমার সতীনের কি আর ছেলে হবে না। সে কি চেষ্টা করবে না তার ছেলেকে রাজা করার। নিজের ছেলেকে রাজা করার জন্য আমার ছেলেকে তো মেরে ফেলতে পারে। এই অবস্থায় আমার আয়ু আমার ছেলেকে দান করে আমার কী লাভ? আমি তো বুড়ি হয়ে যাইনি। বেঁচে থাকলে আমার আরও ছেলে হতে তো পারে।’
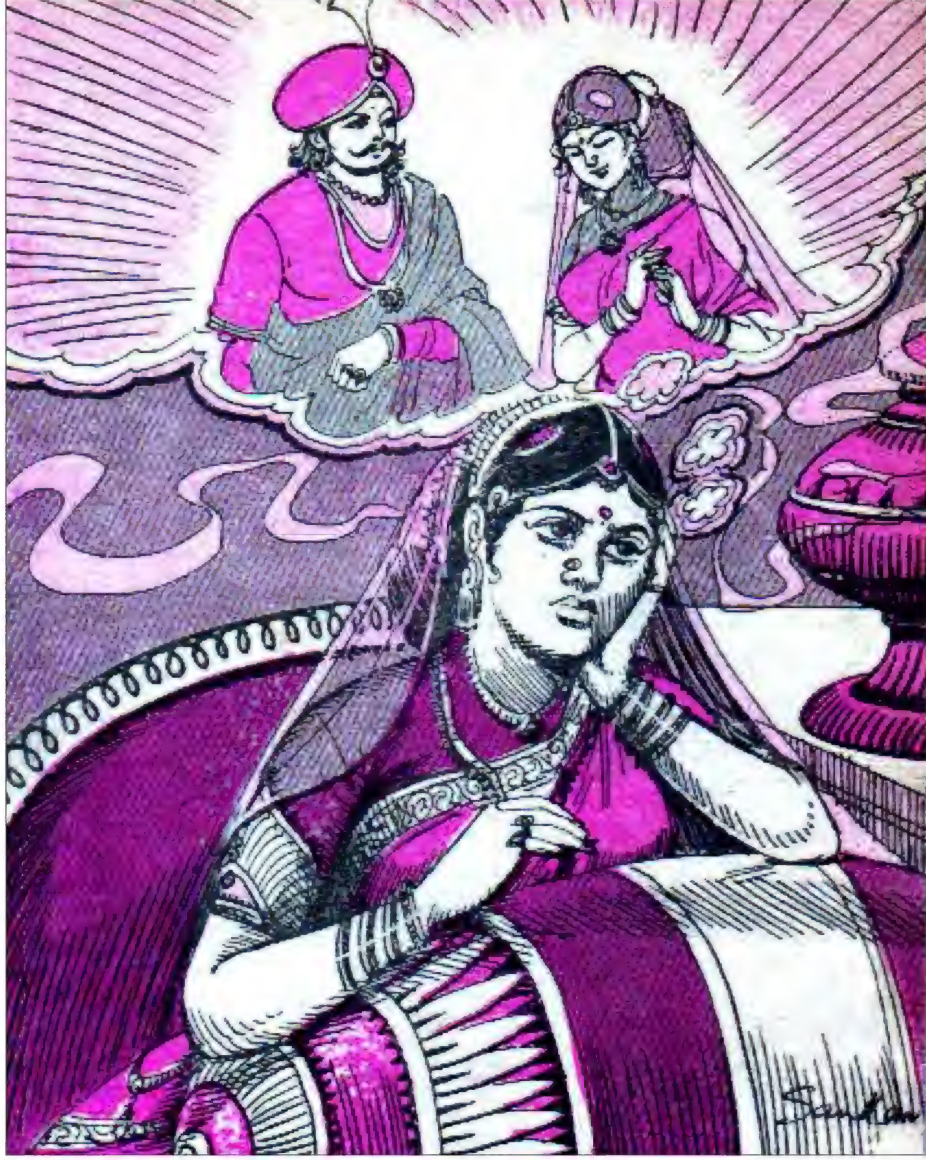
বৌদ্ধ ভিক্ষুর কথা শোনার পর মন্ত্রী ভাবল, 'আমাদের রাজার যা অবস্থা, আমি ছাড়া উনি তো এক পাও চলতে পারেন না। রাজার ছেলেকে বাঁচানোর জন্য আমি যে আমার আয়ু দান করে মৃত্যুবরণ করব কোন ভরসায়? আমি মারা যাওয়ার পরের দিনই তো দেশ আক্রান্ত হবে। তা ছাড়া, আমাদের দেশে তো বটেই; এমনকী বিদেশেও মন্ত্রী হিসেবে আমার কত নাম। দিনের পর দিন আমার নাম ছড়িয়ে পড়ছে। আমার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এই অবস্থায় সামান্য রাজকুমারের জন্য আমি কেন প্রাণ বিসর্জন দেব?'

রাজা, রানি, মন্ত্রীর মতো সেনাপতিও ভাবল, 'আমার মারা যাওয়ার
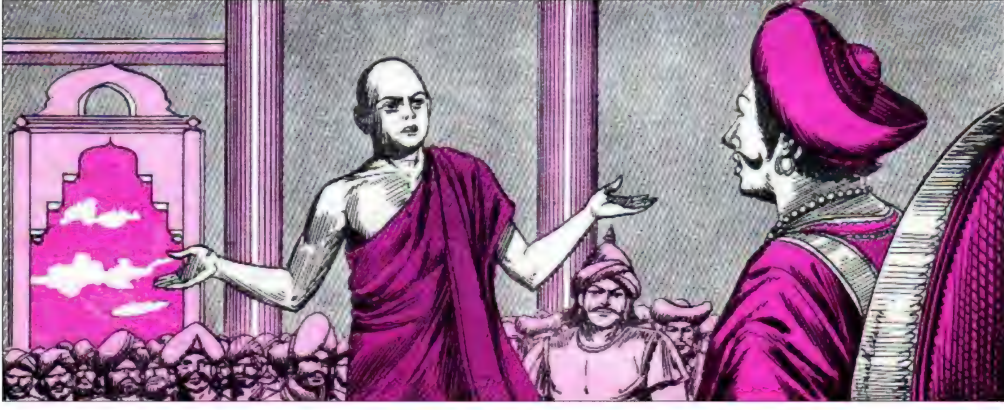
পরের দিনই তো দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। আমি চাই বীরের মতো মৃত্যুবরণ করতে।'

এ ছাড়া বড়ো বড়ো রাজকর্মচারী এমনভাবে দাঁড়িয়ে রইল যেন তারা খুব দুঃখ পেয়েছে।

বৌদ্ধ ভিক্ষু বলল, 'দেখলেন তো মহারাজ আপনার দেশে এমন একজনও নেই যে আপনার ছেলের জন্য প্রাণদান করতে পারে।' বলেই বৌদ্ধ ভিক্ষু উধাও হয়ে গেল।

এই কাহিনি শুনিয়ে বেতাল বলল, 'রাজা, এত বড়ো দেশে কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল রাজকুমার অসুস্থ হওয়ার ফলে। অন্যদের কথা ছেড়ে দিলাম অন্তত রাজকুমারের মা, বাবা, ওরাও কি পারল না নিজেদের আয়ু দান করতে। সবাই কি অভিনয় করে? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না-দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'যার প্রতি টান থাকার তার টান ঠিকই আছে। একজনের জন্য আর একজনের যে দুঃখ পাওয়া, ছোটোদের জন্য বড়োদের স্নেহ, বড়োদের জন্য ছোটোদের শ্রদ্ধা, ভক্তি সবই আছে। মানুষের জীবনে এসবের দাম অসীম। এগুলোই হল জীবনের অপরিহার্য গুণাবলি। তবে এসবই বিদ্যমান জীবিত মানুষের মধ্যে। তবে মানুষ নিজেকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। পরের জন্য জীবনদান করা বিশেষ আবেগের মুহূর্তেই ঘটে যেতে পারে। কিন্তু ঠান্ডা মাথায় বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে দেখতে গেলে ওইভাবে জীবনদানের কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। নিজের জীবনদান সম্পর্কে রাজা ও রানি যেভাবে ভেবেছিল তা কি অসঙ্গত?'

রাজা এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৫২. পরাজিত গন্ধর্ব

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে, কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি এই মাঝরাত্রে যেভাবে পরিশ্রম করছ তাতে আমার মনে তোমার প্রতি করুণা জাগছে। শারীরিক শক্তিতে মানুষ দেবতাদের সঙ্গে পারে না, কিন্তু বুদ্ধির বলে দেবতাদের হারিয়ে দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ জগতে কিছু আছে। এই ধরনের এক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কথা শোনাব। শুনতে শুনতে হাঁটতে থাকলে তোমার পথচলার পরিশ্রম লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল—

প্রগলভ নামে এক গন্ধর্ব মর্ত্যভূমিতে কী ঘটছে তা দেখতে দেখতে আকাশপথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ঘুরতে ঘুরতে সে একটি অরণ্যে একটি লোককে দেখতে পেল। লোকটার পরণে জরাজীর্ণ পোশাক। লোকটা রীতিমতো রুগ্‌ণ এবং শীর্ণ। সে গাছ থেকে ঝরে পড়ে যাওয়া ফল কুড়িয়ে খাচ্ছিল। আর মাঝে মাঝে কোনো হিংস্র জন্তুর আক্রমণের আশঙ্কায় উদ্‌বিগ্ন হয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল।

গন্ধর্ব ওই লোকটার দিকে তাকিয়ে, তার হাবভাব দেখে তার প্রতি দয়ার উদ্রেক হওয়ায় তাকে সমস্ত দিক থেকে সমৃদ্ধ করার কথা ভাবল। এই কথা ভেবে গন্ধর্ব আকাশ থেকে ঝট করে ওই লোকটার সামনে নামল। দরিদ্র লোকটা হকচকিয়ে গিয়ে বলল, 'প্রভু, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনি মানুষ নন। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে জানান আপনি কে?'

গন্ধর্ব হাসিমুখে বলল, 'আমি গন্ধর্বলোক থেকে আসছি। সুখ যে কাকে বলে তা গন্ধর্বলোকে থাকলে বোঝা যায় না। আমি জানি, তুমি আজন্ম দরিদ্র। আমার নাম প্রগলভ। আমার শক্তি অসীম।'

দরিদ্র লোকটা মুখ টিপে টিপে হেসে বলল, 'অসীম শক্তি থেকে

কী লাভ? আমি তো দেখিনি। তোমার সেই অসীম ক্ষমতা দিয়ে কার কতখানি উপকার করতে পারো দেখাও। নিজের চোখে দেখে বুঝব তুমি ক্ষমতাবান।'

গন্ধর্ব মুহূর্তে ভীষণ রেগে গিয়ে বলল, 'কী দেখতে চাও বলো? তুমি যা বলবে আমি যদি তা না করতে পারি তাহলে তোমার যা ইচ্ছে তাই বলো। আর যদি করতে পারি তাহলে কিন্তু তোমাকে কুকুরে রূপান্তরিত করব।'

দরিদ্র লোকটা অদূরের একটা গাছ দেখিয়ে বলল, 'ওই গাছটাকে হাতি করে ফেলতে পারো?'

গন্ধর্ব তৎক্ষণাৎ ওই গাছটার দিকে তর্জনী দেখিয়ে কী যেন বলল। পরক্ষণেই সেই গাছ হাতি হয়ে ডাকতে ডাকতে সেখান থেকে চলে গেল।

'বাঃ! চমৎকার তো!' বলতে বলতে দরিদ্র লোকটা হাততালি বাজাল। গন্ধর্ব বলল, 'আর কী করতে হবে বলো?'

দরিদ্র লোকটা গন্ধর্বকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। নিজের কুঁড়ে ঘরটা দেখিয়ে বলল, 'এই কুঁড়ে ঘরটাকে অট্টালিকায় রূপান্তরিত করতে পারো?' পরক্ষণেই গন্ধর্ব ওই কুঁড়ে ঘরটাকে অট্টালিকা করে ফেলল।

লোকটা নিজের নোলো ভাইটাকে দেখিয়ে বলল, 'এর পা নেই। একে পা দিয়ে দাও।' কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোটো ভাইয়ের পা গজিয়ে উঠল। লোকটা খুব খুশি হয়ে ছোটো ভাইয়ের পিঠ চাপড়াল।

এসব দেখে গন্ধর্ব খুব রেগে গিয়ে বলল, 'অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছি, তুমি একটার পর একটা বলে যাচ্ছ আর আমিও তাই করে যাচ্ছি। আমার সহ্যের একটা সীমা আছে। এমন হাবভাব করছ যেন বোকা লোককে ঠকিয়ে তুমি অনেক কিছু করে ফেলছ। আর যাই হোক আমি বোকা নই।' বলেই গন্ধর্ব ওই অট্টালিকাকে আবার কুঁড়ে আর ছোটো ভাইকে করে ফেলল নোলো।

দরিদ্র লোকটা অবাক হয়ে গেল।

তার দিকে রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে গন্ধর্ব বলল, 'তুমি যা বলেছিলে তাই করতে পেরেছি। এবার তোমাকে কুকুর করে আমি নিজের লোকে ফিরে যাচ্ছি।'

দরিদ্র লোকটা তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, 'আর একটি ইচ্ছা তুমি যদি পূরণ করো তাহলেই বুঝব, তোমার ক্ষমতা অসীম। সেটা যদি পেরে যাও তাহলে আমি কুকুর হতে রাজি আছি।'

'তাড়াতাড়ি বলো।' গন্ধর্ব বলল।

'ইচ্ছা আমার সামান্য! তোমার সমস্ত শক্তি আমাকে দিয়ে দাও। আমার দারিদ্র্য তুমি নিয়ে নাও।' লোকটা বলল।

গন্ধর্ব কিছুক্ষণ ভেবে কাঁপা গলায় বলল, 'শোনো, তুমি হেরে যাওনি। আমারই হার হয়েছে।' বলে ওই কুঁড়ে ঘরকে আবার অট্টালিকা ও লোকটার ছোটো ভাইয়ের পা ঠিক করে দিয়ে সেখান থেকে গন্ধর্ব চলে গেল।

বেতাল ওই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, আমার মনে একটি প্রশ্ন জেগেছে। শুধু এই একটি প্রশ্নের জবাব দিলেই চলবে। অত অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন গন্ধর্ব দরিদ্র লোকটার শেষ ইচ্ছার কথা শুনে গলা কাঁপিয়ে নিজের পরাজয় স্বীকার করল কেন? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'অত অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন গন্ধর্ব দরিদ্র লোকটার কাছে পরাজিত হওয়ার কারণ লোকটার বুদ্ধিবল। গন্ধর্ব ভেবেছিল লোকটা অর্থের দিক দিয়ে যেমন দরিদ্র তেমনি বুদ্ধির দিক থেকেও। গন্ধর্বের অহংকার ছিল সে সমস্ত দিক থেকে দরিদ্র লোকটার চেয়ে উন্নত। কিন্তু যে মুহূর্তে দরিদ্র লোকটা গন্ধর্ব হতে চাইল। সেই মুহূর্তে তার মনে ভয় ঢুকল, যদি একবার দরিদ্র লোকটা অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয় তাহলে সে গন্ধর্বকেই কুকুর করে ফেলবে। সেইজন্যেই দরিদ্র লোকটার গোড়ার দিকের ইচ্ছেগুলো পূরণ করে ভয়ে ফিরে গেল।'

রাজা মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৫৩. আদর্শ পুরুষ

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছ থেকে শব নামিয়ে, কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, সৎকাজ করে জগতে আদর্শ পুরুষ হিসেবে অনেকেই চিহ্নিত হয়। কিন্তু আমি জানি অসৎ বা পাপকাজ করেও কিছু লোক আদর্শ হয়ে আছে। আমার কথার প্রমাণ স্বরূপ আমি রাজা গুণসিংহের কাহিনি শোনাব। এই কাহিনি শুনতে শুনতে হাঁটলে পথচলার পরিশ্রম লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল—

প্রাচীন কালে বিদর্ভের রাজা ছিল জয়সিংহ। জয়সিংহের ছিল দুই ছেলে। বড়োটির নাম বীরসিংহ আর ছোটোটির নাম ছিল গুণসিংহ। গুণসিংহের বাচ্চাবয়স থেকেই এমন সব ঝোঁক ছিল যাতে মনে হত সে রাজা হতে চায়। অল্পবয়স থেকেই দেশ শাসন কীভাবে করতে হবে, কোন অস্ত্র কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শিখেছিল। সে মন্ত্রী, মাণিক্যবর্মার কাছে রাজনীতি এবং সেনাধিপতি সুরসেনের কাছে অস্ত্রচালনা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে শিখেছিল। বীরসিংহ ছিল চরিত্রের দিক থেকে গুণসিংহের বিপরীত। সে আনন্দে সুখে দিন কাটাতে চায়। দেশ শাসনের কুটিল কৌশল তার ভালো লাগে না।

যথাসময়ে জয়সিংহ ঠিক করল বীরসিংহকে সিংহাসনে বসাবে। তারজন্য আয়োজন চলছিল। এসব লক্ষ করে গুণসিংহ মন্ত্রী এবং সেনাধিপতির সঙ্গে শলাপরামর্শ করল। তারপর যেদিন বীরসিংহকে অভিষিক্ত করার কথা তার আগের দিন রাত্রে গুণসিংহ নিজের বাবা এবং দাদাকে বন্দি করে কারাগারে নিক্ষেপ করল। তারপরের দিন নিজে সিংহাসনে বসল।

গুণসিংহ যখন অভিষিক্ত হওয়ার জন্য ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুযায়ী মন্ত্র উচ্চারণ করছিল সেইসময় মন্ত্রী মণিমুক্তোখচিত মুকুট এনে গুণসিংহের মাথায় পরিয়ে দিতে গেল।

'একী!' গুণসিংহ অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

'মহারাজ? কোটি কোটি টাকায় তৈরি এই মুকুট। বংশপরম্পরায় আপনার পূর্বপুরুষগণ এই মুকুট মাথায় দিয়ে আসছেন। আজ থেকে এই মুকুটের অধিকারী হলেন আপনি। আপনি অনুগ্রহ করে এই মুকুট মস্তকে ধারণ করুন।' মন্ত্রী বলল।

'মণিমুক্তোখচিত এত দামি মুকুট না পরলে কি দেশ শাসন করা যায় না?' গুণসিংহ বলল।

মন্ত্রী চোখ ছানাবড়া করে গুণসিংহের দিকে তাকিয়ে রইল। তার অবাক হওয়া দেখে গুণসিংহ আবার বলল, 'কাল থেকে রাজার ভোগের ব্যাপারে যে বিরাট খরচ হয় তা বন্ধ করে দিতে হবে। দেশের সাধারণ কর্মী যেমন নিজের খাওয়াপরার জন্য অর্থ পায় আমিও তেমনি সামান্য কিছু অর্থ নেব। রাজা হয়েছি বলে প্রজাদের অর্থ খেয়ালখুশি মতো খরচ করার অধিকার আমার নেই। এসব যখন ছিল তখন ছিল এখন আর এই অপচয় হতে দেব না।'

গুণসিংহের কথা শুনে মন্ত্রী-সহ সবাই অবাক হয়ে গেল। তারপর থেকে রাজকর্মচারীদের মতো রাজাও নির্দিষ্ট বেতন নিত এবং অনাড়ম্বর জীবনযাপন করত। প্রজাদের বিভিন্ন সমস্যা রাজা গুণসিংহ কান পেতে শুনত এবং প্রজাদের মঙ্গলের জন্য যথাসম্ভব বেশি খরচ করত। এইভাবে কিছুকালের মধ্যেই রাজা গুণসিংহ খুব নাম করেছিল।

বিদর্ভের পাশে ছিল বিরূপ দেশ। ওই দেশের রাজা ছিল চিত্রসেন। রাজা

চিত্রসেন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয়সেনকে সমস্তরকমের অস্ত্রবিদ্যা এবং রাজনীতি শিখিয়ে সিংহাসনে অভিষিক্ত করবে ঠিক করল। অভিষেকের আগে চিত্রসেন পুত্র বিজয়সেনকে বলল, 'তোমার পুঁথিগত বিদ্যা শেষ হয়েছে। রাজনীতি তুমি যা শিখেছ তা শুনে এবং পড়ে। রাজনীতি হল অভিজ্ঞতার বিষয়। তুমি কিছুকাল ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ো। বিভিন্ন দেশে ঘুরে তোমার চোখে যাকে আদর্শ পুরুষ মনে হবে তার কাছে থেকে কিছু শিখে নাও।'

বাবার কথামতো বিজয়সেন দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল। কোন দেশে কীভাবে শাসনকাজ চলছে তার খবর নিতে নিতে ভ্রমণ করতে লাগল। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে বিদর্ভদেশে এল। বিদর্ভদেশের শাসনকার্য সম্পর্কে সে যা শুনল তাতে অবাক হয়ে রাজা গুণসিংহের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করল।

বিজয়সেন কিছুকাল গুণসিংহের কাছে থেকে নিজের দেশে ফিরে গেল। তারপর তার রাজ্যাভিষেক পর্ব সম্পন্ন হল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, রাজ্যাভিষেকের আগে যে যুবরাজ বিজয়সেন বাপের কথায়, অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য দেশভ্রমণ করতে বেরুল সেই বিজয়সেন দাদা এবং বাপকে কারাগারে নিক্ষেপকারী গুণসিংহকে আদর্শ পুরুষ হিসেবে গ্রহণ করল। কী করে এটা সম্ভব হল? এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'গুণসিংহ সুখভোগের জন্য, বাবা ও দাদাকে বন্দি করে সিংহাসনে বসেননি। তিনি যেভাবে ভোগবিলাসের খরচ বন্ধ করে দিয়ে, নিজে সাধারণ রাজকর্মচারীর মতো জীবনযাপন করে দেশ শাসন করলেন তাতে তাঁকে আদর্শ রাজা না-বলে পারা যায় না। গুণসিংহ সিংহাসনে না বসে যদি তার দাদা সিংহাসনে বসত তাহলে আর চারজন রাজার মতো সেও ভোগবিলাসের মধ্যে ডুবে থাকত। যে রাজা নিজের জন্য অত্যন্ত কম খরচ করেন, প্রজাদের মঙ্গলের জন্য দু-হাতে খরচ করতে চান তাকেই তো আমরা আদর্শ রাজা মনে করি। বিজয়সেন সঠিক লোককে আদর্শ পুরুষ হিসেবে গ্রহণ করেছে।'

রাজা মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৫৪. পরিবর্তিত মানুষ

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে, কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, মানুষের মন ক্ষণে ক্ষণে কেন যে বদলায় সে-কথা ভাবতে গেলে আশ্চর্য লাগে। মানুষের মন কত যে গতিশীল আর কত বেশি পরিবর্তনশীল তা বোঝানোর জন্য উদাহরণস্বরূপ আমি বিক্রমবর্মা ও সমরসেনের কাহিনি বলব। আমার এই কাহিনি শুনতে শুনতে পথ চললে পথচলার পরিশ্রম লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল—

বিক্রমপুরী ও আনন্দপুরী নামে পাশাপাশি দুটো দেশ ছিল। অনন্তকাল ধরে এই দুটো দেশের মধ্যে শত্রুতা ছিল। দুই দেশের মধ্যে ছোটোখাটো বিরোধ বাড়তে বাড়তে যখন সীমা ছাড়িয়ে যেত তখন দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ লেগে যেত। যুদ্ধের ফলে উভয় দেশের বিষয়সম্পত্তি নষ্ট হত। উভয় দেশের অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হত। ফলে সমস্ত দিক থেকে উভয় দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হত। এত কিছু হওয়ার পরেও দেখা যেত কোনো দেশেরই জয় হত না।

আমি যে সময়ের কথা বলছি সেই সময়ে বিক্রমপুরীর রাজা ছিল বিক্রমবর্মা আর আনন্দপুরীর রাজা ছিল আনন্দবর্মা। আনন্দবর্মার মন্ত্রীর নাম ছিল ভদ্রপাল আর সেনাধিপতির নাম ছিল সমরসেন।

আনন্দবর্মা রাজা হয়েই প্রতিজ্ঞা করল, যেকোনোভাবে বিক্রমপুরী জয় করবে। মন্ত্রী ভদ্রপাল রাজার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে বলল, 'আপনার পূর্বপুরুষ যুগ যুগ ধরে যে কাজ পারেননি, আপনি যদি সেই কাজ করেন, যদি জয়ী হন তাহলে আমাদের দেশের ইতিহাসে আপনার নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।'

মন্ত্রী সমর্থন করলেও সেনাধিপতি সমরসেন কিন্তু রাজাকে সমর্থন করল না। সে রাজাকে বলল, 'মহারাজ, পাশাপাশি এই দুই দেশের মধ্যে অসংখ্য বার যুদ্ধ হয়েছে। বহু মানুষের জীবন নষ্ট হয়েছে। অঢেল ধনসম্পত্তি ধ্বংস

হয়েছে। কিন্তু একবারও কেউ কাউকে জয় করতে পারেনি। এখন আমার মনে হয় বিক্রমপুরীর সঙ্গে যুদ্ধের কথা চিন্তা না-করে ওই দেশের সঙ্গে স্থায়ী মৈত্রী কী করে গড়ে তোলা যায় তা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে সেটা উভয় দেশের পক্ষেই মঙ্গল হবে।'

সমরসেনের কথার গুরুত্ব রাজা বুঝল না। তার পরামর্শ কানে না-তুলে আনন্দবর্মা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বলল। অগত্যা সমরসেনকে সৈনিকদের শরীর মন যুদ্ধের জন্য গড়ে তোলার দিকে মন দিতে হল। সারা দেশে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মানসিকতা তৈরি করতে মন্ত্রী উঠে-পড়ে লাগল। শুধু পাশের দেশের বিরুদ্ধে প্রচার করলেই হয় না, সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদের কাছ থেকে অর্থও তুলতে হয়। এইভাবে সারা দেশে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকে। রাজধানীর চারদিকে পাহারার ব্যবস্থা আরও কঠোর হয়।

পাশের দেশে এইভাবে যখন যুদ্ধের আবহাওয়া তৈরি হয় তখন সেই খবর বিক্রমপুরীর রাজা বিক্রমবর্মার কাছেও আসে। বিক্রমবর্মা নিজে যে শুধু বীর ছিল তাই নয়, শাসক হিসেবেও সে ছিল দক্ষ এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। যেকোনো বিষয় সঠিকভাবে বিচার করার সূক্ষ্ম ক্ষমতা তার ছিল।

এদিকে আনন্দবর্মা গুপ্তচর পাঠিয়ে বিক্রমপুরের ভেতরের অবস্থা জানতে লাগল।

এইভাবে কিছুদিন কেটে গেল। নানাভাবে আনন্দবর্মা চেষ্টা করল যাতে বিক্রমবর্মা সসৈন্যে তার দেশ আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে। অতর্কিতে একদিন বিক্রমবর্মা আনন্দপুরী আক্রমণ করল। আনন্দবর্মা তার সৈনিকদের এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল। উভয় দেশের মধ্যে তীব্র যুদ্ধ বেধে গেল। আনন্দবর্মা জানতে পারল বিক্রমবর্মা নিজেই নেতৃত্ব দিয়ে সৈনিকদের পরিচালনা করছে। শুনেই আনন্দবর্মাও সৈন্য পরিচালনা করতে নিজে এগিয়ে এল। এতক্ষণ সেনাধিপতি যে কাজ করছিল সেই কাজ আনন্দবর্মা নিজেই করতে লাগল।

এই ঘটনার পরের দিন প্রতিপক্ষের বিষাক্ত তিরে বিদ্ধ হয়ে আনন্দবর্মার মৃত্যু ঘটল। আনন্দবর্মার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমরসেন সৈনিকদের নিয়ে ফিরে দুর্গের ভেতরে ওদের রেখে দরজা বন্ধ করে দিল।

আনন্দবর্মার কোনো ছেলে ছিল না। তাই এখন সিংহাসনে কাকে যে বসানো হবে সেই সমস্যা দেখা দিল। মন্ত্রী বলল, 'আমাদের রাজা যেহেতু মারা গেছে সেইহেতু আমাদের এই যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে বিক্রমবর্মার কাছে সন্ধিপত্র পাঠানো উচিত।'

মন্ত্রী ভদ্রপালের কথা সমর্থন না করে সমরসেন বলল, 'আমাদের দুর্গ
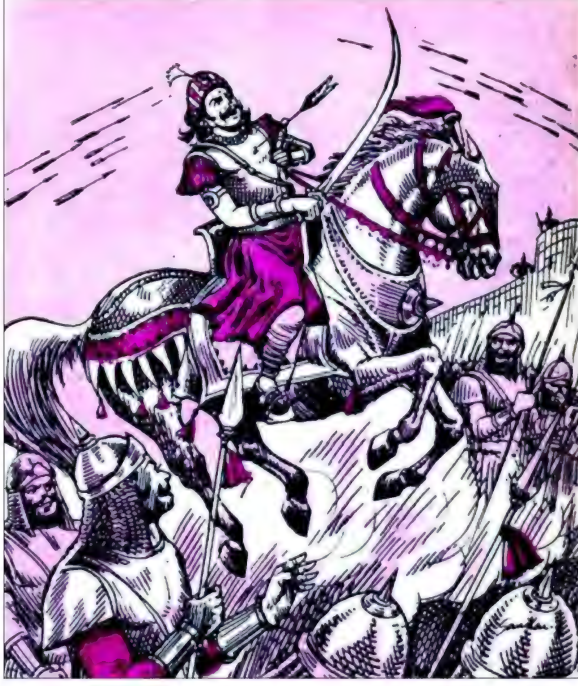
যথেষ্ট শক্তিশালী। খাদ্যও প্রচুর সুরক্ষিত আছে। এই দুর্গ থেকেই আমার যুদ্ধ করে যাব। যুদ্ধ চলতে চলতে এমন একটা সময় আসবে যখন বিক্রমবর্মা বুঝতে পারবে যে তার পক্ষে জয় করা সম্ভব নয় তখন স্বাভাবিকভাবেই সন্ধির প্রস্তাবের আদানপ্রদান হবে। তা না করে এখন যদি আমরা সন্ধির প্রস্তাব পাঠাই তাহলে কিন্তু আমাদের দেশের ওপর আমাদের অধিকার থাকবে না।'

বিক্রমবর্মা দুর্গ আক্রমণের চেষ্টা করে বুঝতে পারল কাজটা অত সহজ নয়। ফিরে যাবে কিনা ভাবছিল এমন সময় আনন্দপুরীর মন্ত্রী ভদ্রপালের নিজস্ব লোক বিক্রমবর্মার সঙ্গে দেখা করে কথা বলল।

আনন্দবর্মার মৃত্যুর পর সমরসেন যতটা উদ্যোগ নিয়ে বিক্রমবর্মার বিরুদ্ধে লড়তে চাইল ততটা উদ্যোগ আনন্দবর্মা বেঁচে থাকতে তার ছিল না। তাই মন্ত্রী ভাবল, 'সমরসেন হয়তো রাজা হতে চায়। সে যদি রাজা হয় আমাকে তো মন্ত্রীপদে রাখবে না। অপরপক্ষে আমি যদি বিক্রমবর্মাকে এখন সাহায্য করি তাহলে বিক্রমবর্মা নিশ্চয় রাজা হয়ে আমাকে মন্ত্রী করবে।' এই কথা ভেবে সে গোপনে বিক্রমবর্মাকে সাহায্য করল। ফলে তার সাহায্যে, একদিন মধ্যরাত্রে বিক্রমবর্মা দুর্গ আক্রমণ করে সমরসেন ও অন্য কয়েক জন বীর সৈনিককে বন্দি করে কারাগারে নিক্ষেপ করল ভদ্রপাল ভেবেছিল বিক্রমবর্মা প্রকাশ্যে সমরসেনকে ফাঁসি দেবে। কিন্তু তা হল না।

একদিন বিক্রমবর্মা কারাগার থেকে সমরসেনকে ডেকে পাঠিয়ে বলল, 'ভেবেছিলাম তোমাকে ফাঁসি দেব, কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা সুযোগ দিতে চাই। তুমি যদি সেই সুযোগ নাও তাহলে তোমার ফাঁসি হবে না। তুমি যদি আমার কাছে একটু অনুগত থাকো, আমার আনুগত্য স্বীকার করো, তাহলে তোমাকে সেনাধিপতি করব।'

'আমার ফাঁসি হয় হোক। আমি আপনার অধীনে সেনাপতির পদে থাকতে চাই না।' সমরসেন বলল।

'শেষবারের মতো আর একবার তোমাকে সুযোগ দিচ্ছি। ফাঁসির আগে তোমার যদি কিছু বলার থাকে বলো।' বিক্রমবর্মা বলল।

সমরসেন বুক টান করে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমাকে কিছু বলতে বলেছেন তারজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। অনন্তকাল ধরে বিক্রমপুরী ও আনন্দপুরীর মধ্যে যুদ্ধ চলে আসছে। ফলে অনেক ধনসম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে ও অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। এসব কিছু হচ্ছে মাত্র কয়েক জনের মূঢ়তার জন্য। এখন আনন্দপুরী আপনার হাতে। আমার প্রার্থনা, এই দেশের আর যাতে ক্ষয়ক্ষতি না-হয় আপনি তার চেষ্টা করুন।'

বিক্রমবর্মা সমরসেনের কথা শুনে নিজের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করল। সমরসেনকে ফাঁসি না-দিয়ে তাকে কারাগার থেকে মুক্ত করল। সমরসেনের বক্তব্য বিক্রমবর্মার খুব ভালো লাগল।

এদিকে ভদ্রপাল প্রতিমুহূর্ত অপেক্ষা করছিল বিক্রমবর্মা কখন তাকে ডাকবে, মন্ত্রীর পদ দেবে। কিন্তু বিক্রমবর্মা অনেকদিন পরেও আর তাকে ডাকল না। ভদ্রপালের কথা বিক্রমবর্মার মনে হল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিল।

বিক্রমবর্মা শাসক হিসেবে দক্ষ ছিল। তাই কিছুকালের মধ্যেই আনন্দপুরীর প্রজাদের মন জয় করতে পারল। সারা দেশে কিছু কিছু গঠনমূলক কাজ শুরু হয়ে গেল। এ-রকম একটা অবস্থায় রাজা বিক্রমবর্মার কাছে সমরসেন এসে বলল, 'মহারাজ, আপনার অধীনে, যেকোনো কাজে, আমি নিযুক্ত হতে চাই।'

বিক্রমবর্মা সমরসেনকে নিজের প্রধান পরামর্শদাতা পদে নিয়োগ করল আর ঘোষণা করে দিল যে রাজা যখন রাজধানীতে থাকবে না তখন তার কাজকর্ম সমরসেন দেখবে।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, বিক্রমবর্মা ও সমরসেনের ব্যাপারে আমার মনে অনেকগুলো প্রশ্ন জেগেছে। সমরসেন প্রথমে বিক্রমপুরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চায়নি। চেয়েছিল সন্ধি। তারপর যখন যুদ্ধ হল, আনন্দবর্মার মৃত্যু ঘটল, তখন সন্ধি করতে চাইল বিক্রমবর্মার সঙ্গে। আর একটা লক্ষ্যণীয় বিষয় সমরসেনকে বিক্রমবর্মা সেনাধিপতির পদ দিতে চাইল। সে নিল না। কিন্তু পরে তারই অধীনে যেকোনো পদে কাজ করতে চাইল সমরসেন। এদিকে বিক্রমবর্মা সমরসেনকে ফাঁসি দেবে ঠিক করেছিল। কিন্তু শেষের দিকে তাকেই প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে নিযুক্ত করল। বিক্রমবর্মার মনের গতিবিধির কথা বোঝা দায়! সে ভদ্রপালের সাহায্যে যে আনন্দপুরী জয় করল সেই ভদ্রপালকে সে দিব্যি ভুলে গেল। সমরসেন এবং বিক্রমবর্মার

কেন যে ঘন ঘন মনের পরিবর্তন হল, তা জানা সত্ত্বেও যদি আমাকে না বলো তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'চিন্তাধারার দিক থেকে বিক্রমবর্মা এবং সমরসেনের মনের গতিবিধি ঘন ঘন পরিবর্তন হয়নি। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ওরা যখন যা বলেছেন ঠিক কথাই বলেছেন। অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমরসেন প্রথমে যুদ্ধ করতে চায়নি। দেশে শান্তি থাকলে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয় দেশবাসী। বিক্রমবর্মা শত্রু হিসেবে সমরসেনকে ফাঁসি দিতে চেয়েছিল। তারপর যখন তাকে বুঝতে পারল তখন তাকে সেনাধিপতির পদ দিতে চাইল। কিন্তু তখন সমরসেন বিক্রমবর্মাকে বুঝতে পারেনি। কিছুকাল পরে কাজকর্ম দেখে, সমরসেন যখন দেখল যে দেশের উন্নতি হচ্ছে তখন কাজ করতে চাইল।'

রাজা মুখ খোলার সঙ্গেসঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।

৫৫. বুদ্ধিমান

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে গিয়ে, গাছ থেকে শব নামিয়ে, কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, 'রাজা, তুমি যে কী করে এত পরিশ্রম করছ তা জানি না। টাকাপয়সা, ধনসম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য অনেক রকমের ঝগড়া হয়ে থাকে। তার ফলে শত্রুতাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বুদ্ধিতে যে কে বড়ো এবং কে ছোটো— এই নিয়ে বিরোধ এবং শত্রুতার এক বিচিত্র কাহিনি আমি বলছি, মন দিয়ে শোনো। আমার এই কাহিনি শুনলে তোমার পথ চলার পরিশ্রম লাঘব হবে।' বলে বেতাল কাহিনি শুরু করল—

কোশল দেশের মাতঙ্গ নগরের খ্যাতি ছিল ব্যাবসাকেন্দ্র হিসেবে। সেই নগরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাবসাদারের নাম ছিল সুধাকর। প্রত্যেকেই বলাবলি করত যে ওর মতন বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী আর নেই। গোটা নগরের লোক ওর দোকান থেকেই সুগন্ধ দ্রব্য কিনত। বলতে গেলে সুগন্ধ জিনিসের সে একচেটিয়া ব্যাবসাদার ছিল।

এইভাবে তার ব্যাবসা চলছিল। কিছুকাল পরে সারঙ্গ নামে এক ব্যাবসাদার ওই নগরে এসে সুগন্ধি দ্রব্য বিক্রি করতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই তার ব্যাবসা বেশ জমে উঠল। তার ব্যাবসা যতই জমে উঠেছিল ততটাই ভাঁটা পড়ল সুধাকরের ব্যাবসায়। ভাঁটা পড়লেও সুধাকর কিন্তু সারঙ্গকে গুরুত্ব দিত না এবং তার বিক্রি যে কমে গেছে তারজন্য তার আক্ষেপও ছিল না। এমনকী তাকে দেখার আগ্রহও সুধাকরের মনে ছিল না।

প্রত্যেক বছর আরবদেশ থেকে ব্যাবসাদাররা এসে সুধাকরের কাছে সুগন্ধি দ্রব্যাদি কিনে নিয়ে যেত। তার কাছে কেনার ফলে আরবের লোক একসঙ্গে অনেকখানি জিনিস অল্প দামে পেয়ে যেত। সেই জিনিস ওরা নিজেদের দেশে বিক্রি করে অনেক লাভ করত।

এই আরবের খদ্দেরদের কাছে জিনিস বিক্রি করার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠল সারঙ্গ। সুধাকর যে জিনিস যত দামে বিক্রি করত, সারঙ্গ তার চেয়ে কম দামে বিক্রি করলে ওই খদ্দেরদের হাত করা যাবে ভাবল। এইভাবে পরিকল্পনা করে আরবের খদ্দেরদের অপেক্ষায় রইল সে।

একদিন এক বৃদ্ধ সারঙ্গের সঙ্গে দেখা করে বলল, 'দেখো বাবা, তোমার উপকারের জন্যই তোমাকে একটা উপদেশ দিচ্ছি। সুধাকর যে জিনিসের দাম যতটা রেখেছে তুমি কিন্তু তার চেয়ে কম দামে বিক্রি করো না। এর ফলে শুধু তুমিই যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাই নয়, তোমার ওই কাজে সুধাকরেরও ক্ষতি হবে। শেষ পর্যন্ত দেশেরও ক্ষতি হবে। আমি যতদূর জানি, সুধাকর ভালো লোক। তোমরা দু-জনে এক জায়গায় বসে, ভালোভাবে আলোচনা করে ঠিক করে নাও আরবের ব্যাবসাদারের কাছে কোন জিনিসটা কত দামে বিক্রি করবে। এর ফলে কিন্তু তোমরা দু-জনেই উপকৃত হবে। ফলে দেশেরও মঙ্গল হবে।'

সারঙ্গ হেসে বলল, 'তোমাকে কি সুধাকর পাঠিয়েছেন? কেন, উনি তো ব্যাবসার ক্ষেত্রে খুব বুদ্ধিমান লোক বলে শুনেছি। আমার বুদ্ধির কাছে উনি কি হেরে যাবার আশঙ্কা করছেন?'

বৃদ্ধ ওই কথায় উত্তেজিত না-হয়ে শান্ত গলায় বলল, 'তুমি একটা পাগল। একটা কথা মনে রেখো, ব্যাবসার ক্ষেত্রে সুধাকরের যতটা বুদ্ধি আছে তা অন্য কারোর নেই। এই বছর তোমার কাছে সস্তায় পেয়ে, আরবের লোক যদি জিনিসপত্র কেনে তা সত্ত্বেও লোকে সুধাকরকেই প্রশংসা করবে। এই নগরের যদি কেউ তোমার প্রশংসা করে তাহলে মনে রেখ সুধাকরই করবে। সুধাকর যেমন যোগ্যতার সঙ্গে নিজের ব্যাবসা বাড়াতে পারে তেমনই অন্যকে প্রশংসাও করতে পারে।'

সারঙ্গ ভালোভাবেই জানে, সুধাকরকে এই নগরের বিখ্যাত লোক প্রশংসা করে। সারঙ্গের নিজের ধারণা, সে খুব বুদ্ধিমান। তার বুদ্ধির কাছে অন্যদের

বুদ্ধির দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। একই ধরনের ব্যাবসা করে সুধাকরকে ছাড়িয়ে যাওয়াই হল সারঙ্গের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

অনেকক্ষণ বৃদ্ধের কথা শুনে সারঙ্গ বলল, 'আচ্ছা, সুধাকরের কাছে প্রশংসা পেতে হলে আমাকে কী করতে হবে?'

'সুধাকর যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন, সে পারে না এমন কাজও আছে। যে সেই কাজ করে সুধাকর তাকেই প্রশংসা করে।' বৃদ্ধ বলল।

একদিন সে সুধাকরের কাছে গিয়ে বলল, 'শুনেছি আপনি নাকি খুব বুদ্ধিমান। বুদ্ধিতে আপনার নাকি নাগাল পাওয়া যায় না। আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে আপনার এবং আমার মধ্যে কার বুদ্ধি যে বেশি সেটা পরীক্ষা করার। এখন আপনিই বলুন কোন কাজটা পারেন না। আপনার কথা শুনে আপনি যা পারেননি আমি তাই করব।'

সুধাকর সারঙ্গকে সাদরে বরণ করে বলল, 'আমি পারিনি এ-রকম কাজ তো অনেক আছে। আমি যেগুলো পারিনি সেগুলোর মধ্যে আপনি কিছু কাজ পারবেন। তবে আমিও পারব না, আপনিও পারবেন না এই ধরনের কাজ একটি আছে। সেই কাজ হল শ্রবন্তিনগরের মৃত্যগুপ্তের বাড়ি থেকে সবুজ হার নিয়ে আসা।'

'নিয়ে আসা মানে? কিনে, না চুরি করে?' সারঙ্গ প্রশ্ন করল।

'কোনোটাতেই এখন আমার আপত্তি নেই। আমি সেটা চাই, এই যা। ছলে, বলে, কৌশলে যেভাবে আনতে পারবেন, আনবেন।' সুধাকর বলল।

সারঙ্গ বেরিয়ে পড়ল সেই হারের সন্ধানে। টানা দু-দিন পায়ে হেঁটে শ্রবন্তিনগরে পৌঁছাল। সেখানে জনে জনে অনেকেই জিজ্ঞাসা করল, অনেক ব্যাবসাদারকেও জিজ্ঞেস করল। তবু মুত্যগুপ্তের সন্ধান কেউ দিতে পারল না। সারঙ্গ হতাশ হল। ফিরবে কিনা ভাবছে এমন সময় এক ব্যাবসাদার জানতে পারল সারঙ্গকে সুধাকর পাঠিয়েছে। এটা জানতে পেরে সেই ব্যাবসাদার সারঙ্গকে বলল, 'মুত্যগুপ্ত নামে একজন শিবমন্দিরের পাশের ঘরে থাকে। আমার ধারণা সে সুধাকরের বন্ধু।'

খবর পেয়েই সারঙ্গ মুত্যগুপ্তের বাড়ির সন্ধানে গেল। শিবমন্দিরের পাশেই ছিল মুত্যগুপ্ত। যেখানে সে ছিল সেটাকে বাড়ি বলা যায় না। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে ছোটো একটা ভাঙাচোরা ঘরে সে ছিল। এ-রকম একটা গরিব লোকের যে কোনো দামি হার থাকতে পারে তা সারঙ্গের ধারণারও অতীত।

যাইহোক, সারঙ্গ মুত্যগুপ্তের সঙ্গে আলাপ জমাল। কিছু কথার পরে মুত্যগুপ্ত বলল, 'আমার আত্মীয়স্বজন সবাই ধনী। আমিই শুধু গরিব। এর ওর বাড়িতে খেয়ে কোনোরকমে দিন কাটাই। সারাদিন পেটের ধান্দায় ঘুরে রাত্রে শুধু এই ঘরে আসি ঘুমোতে।'

মনের কথা চাপতে না পেরে সারঙ্গ বলল, 'অনেকেই গরিব থাকে, কিন্তু কোনো কোনো গরিবের একটা দামি হারও থাকে।'

সঙ্গে সঙ্গে মুত্যগুপ্ত বলল, 'আমার এই ঘরে যা আছে তার থেকে যেকোনো জিনিস আপনি নিয়ে যেতে পারেন। আমার কোনো আপত্তি নেই।'

এই কথার পর আর তো কিছু বলার থাকে না। সারঙ্গ অনেক কৌশল করে দু-দিন হারটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পেল না। বিরক্ত হয়ে ফিরে গেল। আবার দু-দিন হেঁটে মাতঙ্গ নগরে পৌঁছে সুধাকরের কাছে গিয়ে তাকে বলল, 'আপনি আমাকে মিথ্যা কথা বলেছেন। মুত্যগুপ্ত অত্যন্ত দরিদ্র লোক। ওরা যা অবস্থা তাতে ওর কাছে হার থাকা স্বাভাবিক নয়। যার কাছে যা নেই তার কাছ থেকে সেটা আনব কী করে?'

'আমি মিথ্যা কথা বলিনি। মুত্যগুপ্তের কাছে হার আনতে বলেছি। তার কাছে ওই হার আছে কী নেই তা তো বলিনি।' সুধাকর বলল।

'যার কাছে যা নেই তা কি আনা যায়?' সারঙ্গ রেগে বলল।

'এমন সময় বেরিয়ে পড়লেন যে সময় আরবের খদ্দেররা এখানে এল। ওরা এসে যথারীতি আমার কাছে জিনিসপত্র কিনে নিয়ে গেল।' সুধাকর সবিনয়ে বলল।

'ওফ! আপনি যে এত বড়ো ধোকাবাজ তা জানতাম না।' সারঙ্গ বলল।

'এখন আমি একটা কথা বলছি যা আমি পারব না, তুমি পারবে।' সুধাকর বলল।

সারঙ্গ প্রশ্ন করল, 'কোন কাজ?'

'ইচ্ছে করলে তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে পারো।' সুধাকর বলল।

শুনে সারঙ্গ অবাক হয়ে গেল।

বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল, 'রাজা, সুধাকর যদি সত্যিই বুদ্ধিমান হয়ে থাকে তবে আরও আগে থেকে এমন কিছু করল না কেন যাতে সারঙ্গের ব্যাবসা মাটি হয়ে যায়। যাকে ঠকাল তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া কি ঠিক হয়েছে? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

এই প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'সুধাকর সারঙ্গকে জামাই করে নিজের বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। যে ধৈর্য এবং উদ্যোগ থাকলে একজন ব্যাবসা চালাতে পারে সেটা ছিল বলেই সারঙ্গ হারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিল। কোনো লোক যদি নিজেকে চালাক ভাবে সেটা খারাপ নয়, খারাপ হল নিজেকে বোকা ভাবা। সারঙ্গ জীবনে বুঝেছিল অন্য ব্যাবসাদারকে শেষ করে দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করা কোনো ব্যাবসাদারের ইচ্ছা নয়। সারঙ্গের উদ্যোগ, উদ্যম এবং তৎপরতায় মুগ্ধ হয়ে সুধাকর তাকে জামাই করেছিল।'

রাজা কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে।